যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষেপিত ইতিহাস

লেখক : ফ্র্যাঙ্কলিন এশার

অনুবাদক : সুবোধ রায়
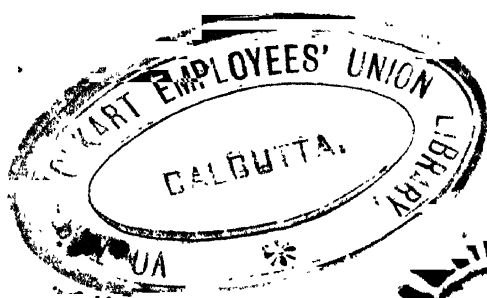
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

মুখবন্ধ

যাঁরা আমেরিকার ইতিহাস অর্ধবিস্মৃত হয়েছেন এবং যাঁরা সেই ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যই জানেন কিংবা একেবারেই জানেন না, তাঁদের জন্যই এই বইখানি রচিত। যে সমস্ত বিষয়ের প্রভাব কিংবা যে সমস্ত প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রকে বর্তমানের রূপ দিয়েছে, সেইগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই সমস্ত বিষয় প্রাকৃতিক, নৈতিক এবং অর্থ নৈতিক—এবং সেগুলির প্রভাবেই আমেরিকা বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

একবার ভেবে দেখুন, বসতিকারিরা কেন এসেছিলেন উত্তর আমেরিকার বনপ্রান্তরে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন পৃথিবীর আইন ও অনুশাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই পথিকৃৎরা এত বেশী স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন যে তাঁরা এমন কি নিজেদের কর্তৃত্বই নিজেরা সহ্য করতে পারতেন না, এবং ফলে দলে দলে তাঁরা আরও পশ্চিমে গিয়েছেন নূতন জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও আইন গড়ে তুলবার জন্য। "আমি যা চাই, আমাকে তাই করতে দাও"—এই মনোভাবের ফলে যখন তাঁদের স্বাধীনতা মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ড কর্তৃক বিপন্ন হল, তখন উপনিবেশগুলির একতাবদ্ধ হওয়া মুস্কিল হয়ে পড়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহযোগিতা করতে শেখেন এবং আমেরিকান জাতি স্বাধীনতা লাভ করে সংবিধানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

আমেরিকার ইতিহাসের রূপরেখা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে এর বহু সূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে আছে ক্রীতদাস-প্রথা, শিল্পভিত্তিক ধনিকতন্ত্র বা "বিগ-বিজিনেস"-এর অভ্যুদয় এবং তার ফলস্বরূপ সংস্কারবাদী ও প্রতিবাদমূলক মনোভাবের প্রকাশ, এবং শেষ পর্যন্ত জাতির বিশ্বনেতৃত্বপদে অভ্যুত্থান। এই সব ক'টি সূত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর: আবার সব ক'টি সূত্র একযোগে দেখলে আমেরিকার ইতিহাসের এমন এক চমকপ্রদ পরিচয় পাওয়া যায় যা শুধু ঘটনাপঞ্জী মারফত প্রকাশ পাবে না।

গ্রন্থকার আশা করেন যে তিনি আমেরিকার ইতিহাসের রূপরেখা যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, পাঠকরা এ পড়ে আনন্দ পাবেন ও শিক্ষালাভ করতে পারবেন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আবিষ্কার ও বসতির সূচনা

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের প্রথম যুগের ইতিহাস রহস্যাবৃত হয়ে আছে। এখানকার আদিম অধিবাসী অর্থাৎ রেড ইণ্ডিয়ানরা এশিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে আলাস্কায় এসেছিল এবং পরে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে চলে যায় এই রকম অনুমান করা হয়ে থাকে। রেড ইণ্ডিয়ানদের কাল চুল, তামাটে গায়ের রং, চোয়ালের উঁচু হাড় প্রভৃতি দৈহিক বৈশিষ্ট্য থেকে তাদের প্রাচ্য দেশোদ্ভূত বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে প্রায় ২০ হাজার বছর আগে অর্থাৎ যে সময়কে আমরা অতি সাম্প্রতিক হিমবাহ যুগ বলি তখন অধুনা বেরিং প্রণালীর ওখানে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যে যোগসূত্র ছিল— [illegible] এই ধারণা উল্লিখিত মতবাদকে আরও যুক্তিসহ করে তুলেছে।

শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সম্ভবতঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নোর্সামনরাই সর্বপ্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করেছিল। ৯৮৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ নোর্সমেনরা তাদের গোলাকৃতি একমাস্তুলওয়ালা সওদাগরী জাহাজে দুরন্ত মেরুসাগর পার হয়ে গ্রীণল্যাণ্ডে উপনীত হয়। সেখান থেকে তারা আরও পশ্চিমে চলে যায়; এমন কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যা থেকে বিশ্বাস হয় যে ১০০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ লীফ এরিকসন দলবল সমেত যথার্থই অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় পদার্পণ করেছিল।

নোর্সমেনরা অবশ্য এই "নতুন ছুনিয়ায়" টিঁকে থাকতে পারে নি। আবার তারা নিজেদের এই সমস্ত অভিযানের কোনরকম প্রামাণ্য বিবরণীও রেখে যায়নি। এ কারণে আমেরিকার আবিষ্কার ও জগতের কাছে তার ছুয়ার উন্মুক্ত করে দেখার গৌরব ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের ভাগ্যেই এসে পড়ে। কলম্বাস ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে উপনীত হয়ে উপনিবেশ স্থাপনে সাহায্য করেন। কলম্বাস ইতালীয় হলেও সমুদ্র অভিযানে বেরিয়েছিলেন স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার ফারমান নিয়ে।

আমেরিকার আবিষ্কার হয়েছিল নিতান্তই আকস্মিকভাবে, এবং তাও হয়েছিল তুরস্কের আচরণের জন্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর এই বিশাল ও বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যটি এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের স্থলপথের বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে লাগল। মার্কো পোলোর আমল থেকে এই বাণিজ্য চলে আসছে। তুরস্কের এই আচরণে শঙ্কা পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে উঠে বসল, দৃঢ় সংকল্প করল অন্য কোন পথে এশিয়া পৌঁছবার। ভূবিদ্যায় পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে পৃথিবীটা গোল। তাই যদি হয় তাহলে স্পেন থেকে শুধুমাত্র পশ্চিম অভিমুখে চলতেই থাকলে তীর মিলবে এবং সেটাই হবে এশিয়া। কলম্বাস বা তার সমসাময়িক কালের কেউই জানতেন না যে জাহাজে করে বরাবর পশ্চিমে এগিয়ে গেলে এশিয়া পথিমধ্যে পড়বে।

অতএব কলম্বাস এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী ছঃসাহসী অভিযাত্রীরা আটলান্টিক পেরিয়ে বাহামা, পানামা ও দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছিলেন এবং মনে ভাবলেন যে তাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। কলম্বাস কিন্তু তার জীবদ্দশায় জেনে যেতে পারেননি যে তিনি কোনখানে উপনীত হয়েছিলেন—সেটা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ইষ্ট ইণ্ডিজ বা ভারতবর্ষ নয়। ১৫১৯-২২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কিন্তু এই ভুলটা ধরা পড়েনি। ঐ সময় স্পেনের ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজেল্লান দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণের উপদ্বীপটি পাকখেয়ে অসীম বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে যান। ম্যাজেল্লান ফিলিপাইনে আদিম অধিবাসীদের হাতে মারা যান, কিন্তু তাঁর অনুচরেরা কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তারা আফ্রিকা ঘুরে স্পেনে ফিরে গিয়ে প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবীটা শুধুমাত্র গোলই নয়, ভূতত্ত্বজ্ঞানীরা যা ভেবেছিলেন, তার চেয়েও বেশী কিছু আছে ছুনিয়ায়।

আমেরিগো ভেসপুচি নামে একজন ইটালিয়ানের নামানুসারে আমেরিকার

নামকরণ হয়েছে। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে তিনি এক অভিযানে বেরিয়ে ব্রেজিলের উপকূল আবিষ্কার করেন। ইউরোপে ফিরে তিনি এই অভিযানের পুংখানুপুংখ বিবরণ প্রকাশ করেন এবং কলম্বাস অপেক্ষাও বিখ্যাত হয়ে পড়েন। মানচিত্রকাররা তখন "নূতন তুনিয়া"র নামকরণের জন্য চিন্তিত, তারা তখন ভেসপুচির সম্মানে নূতন মহাদেশটির নামকরণ করলেন। কলম্বাসের বিশাল কৃতিত্বের বিষয় বিবেচনা করলে এই নামকরণটি পরিহাসের মতই মনে হবে।

উপনিবেশ স্থাপনার্থ ঐ দেশ জয় করে নেবার ব্যাপারে অন্যান্য দেশগুলিকে পিছনে ফেলে স্পেন এগিয়ে গেল। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে হার্নাণ্ডো কোরতেজের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র অভিযানের ফলে মেক্সিকোর সুসভ্য আংসৃলেক জাতির পতন ঘটে এবং সেখানে স্পেনের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিসকো পিৎসারো পেরুর ইন্‌কা বংশকে ধ্বংস করে সোনা রূপায় এক বিপুল ঐশ্বর্যশালী দেশ স্পেনের রাজশক্তির করায়ত্ত করেন।

স্পেনদেশীয়রা আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছপালা ভেদ করে অধিকার বিস্তার করে বসল ; ঐ সময় আর একদল উত্তর দিকে এগুতে এগুতে অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় উপনীত হয়। পন্স দ্য লিওঁ রেড ইণ্ডিয়ানদের মুখে শুনে অনন্ত যৌবন লাভের এক ঝরণার সন্ধানে ফ্লোরিডায় এসে উপনীত হন এবং ১৫২১ সালে টম্পায় একটি উপনিবেশ স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস পান। সাবেৎসা দ্য ভাচা মেক্সিকো উপসাগরে জাহাজডুবি হয়ে টেক্সাসের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্যালিফার্ণিয়ায় হাজির হন। রেড ইণ্ডিয়ানরা তাকে দেবতা মনে করে খুব মান্য করত। তারাও তার সঙ্গে এসেছিল। এই স্প্যানিয়ার্ডরা বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে ঝলমলে পোষাকে বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় (এর আগে কিন্তু নতুন তুনিয়ায় ঘোড়া দেখা যায়নি) চড়ে সঙ্গে গরু বাছুর নিয়ে এগিয়ে চলত। এক জমকালো দৃশ্য ছিল সেটি।

উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত বিশাল মিসিসিপি নদী আবিষ্কৃত হয় ১৫৪১ সালে, আবিষ্কর্তা ছিলেন হার্নাণ্ডো ডি সোটো। এই অভিযানকালে ডি সোটো জরে মারা যান এবং তার মৃতদেহ মিসিসিপি নদীতে ফেলে দেওয়া হয় যাতে বৈরীভাবাপন্ন রেড ইণ্ডিয়ানরা তা জানতে না পারে। দুঃসাহসী কারোনাডো আজ যে জায়গাটাকে ক্যানসাস বলে, সেখানে সোনা খুঁজে ফিরেছিলেন।

ভবিষ্যতের যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় প্রথম উপনিবেশ বসেছিল ফ্লোরিডায় সেন্ট-অগাস্টিনে, ১৫৬৫ সালে। সেখানে স্প্যানিশরা গ্রামটিকে রেড-ইণ্ডিয়ানদের হামলা ও বৈদেশিক শক্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বিশাল এক দুর্গ তৈরী করে। কারণ, তখন ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, সুইডেন ও পর্তুগালের নয়া দুনিয়া সম্পর্কে উৎসাহ ও আগ্রহ বেড়েই চলেছে। তাদের জাহাজগুলি তখন ঐ আদিম অধিবাসী সংকুল উপকূল অঞ্চলে ঘোরাফেরা করত, মাঝে মাঝে নদীর উজানে গিয়ে মানচিত্রাদিও তৈরী করত। ১৪৯৭ সালে একখানি বৃটিশ জাহাজ আটলান্টিক অতিক্রম করে এসে উত্তরে লেব্রাডর ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড অঞ্চলে যায়। জাহাজখানির কাপ্তেন ছিলেন জন ক্যাবট নামে একজন ইটালিয়ান। তার এই অভিযানের ভিত্তিতেই ইংল্যাণ্ড পরে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ দাবী করেছিল। ফরাসী সরকারের তরফে ভেরাজানো ১৫২৪ সালে ক্যারোলাইনা থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্যন্ত উত্তর অতলান্তিক উপকূলে অভিযান চালান। আর ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকারের তরফে জ্যাকুইস কার্টিয়ার সেন্ট-লরেন্স নদীর উজান ধরে অধুনা ক্যানাডার যে মনট্রিল সহর, সেই পর্যন্ত উপনীত হন।

ইউরোপে গিয়ে এমন সব ঘটনার খবর পৌছাতে লাগল যেগুলির পরিণতি হয়েছিল পরিবর্তীকালে এই নূতন সাম্রাজ্যের বাটোয়ারায়। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে স্প্যানিশ জাহাজগুলি সোনা বোঝাই হয়ে আসতে দেখে ইংল্যাণ্ডের চোখ টাটাতে থাকল। শুধু ঈর্ষাই নয়, স্পেনের নাম গন্ধেও তাদের ঘৃণা, কারণ ইংল্যাণ্ড রিফরমেশনের পর তখন প্রোটেস্ট্যান্ট হয়েছে, আর স্পেন রোম্যান ক্যাথলিক-বাদের পুরোধা তখন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যাণ্ডের "সিন্ধু সারমেয়রা" স্প্যানিশ জাহাজগুলি লুঠ করতে সুরু করল। রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব তখন। হকিন্স, ক্যাভেণ্ডিশ এবং অতুলনীয় স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক প্রভৃতি অসীম সাহসী নাবিকরা সমুদ্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে স্প্যানিশ জাহাজের সোনা কুক্ষিগত করতে থাকল। কার্যতঃ জলদস্যু ও লুঠেরা হলেও এরা কিন্তু এই সব করে রাণীর আশীর্বাদ পুষ্ট ছিলেন।

অপর দিকে এই সমস্ত হামলার দরুণ স্পেনের রাজা ফিলিপ অত্যন্ত রেগে উঠলেন, কারণ এতে তার বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছিল। ১৫৮৮ সালে

তিনি এক বিশাল আর্মাডা নিয়ে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে সব কিছুর অবসান ঘটান স্থির করলেন। ফিলিপের আর্মাডা ইংলিশ চ্যানেলে এলে দ্রুতগামি ব্রিটিশ জাহাজগুলি প্রচণ্ড আঘাত হেনে আর্মাডাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। অতঃপর প্রচণ্ড ঝড়ে আর্মাডা সম্পূর্ণরূপে বিনিষ্ট হল। এই পরাজয়ের ফলে স্পেনের নৌশক্তি পর্যুদস্ত হ'ল, তারপর উত্তর আমেরিকার উপকূলের দখল নিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না, উপকূলে তখন নয়া দুনিয়ার উপনিবেশ স্থাপন আসন্ন।

উপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে ইংল্যাণ্ড প্রথম পদক্ষেপ করল ১৫৭৮ সালে। ঐ সময় রাণী এলিজাবেথ এক ফরমান দ্বারা প্রবীন সৈনিক স্যার হামফ্রী হিলবার্টকে "কোন খৃষ্টান নরপতির যথার্থ অধিকারে নেই এমন সব দূরবর্তী ও আদিম অঞ্চলে বসবাস সুরু করার ও দখল করার" অধিকার দেন। হিলবার্ট নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে এক অভিযান চালান, কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য তা ব্যর্থ হয়। ফিরতি পথে তিনি সমুদ্রে নিরুদ্দিষ্ট হন।

দু বৎসর পর রাণী এলিজাবেথ উত্তরে সেণ্ট-লরেন্স নদী ও দক্ষিণে ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে ইংরাজদের বসতি স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে এলাকাটির নামকরণ করলেন ভার্জিনিয়া। নয়া দুনিয়ার উপর অতলান্তিক উপকূলের প্রায় সবটাই অন্তর্ভুক্ত হল এতে। এই অঞ্চলের কোথাও বসতি স্থাপনের ভার তিনি দিলেন প্রিয় সভাসদ স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেকে।

১৫৮৪ থেকে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ক্যারোলাইনার উপকূলের অদূরবর্তী রোয়ানক দ্বীপে কয়েকবার অভিযান চালানো হয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের বৈরীভাব এবং অবস্থা বসবাসের অনুপযুক্ত ও দুঃসহ হওয়ায় প্রথম অভিযাত্রীদল ফিরে এল। তাদের জন্য রসদও এসে পৌঁছয়নি। শেষ অভিযানটি রহস্যাবৃতই আছে, সম্ভবতঃ শোচনীয় কিছু ঘটে তাদের। আমেরিকায় জাত প্রথম ইংরাজ শিশু ভার্জিনিয়া ডেয়ার সহ এই বসতিকারী দলটি বেমালুম উবে যায়, তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

এতেও ইংরাজরা দমেনি। তাদের তরুণ প্রচণ্ড উৎসাহ জোগাচ্ছেন রাণী এলিজাবেথ, আর আর্মাডার পরাজয়ে মনে এসেছে সাহসের জোয়ার। এই প্রাণোচ্ছলতার মধ্য দিয়ে ইংরাজদের চিরাচরিত ধারার পরিবর্তন হতে থাকল; যেখানে লোকে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতে নিজ পছন্দমত করে

উপাসনা করতে ভয় পেত সেখানে জেগে উঠল নূতন নূতন প্রোটেস্ট্যান্ট ও পিউরিট্যান্ট ধর্মগোষ্ঠী; এই প্রণোৎসাহ রূপায়িত হল মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে, যারা শুধু নিজেদের অবস্থাই ফেরায় নি, পরন্তু লগ্নী করার মত টাকাও হল তাদের।

আমেরিকায় বসতিস্থাপনের আনুকূল্য করবার জন্য ইংরাজ ব্যবসায়ীরা তখন কোম্পানী গড়তে সুরু করল। সেখানে যাবার জন্য লোক জোগাড় করাও কঠিন হল না, কারণ তখন এক প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক আলোড়ন সুরু হয়েছে, আর বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে দেশে। সামন্ত প্রথার অবসানের ফলে বহু চাষী বেকার হয়েছে, এবং নয়া দুনিয়ায় নূতন ঘর বাঁধার হাতছানি তারা দেখতে পেল। আর চার্চের সঙ্গে যাদের কোন্দল তারা দেখল উত্তর আমেরিকার জংলাভূমিতে তাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকবে অপরিসীম।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম জেমস লণ্ডন ও প্লাইমাউথ কোম্পানী দুটিকে কতিপয় নির্দিষ্ট জায়গায় বসতি স্থাপন ও সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার দেন। চুক্তি অনুসারে লণ্ডন কোম্পানী আটলান্টিক উপকূলে ৩৪ ডিগ্রী ও ৪১ ডিগ্রী অক্ষরেখার অর্থাৎ বর্তমান নিউইয়র্ক নগরী থেকে দক্ষিণে উত্তর ক্যারোলাইনার কেপ ফিয়ারের মধ্যেকার অঞ্চলে, এবং প্লিমাথ কোম্পানী ৩৮ ডিগ্রী এবং ৪৫ ডিগ্রী অক্ষরেখার অর্থাৎ নিউ-ইংল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল ও নিউইয়র্ক স্টেট থেকে দক্ষিণে পটোম্যাক নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করবে। ৩৮ ডিগ্রী থেকে ৪১ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে বসতি স্থাপনের অধিকার দুটি কোম্পানীই পেল—তবে স্থির হল কোন কোম্পানী বসতির ১০০ মাইলের মধ্যে অপর কোম্পানী বসতি স্থাপন করতে পারবে না। যাতে আঞ্চলিক অধিকার নিয়ে গোলমাল না হয় সেইজন্যই এটা করা হয়েছিল।

স্পেন থেকে আপত্তি উঠেছিল। ক্যাবটের অভিযান সত্ত্বেও তারা সমগ্র উত্তর আমেরিকার উপর অধিকার দাবী করল। লণ্ডন কোম্পানী এই আপত্তিতে কান না দিয়ে ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার নিউপোর্টের অধীনে ১৬০৭ সালে তিনখানা ছোটজাহাজ পাঠাইলে ভার্জিনিয়ার চীজাপিক বে অভিমুখে। জেমস নদীর উজানে গিয়ে প্রায় ১২০ জন ঔপনিবেশিক একটি ছোট্ট দ্বীপে অবতরণ করল, এবং ধর্মীয় অ[illegible] রাজার সম্মান-

জায়গাটির নামকরণ করল জেমস্‌টাউন। মে মাসের সেই দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ইংরাজদের স্থায়ী বসতি স্থাপিত হল সেইদিন।

সুরুতেই গোলমাল আরম্ভ হল। রেড ইণ্ডিয়ানদের হামলা এবং পার্শ্ববর্তী জলাগুলির দরুণ ম্যালেরিয়ার ফলে বেশ কিছু লোক প্রাণ হারাল। আর তাছাড়া প্রথমে এসেই তারা সোনা খুঁজতে থাকল আর সন্ধান করতে লাগল নদীর—যা দিয়ে এশিয়ায় যাওয়া যাবে—চাষবাস কিংবা বাড়ী তৈরীর দিকে মন দিল না তারা। প্রথম ৬ মাসে দলের বারো আনা লোক মারা গেল।

ক্যাপ্টেন জন স্মিথের প্রাণান্তকর প্রয়াসের ফলেই কলোনি ঐ সময় টিঁকে ছিল। বসতিকারীদের তখন খাবার নেই—স্মিথের চেষ্টাতেই রেডইণ্ডিয়ানরা আদের ভূট্টা সরবরাহ করল, তার বিজ্ঞ উপদেশের ফলে দুর্বল অর্ধমৃত লোকেরা বাঁচবার জন্য আরও জোর করে চেষ্টা করতে থাকল। এতে জন রলফের কৃতিত্বও অনেকখানি—পণ্য হিসাবে তামাকের কাটতির কথা তারই মাথায় এসেছিল। এই তামাক ইংল্যাণ্ডে অবিলম্বে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এরই থেকে উপনিবেশটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজের পায়ে দাড়িয়ে যায়। রলফ স্বনামধন্য রেড-ইণ্ডিয়ান সর্দার পৌহাটানের মেয়ে পোকাহান্টাসকে বিবাহ করেন। এর ফলে বহুদিন পর্যন্ত রেডইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তাদের বেশ সদ্ভাব ছিল। রলফের বিবাহের রোমান্স ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। রেডইণ্ডিয়ান রাজকন্যাটি রলফের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে আসেন। সেখানে রাজসভায় তার বেশ খাতিরও হয়। তিনি ইংল্যাণ্ডেই মারা যান।

জেমস্‌টাউনে যখন ঘরবাড়ী ও দুর্গ তৈরী করবার জন্য বসতিকারীরা চেষ্টা করছিল সেই সময় আরও বেশী সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি জাহাজবোঝাই নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপনিবেশটিতে আনা হোল এবং তা' থেকেই এমন একটি ব্যবস্থার সূত্রপাত হ'ল যার ফলে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। সেই সমস্যাটি এখনও বর্তমান এবং তার পূর্ণাংগ সমাধান করবার জন্য আমেরিকানরা আজও চেষ্টা করছে।

ক্রীতদাসরা যে বছর এসে পৌছল সে বছরই জেমস্‌টাউনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। রাজা জেমস্‌ উপনিবেশের বসতিকারীদের এক ফর্মান দিয়ে প্রত্যেক শহর অথবা বাগিচা থেকে দুজন করে বার্গেস্‌ (প্রতিনিধি)

নির্বাচন করার অধিকার দিলেন, তারা জেমসটাউনের গীর্জায় এসে গবর্নরের সংগে মিলিত হবেন। প্রথম অধিবেশনে কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ হবার পর ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট ২৭ জন সদস্যবিশিষ্ট আইনসভাটির অধিবেশন "প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণে" স্থগিত রাখা হল। পরবর্তীকালে রাজা জেমস্ জনসাধারণকে শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকার দেবার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন এবং হাউস অব বার্গেসেসকে দখল করবারও প্রয়াস পেয়েছিলেন ; কিন্তু এই অবিস্মরণীয় কীর্তিটির বিনাশ সাধনের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং স্বাধীনতার দীপশিখা অনির্বাণ জলতে থাকল।

১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভার্জিনিয়ায় বসতিকারীর সংখ্যা হাজারেরও বেশী হয়ে দাঁড়াল। আরও রসদ এবং নূতন নূতন বসতিকারীরা এসে পৌঁছতে লাগল, নূতন শহরের পত্তন করবার চেষ্টা হতে লাগল। এই আগন্তুকদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ানরা আকস্মিক হামলা চালাবার এক মতলব এঁটেছিল, কিন্তু চাংকো নামে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত তাদেরই দলের এক ব্যক্তি ইংরাজদের যথা সময়ে সতর্ক করে দেয়। বিপর্যয় রোধ হল এবং তখন থেকে শুরু হল, পার্শ্ববর্তী উপজাতীয়দের উপর বসতিকারীদের আধিপত্য বিস্তার।

ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্লীমাথ্ কোম্পানী মেইন-এ একটি উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ওলন্দাজদের চাকুরিয়া হেনরি হাড্সন নামক একজন ইংরাজ হাড্সন্ নদী আবিষ্কার করেন এবং উক্ত নদীর উপর হল্যাণ্ডের অধিপত্য দাবী করেন। বিভিন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজগুলি তখন নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূলে ঘোরাফেরা করতে থাকল ; তাদের কারো উদ্দেশ্য ছিল মৎস্য-শিকার, কারো বা ছিল ফারের ব্যবসা, আবার কোনটি ছিল বা অভিযাত্রী। ম্যাসাচুসেটস্-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ ততদিনে বিখ্যাত হয়ে পড়ল।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটস-এর উপকূলে মে-ফ্লাওয়ার নামক ছোট্ট একখানি জাহাজে একশত নরনারী এসে উপস্থিত হলেন। ইতিহাসে তাদের "পিলগ্রিম" বলা হয়ে থাকে। এই বসতিকারীরা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁরা সেই বিশাল বনপ্রান্তরে এক বৎসর প্রচুর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করবার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার জন্য

যে ভোজসভার আয়োজন করছিল তারই স্মরণে আজ আমেরিকায় জাতীয় ছুটির দিন 'থ্যাঙ্কস্ গিভিং ডে' উদ্‌যাপিত হয়।

এই পিলগ্রিমরা ম্যাসাচুসেটসে এসে হাজির হয়েছিলেন খানিকটা [illegible]; মূলতঃ তাঁদের ইচ্ছা ছিল জেমসটাউনের কাছাকাছি কোথাও বসতি করার, কিন্তু ঝড়েই হোক কিংবা তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করেই হোক তারা আরো অনেক উত্তরে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং নভেম্বর মাসের এক হিমশীতল দিনে কেপকডে তারা অবতরণ করেন। এদের কিন্তু নির্দেশমত আরো অনেক দক্ষিণে অবতরণ করবার কথা ছিল। কিন্তু এই অদম্য বসতিকারীরা সেখানে নেমেই স্বায়ত্বশাসনের এক বিধি রচনা করলেন এবং মূল ভূখণ্ডের প্রান্তে একটি ছোট্ট গ্রামের পত্তন করলেন। পরবর্তীকালে তাদের যে দুর্ভোগ হয়েছিল এতদিনকার দুর্ভোগ তার তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ।

এই দলে নানা ধরণের লোক ছিল। একদিকে ছিল ধর্মীয় ভেদবাদীরা; যাদের বারো বৎসর পূর্বে রাষ্ট্র পরিচালিত ইংলিশ প্রোটেষ্টাণ্ট এপিস্‌কোপাল চার্চে ক্যাথলিকদের বিভিন্ন ধরণের কায়েমী স্বার্থের প্রতিবাদ করার জন্য হল্যাণ্ডে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ভেদবাদীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন উচ্চবংশোদ্ভূত পণ্ডিত ব্যক্তি। তন্মধ্যে উইলিয়ম ব্রুষ্টার, এবং উইলিয়ম ব্রাডফোর্ড সবিশেষ খ্যাতিমান।

হল্যাণ্ড থেকে নূতন পৃথিবীতে গিয়ে বসতি করার বাসনা করে ভেদবাদীরা ইংলণ্ডের কতিপয় ব্যবসায়ীকে এই অভিযানে অর্থানুকূল্য করতে রাজী করান। প্রতিদানে তাঁরা কথা দিলেন যে সেখানে গিয়ে যে মাল তাঁরা রপ্তানী করবেন তার একটা বিপুল অংশ এই বণিকরা পাবেন। তারপর তারা লণ্ডন এবং অন্যান্য নগরী থেকে সাধারণ লোকজনকে সহযাত্রীর তালিকাভুক্ত করলেন। এই যাত্রীরা নূতন পৃথিবীতে গিয়ে জীবন অধিকতর উন্নতির সুযোগ পাওয়ার এই সম্ভাবনাকে আন্তরিকতার সংগে গ্রহণ করলেন। এরই মধ্যে ছিলেন জন এ্যালডেন, তিনি নিজের রাহাখরচ জোগাড় করবার জন্য কয়েক বছরের জন্য দাসত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

বিচিত্র ধরণের এই সমস্ত লোক কি করে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে পরস্পরের সংগে মানিয়ে চলেছিল গণতন্ত্রের ইতিহাসে তার অবদান অসামান্য এবং আমেরিকার আদর্শবাদ ও তার প্রভাব যথেষ্ট। এরা সবাই শ্রেণীবিভেদ

এবং শিক্ষাগত বিভেদ ভুলে গিয়েছিলেন। বিশাল বনপ্রান্তরে রেড্ ইণ্ডিয়ানরা যখন এসে বসতির উপর হামলা করত তখন মানুষের কুলগৌরবের চেয়ে তার কর্মই অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে উঠত। সেখানে ছিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব এবং মৃত্যু নিয়ত সেই ভাঙাচোরা কাঠের বাড়ীগুলোর ভেতরে হানা দিত।

প্রথম বছরের প্রচণ্ড শীতেই বসতিকারীদের অর্ধেকেরও বেশি জ্বরে মৃত্যু হল। বসন্তকাল যখন এল তখন মিত্রভাবাপন্ন রেড্-ইণ্ডিয়ানরা তাদের দেখিয়ে দিল কী করে শস্য বপন করতে হয় এবং প্রকৃতির নিগ্রহকে জয় করতে হয়। বসন্তে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, বসতিকারীদের প্রাণে এল নূতন আশা; সংকটের চরমতম পর্যায়ের অবসান ঘটল।

ম্যাসাচুসেটসের উপকূলে যে সামান্য বসতি স্থাপিত হয়েছিল পরবর্তী কয়েক বছরে সেগুলির আরো প্রসার হল। ইংলণ্ডে পুনরায় ধর্ম নিয়ে গোলমাল শুরু হল; ভেদবাদীদের ন্যায় পিউরিটানরাও চার্চের বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল এবং সরকার তাদের এই বলে সতর্ক করলেন—হয় রাষ্ট্রীয় ধর্মকে সমর্থন কর, অন্যথায় দেশ ছেড়ে যাও। আর্চবিশপ লর্ড অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের দেশের বাইরে নিয়ে চললেন।

এইভাবেই অধিকতর সংখ্যায় লোক রাজসনদ নিয়ে উত্তর আটলান্টিকের উপকূলে বসতি করবার জন্য সমুদ্র পেরিয়ে এগিয়ে চলল। এইভাবেই রাজা প্রথম চার্লস ম্যাসাচুসেটস বে-কোম্পানীকে বস্টন অঞ্চলে একদল পিউরিটানকে পাঠাবার অধিকার দিলেন যাতে তারা সেখানে বসতি করে বৃটিশ আইনের আওতার মধ্যে থেকে নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালাতে পারে। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন এনডিকটের নেতৃত্বে প্রথম দলটি যাত্রা করল এবং দুবছর পর উত্তরকালের গভর্ণর জন উইনথ্রপ প্রায় হাজার লোক নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

আরো দক্ষিণে উপকূল অঞ্চলে বসতিকারীদের আগমনও বেশ চলতে থাকল। ইংলণ্ডের ক্যাথলিকরা প্রোটেস্টান্টদের আধিপত্যের মধ্যে থেকে বিব্রত হয়ে পড়ছিল। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বালটিমোরের নেতৃত্বে তারা এসে মেরিল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করল। উইলিয়ম পেন-এর নেতৃত্বে কোয়েকাররা ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিলভ্যানিয়ায় গিয়ে উপনীত হল। এই সমস্ত নূতন উপনিবেশ থেকে [illegible] কাছাকাছি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।

ফলে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আটলান্টিক উপকূলে ম্যাসাচুসেট্‌স্ থেকে ক্যারোলাইনার মধ্যে সুসংবদ্ধ ইংরাজ বসতি স্থাপিত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ওলন্দাজরা হেনরি হাড্‌সনের দাবী অনুসারে এগিয়ে চলল এবং নিউ আমস্টারডাম অর্থাৎ বর্ত্তমান নিউইয়র্কে এক সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ গড়ে তুলল।

সুইডিশ বসতিকারীরা ডেলাওয়ার ও নিউজার্সির কোন কোন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করল। কিন্তু সুসংবদ্ধ ইংরাজরা তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করল এবং ১৩টি কলোনিকে গ্রথিত করে ফেলল।

নূতন তুনিয়ায় ফ্রান্সও কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে চ্যামপ্লেন ক্যানাডায় কুইবেক নগরীর পত্তন করেন এবং সেখান থেকে উৎসাহী মিশনারীরা মিসিসিপি নদী ধরে মধ্য পশ্চিম অঞ্চলে এগিয়ে গেলেন। তারা যেমন একদিকে রেড ইণ্ডিয়ানদের দীক্ষিত করতে লাগলেন ও মনভুলানো উপহার দিতে সুরু করলেন অপরদিকে তেমনি ফরাসীদের অনুকূলে বিশাল সমস্ত অঞ্চল দাবী করলেন। ফরাসীরা অবশ্য ঠিক যথার্থ বসতকারী ছিল না। তারা ছিল মূলতঃ ব্যবসায়ী, সংখ্যায় তারা ছিল কম এবং ক্যানাডা ও মিসিসিপি উপত্যকায় তারা যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল তার মূলে ছিল ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং রেড ইণ্ডিয়ান উপজীবীদের উপর প্রভাব ; শ্বেতাংগদের উপনিবেশগুলি নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্প্যানিশরা মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় তাদের দখল বজায় রেখেছিল কিন্তু অধুনা যে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে তাদের উপনিবেশের সংখ্যা ছিল কম। যেগুলি ছিল তা হল ফ্লোরিডা, টেক্সাস্, ও নিউ মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূল বরাবর মিশনারীদের কয়েকটি ঘাঁটি। তবুও উপনিবেশবাদের এই পাল্লায় স্পেন তার প্রধান তুই প্রতিযোগী ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের পিছনে পড়ে রইল।

বর্ত্তমানের যুক্তরাষ্ট্রের চেহারা সপ্তদশ শতাব্দীতে কিরূপ ছিল? অতি মনোরম ছিল এই দেশ, মিসিসিপির পূর্ব তীরে এত ঘন জঙ্গল যে কাঠবিড়ালীরা মাটি না ছুঁয়ে গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে কয়েক হাজার মাইল চলে যেতে পারত। সরু একখণ্ড সমতলভূমি ছিল আটলান্টিকের উপকূলে এবং সেটা গিয়ে মিশল আপালেশিয়ান পর্বতমালার সানুদেশে। এই সমতলভূমি থেকে

রকি পর্বত পর্যন্ত পশ্চিমের সহস্রাধিক মাইল ব্যাপী অঞ্চল জুড়ে ছিল অরণ্য এবং প্রেয়রি অঞ্চল যাকে বলা হয় মিসিসিপি উপত্যকা। এই অঞ্চলের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং বসতি স্থাপনের পক্ষে আদর্শস্থল। আবার রকি পর্বতের অপর পারে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ছিল আর একখণ্ড মনোরম ভূমি; সেখানে ছিল সুন্দর পোতাশ্রয়, মনোরম বনভূমি। মানুষের বসবাসের আদর্শস্থল এই অঞ্চলটিতে তখন বাস করত রেড ইণ্ডিয়ানরা, শীকার করা এবং মাছ ধরাই ছিল তাদের কর্ম।

এই মহাদেশে কোন শক্তি অধিকার পাবে তার জন্য পরবর্তীকালে যে সংগ্রাম হয়েছিল তার পটভূমিকা এই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগ

ইংরাজ বসতির প্রথম যুগে জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং জনসাধারণের উপরে তার ছাপ পড়ে যায়। নিউ ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে এই কথা আরও সত্য। কারণ সেখানকার মাটি ছিল পাথুরে আর ছিল প্রচণ্ড শীত যার ফলে খামার তৈরী করে জীবনধারণ করা ছিল দুষ্কর। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে করে বসতিকারীরা অত্যন্ত রুক্ষ ও স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। আজকের আমেরিকার জীবনযাত্রায় যে কঠোর পিউরিটান প্রকৃতি দেখা যায় তার সূত্রপাত হয়েছিল সেদিন। আমেরিকায় এসে ম্যাসাচুসেটসের পিউরিটানরা ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেল এবং নিজেদের পছন্দমতভাবে ভজনা করবার ব্যবস্থা করে নিল। ধর্মীয় স্বাধীনতায় তারা বিশ্বাস করত না। তাদের নায়করা পিউরিটান অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলবার ব্যবস্থা করলেন। এবং ১৬৩১ সালে জেনারেল কোর্ট ব্যবস্থা দিলেন যে চার্চের সদস্যদের মধ্যে যারা সৎপ্রকৃতির তাদেরই শুধু শাসন ব্যবস্থা নির্বাচনে ভোট থাকবে। এই ভাবেই দেখা গেল প্রাচীন দুনিয়ায় যারা অত্যাচারিত হয়েছিল তারা এসে নূতন দুনিয়ায় কিছুকালের জন্য অত্যাচারী হয়ে দাঁড়াল।

ম্যাসাচুসেটসের সমস্ত বসতীকারীই অবশ্য চার্চ নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থায়,—যেখানে [illegible] শাস্তি পেত এবং নির্য্যাতীত হয়ে মারা যেত—বিশ্বাস

করতেন না। আমেরিকার প্রথম যুগ থেকেই দেখা গেছে যে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকারের ব্যাভিচারের প্রতিবাদ স্পষ্টবক্তা নরনারীরা সব সময়েই করে এসেছে। এদের পথ দেখিয়েছিলেন রজার উইলিয়মস্। উচ্চবংশোদ্ভূত ভদ্র এই ধর্মপ্রচারকটি কেম্বিজের গ্রাজুয়েট, তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় সহনশীলতায় এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রশক্তির পৃথকীকরণে।

উইলিয়মস্ একথাও বলেছিলেন যে রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতি আরো সদয় ব্যবহার করা দরকার কারণ তারাই আমেরিকার প্রকৃত মালিক, ইংলণ্ডের রাজা নন। ফলে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিষনজরে পড়লেন। তাঁকে জেলে দেওয়া হল কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালিয়ে একদল অনুগামীর সংগে রোড হ্ আইল্যাণ্ডের প্রভিডেন্সে পালিয়ে গেলেন এবং সেখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে জমি কিনে নিলেন। এই নতুন উপনিবেশটিতে ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল এবং তারা ইউরোপ থেকে হেরেটিক, কোয়েকার এবং গৃহহীন ইহুদীদের এসে বসবাস করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। শতাব্দীর নবম দশকে উইলিয়মস্, রোড হ্ আইল্যাণ্ডে দেহত্যাগ করেন। যারা তাঁর উদার মতবাদ পছন্দ করতেন না তারাও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

ধর্মীয় মতবিরোধের ফলে আর যারা ম্যাসাচুসেট্স্ ত্যাগ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ্যান হাচিন্সন্ এবং রেভারেণ্ড টমাস হুকার। মিসেস হাচিনসন্ চরিত্রে অতুলনীয়। যে কোন কালেই এই ধরণের মহিলা বিরল। তাঁর ১৪টি সন্তানের সকলেই ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিল, তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন যখন তাঁর বয়স ৪০শের কোঠায়। অনতিকালের মধ্যেই তিনি চিন্তানায়ক ও ধর্মীয় নায়ক হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল ব্যক্তিগত ভজনাকারী এবং ভগবানের সম্পর্কের মধ্যে পাদ্রীদের যথার্থ ভূমিকা কি? এই নিয়েই ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাদ্রীদের বিরাগভাজন হলেন। মিসেস হাচিন্সনের কতিপয় অনুগামী নিউ হ্যাম্পশায়ারে গেলেন নতুন বসতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কয়েকজন নিউইয়র্কে পেলহ্যামে বসবাস করবার জন্য যান এবং ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে তাদের বিনাশ ঘটে।

টমাস হুকার একদল সহযাত্রী নিয়ে কনেটিকট্ নদীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন এবং ১৬৩৬ সালে হার্টফোর্ড এবং আরো কয়েকটি শহরের

পত্তন করেন। এপথে তাঁরাই প্রথম যাত্রী। গবাদি পশু সংগে নিয়ে এই বসতিকারীরা গাড়ীতে চেপে এবং পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন। তাদের বংশধররা দুশো বছর পরে সেই একই ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল প্রশান্ত মহা-সাগরের উপকূল পর্যন্ত। হুকার এবং তাঁর অনুগামীরা শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে "ফাণ্ডামেন্টাল অর্ডারস্" বিধিবদ্ধ করেন, যাতে চার্চের সদস্য নয় এরকম লোককেও ভোটাধিকার দেওয়া হল এবং জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। এই বিধিতে কিন্তু রাজার অধিকার সম্পর্কে একেবারেই কোন কথা বলা হয় নি।

অন্যান্য কলোনীগুলিতে ধর্মীয় বিভেদ অতো গুরুতর ছিল না। মেরিল্যাণ্ডে একসময় কাছাকাছি অঞ্চল থেকে দলে দলে প্রোটেষ্টাণ্টরা এসে হাজির হল, ফলে সেখানকার মূল বসতিকারী ক্যাথলিকগণ প্রমাদ গণলেন এবং তাদের ওপর নিগ্রহের সম্ভাবনা দেখা গেল। কিন্তু আইনসভায় শুভ বুদ্ধিরই জয় ঘটল এবং ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে "টলারোনে এ্যাক্ট" গৃহীত হয়। তাতে সর্বশ্রেণীর খ্রীষ্টানকে পছন্দমত ভজনা করবার অধিকার দেওয়া হয়।

কার্য্যতঃ কলোনীগুলিতে প্রয়োজন ছিল গঠনকর্মী ও কৃষিকর্মীদের। শেষ-পর্যন্ত দেখা দেখা গেল যে এদের নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে যতটা বিশ্বাস ছিল কার্য্যতঃ তার ক্ষমতা ছিল তার চেয়ে কম। ক্যাথলিক অথবা লুথার পন্থীদের কি এপিস্‌কোপাল্ পন্থী ভার্জিনিয়ায় স্থান হবে? হবে যদি সে তার কর্মক্ষমতা দিয়ে এখানকার অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারে। এইভাবেই দেখা গেল এই নূতন দেশের সর্বত্রই মেইন থেকে দক্ষিণে কারোলাইনা পর্য্যন্ত এবং জর্জিয়ার কলোনীতে ধর্মীয় বিধিনিষেধ ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল।

যাই হোক, এখানে সেখানে কিছু নিগ্রহ চললেও প্রাচীন পৃথিবীতে প্রচার হয়ে গেল যে আমেরিকাই হল নিগৃহতদের আশ্রয়স্থল। এই সময় ইউরোপে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল। ইতিহাসে এমন দুর্য্যোগ বিরল। ১৬১৮—১৬৯৭ সাল পর্যন্ত 'থার্টি ইয়ারস্ ওয়ার', 'দি ওয়ার অব্ ডিভোলিউশন্', এবং 'দি ওয়ার অব প্যালিটিনেট' সংঘটিত হয়েছিল এবং তৎকালীন সমর্থ পুরুষদের মধ্যে অল্প লোকই এই সব যুদ্ধে যোগদানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলি তখন প্রতিবেশী প্রোটেষ্টাণ্ট্ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং প্রোটেষ্টাণ্ট্‌রা নিজেদের মধ্যে খাওয়া খাওয়ি করছে।

বসতি স্থাপনের প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সমস্ত ধর্মমতের যে হাজার হাজার লোক আমেরিকায় বসতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল উল্লিখিত কারণগুলির মধ্যে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। নতুন দুনিয়ার হয়ত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কষ্টকর হবে কিন্তু প্রাচীন পৃথিবীতে তো তারা খুব সুখে নেই! ইউরোপের লোকেদের ভেতর এই মনোভাব সেদিন দেখা দিয়েছিল এবং তারা সম্ভাবনার এই দেশে যেতে চেয়েছিলেন। আজিও এই মনোভাব প্রকট আছে।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউ-ইয়র্ক ছিল ওলন্দাজদের একটি ছোট্ট সাজান গোছান শহর। ম্যানহ্যাটটান্ দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে এর অবস্থিতি। অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার এবং সেখানকার উইণ্ডমিল, গুদমঘর এবং ঢালু-ছাদের বাড়ীগুলি দেখলে একটি ওলন্দাজ গ্রামের কথাই মনে পড়ত। ওলন্দাজরা হাড্‌সন্ নদীর উজানে দেড়শত মাইল দূরবর্তী শ্যালবনী পর্য্যন্ত কয়েকটি বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। নিউজার্সিতেও তাদের অনেক ঘাঁটি ছিল। হঠাৎ একদিন একটি ইংরাজ নৌবহর নিউ ইয়র্কের কাছে এসে হাজির হয়ে নূতন দুনিয়ায় ওলন্দাজদের সমস্ত অধিকার ছেড়ে দেবার হুকুম করল। সেই দুর্দিনে অস্ত্রবাহী ইংরাজ নৌবহরের বিরুদ্ধে অসহায় ওলন্দাজরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হল এবং নিউ ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে যে বিরাট ভূখণ্ড ছিল তা ইংরাজের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ইংরাজ বসতিগুলি তখন সরগরম হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডে দ্রুত কয়েকজন শাসকের আবির্ভাব ঘটল। প্রথমে ষ্টুয়ার্ট বংশীয় প্রথম জেম্‌স্ ও প্রথম চার্লস্ তার পরে এলেন ১৬৫৩ সালের গৃহযুদ্ধে বিজয়ী পিউরিটান ডিক্টেটর অলিভার ক্রমওয়েল। ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দুবছরের মধ্যেই ষ্টুয়ার্টরা পুনরায় গদি দখল করলেন; কিন্তু তাদের আবার গদি থেকে চিরতরে হটিয়ে দেওয়া হল ১৬৮৮ সালে রক্তহীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আরঞ্জের উইলিয়ম এবং মেরীকে শাসনভার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হল এবং তারা ইংরাজ জনসাধারণকে শাসনব্যবস্থায় অধিকতর প্রতিনিধিত্ব দিতে স্বীকৃত হলেন।

এই সমস্ত বৃটিশ শাসকদের সকলেই কিন্তু আমেরিকার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তারা উপনিবেশ বিষয়ক ঘটনাবলী সম্পর্কে

কঠোর থাকবারই চেষ্টা করতেন কিন্তু সেই সময়কার অবস্থা এবং আমেরিকার অতখানি দূরত্বের ফলে তাঁরা ইচ্ছামত সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না।

যাই হোক, কয়েকটি বেশ কঠোর অবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। শুরুতে কলোনীর শাসনব্যবস্থা ছিল ব্যবসায়ী এবং রাজার প্রিয়জনের হাতে। তারা রাজার কাছ থেকে ফর্মান পেয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে এই সব ফর্মানে যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং ফর্মানের অধিকারীরা বসতিকারীদের কার্যতঃ নিজেদের ইচ্ছামতই সবকিছু চালাতে দিতেন। অবশ্য এটা চলত ততদিনই যতদিন তারা লাভ করতে পারত, ইংরেজ আইনকে সমীহ করত এবং রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকত। স্বায়ত্ব-শাসন অধিকারের ক্ষেত্রে এগুলি অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার এবং রাজাও ইংলণ্ড থেকে তাদের অনেক বেশি শাসন করবার ক্ষমতা পেতেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্টবংশীয় শেষ রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স্ যখন নিজের খেয়াল খুশিতে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি এবং নিউ-ইংলণ্ডকে একটি রাজকীয় প্রদেশে সংগঠিত করে দিলেন তখন বসতিকারীদের কাছে সেটা দুঃসহ মনে হল। গভর্ণর হিসাবে রাজা পাঠালেন স্যার এডমণ্ড এ্যাণ্ডরসকে। কঠোর নিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তি তিনি, তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল রাজকোষের জন্য যতটা পারা যায় অর্থ সংগ্রহ করা। এ্যাণ্ডরস উপনিবেশের আদালতগুলি বাতিল করে দিলেন, নিজেই জজের কাজ চালাতে লাগলেন, সংবাদপত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে ফেললেন, উঁচুহারে কর ধার্য করলেন। এক কথায় বলতে গেলে জনসাধারণের মতামতকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে তিনি শাসন চালিয়ে যেতে থাকলেন।

রাজা জেমসের মৃত্যু সংবাদে আমেরিকানরা উল্লসিত হল, আর এ্যাণ্ডরসের কপাল পুড়ল। প্রতিশোধকামী ম্যাসাচুসেট্‌স বাসীরা তাদের উৎপীড়ককে বন্দী করে জাহাজে ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল, নূতন রাজার কাছে বিচারের জন্য। নিউ ইয়র্কে স্বাধীনতাপ্রিয় আমেরিকানরা এ্যাণ্ডরসের ডেপুটি ফ্রান্সিস নিকলসনকে বন্দী করল, এবং পরবর্তী দু'বছর তারা রইল তাদের অন্যতম নেতা জার্মান বংশোদ্ভূত জ্যাকব লিজলারের অধীনে।

ভার্জিনিয়ার গভর্ণর ছিলেন স্যার উইলিয়াম বার্কলী। সেখানেও খুব গোলমাল চলল। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে বার্কলীর কোন নজর ছিল না। তার উৎসাহ ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ফার-এর ব্যবসায়ে।

তখন ১৬৭৫ সাল। সীমান্তবর্তী কয়েকটি বসতিতে সাসকেহ্যানক উপজাতীয়রা খুব হামলা চালাচ্ছিল। বার্কলী এই উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে অসম্মত হলেন। ন্যাটানিয়েল বেকন নামক একজন বাগিচা মালিক একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে হামলাকারীদের বিধ্বস্ত করলে বার্কলী তাকে "বিদ্রোহী" ঘোষণা করলেন, তার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হল এর ফলে শুরু হল গৃহযুদ্ধ, বেকনের লোকেরা গভর্ণরকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। কিন্তু, জয় করার মুখে এসে বেকন জ্বরে প্রাণ হারালেন এবং নেতৃত্বহীন তার লোকজন বার্কলী কর্তৃক বিধ্বস্ত হল। এত প্রাণহানি ঘটল যে শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বার্কলীকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে আনলেন।

এতসত্ত্বেও কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইংল্যাণ্ডের প্রতি অনুরক্ত ছিল (মাতৃভূমির বিরুদ্ধে তারা খোলাখুলি বিদ্রোহে নেমেছিল আরও এক শতাব্দী পর)। এই সময়ে যাদের সামর্থ্য ছিল তারা তাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজে পাঠাতেন এবং সুযোগ পেলেই একবার মাতৃভূমি ঘুরে আসতেন।

আমেরিকায় তখন সম্পদ সম্ভার। প্রথম বসতিকারীরা জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি পত্তন করবার পর দু'এক পুরুষের মধ্যেই দক্ষিণের বাগিচা মালিকরা তামাক ও ধানের প্রচুর ফসল পেতে থাকল ও তারা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। মধ্য অঞ্চল বিশাল জমিদারী বা বাগিচা স্থাপনের পক্ষে অনুকূল ছিল। নিউ ইংল্যাণ্ডের অবস্থা ছিল কিন্তু ভিন্ন। সেখানকার অপরিসর উপত্যকা এবং পাহাড় অঞ্চলের অনুর্বর মাটি ব্যাপক চাষ আবাদের প্রতিকূল ছিল।

ফসল তাদের ভাল হল না সত্যি, কিন্তু বুদ্ধিমান নিউ ইংল্যাণ্ডীয়রা সমৃদ্ধ হবার জন্য ব্যবসায় শুরু করলেন। তাদের চতুর্দিকে ভাল কাঠের জঙ্গল, কেটে জাহাজ বানান যায়, কিংবা কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানীও চলে। উপকূলের কাছে মাছের ঝাঁক চড়ছে। আবার ডাঙ্গায় আছে রেড ইণ্ডিয়ানরা; এক বোতল মদ বা রঙ্গীন কাঁচের গহনার বদলে তারা দামী ফার এনে হাতে তুলে দেবে।

কলোনিগুলিতে সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। সেটা প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল এবং অধিক লাভবান হবার জন্য ইংরেজ শাসক এই উপনিবেশগুলিতে নিজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বহাল রেখেছিলেন।

নূতন ও অগ্রোন্নত উপনিবেশগুলির বসতিকারীরা শিল্পপণ্যের জন্ম মাতৃভূমির মুখাপেক্ষী হয়েছিল—পরিবর্তে তারা রপ্তানী করত কাঁচামাল, যথা কার্ড, চামড়া, তামাক প্রভৃতি। এই ব্যবসায় বা বাট্টা প্রথায় ইংল্যাণ্ডই বেশী লাভবান হত, এবং নূতন উপনিবেশ স্থাপনে অর্থলগ্নী করবার সেটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বসতিকারীদের কাঁচামালের জন্ম ইংরেজ বণিক যে মূল্য দিত তাই তাদের নিতে হত আবার শিল্পপণ্যের জন্ম ইংরেজ বণিক যে মূল্য চাইত তাই তাদের দিতে হত। উপনিবেশগুলির জন্ম এমনভাবে আইন তৈরী করা হত যাতে তারা অন্ম দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারত না বা ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করতে পারত না।

উপনিবেশগুলি যতই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকল ও নিজের পায়ে দাড়াতে শিখল তখন নূতন ছুনিয়ার ব্যবসায়ী সমাজ তাদের উপর যে নিয়ন্ত্রণ চালু রাখা হয়েছে, তার জন্ম আপশোস করতে থাকল। ১৬৬০-৬৩ সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লস যে নৌ আইনগুলি পাশ করলেন তা বিশেষ করে নিউ-ইংল্যাণ্ডকে প্রচণ্ড আঘাত হানল, কারণ তারা তখন নিজেরা শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করছিল এবং মাতৃভূমির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার চেষ্টা করছিল। উপনিবেশগুলির সৌভাগ্য বলতে হবে, কারণ আইন কঠোরভাবে বলবৎ করা হল না, এবং স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিজের সঙ্গে তাদের বে আইনি ব্যবসায় বেশ ফুলে ফেঁপে উঠলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপনিবেশগুলির মোট জনসংখ্যা প্রায় পনের লক্ষয় দাড়াল। এদের মধ্যে ইংরেজ বংশোদ্ভূতরাই সংখ্যাধিক রইল, নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে ওলন্দাজদের সংখ্যা ছিল বেশ কিছু এবং ফরাসী প্রোটেস্ট্যাণ্টরা ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন জায়গায়, আর জার্মানরা পেনসিলভ্যানিয়ায়, কঠোর পরিশ্রমী স্কচ আইরিশরাও দলে দলে এসে হাজির হল, তারা পেনসিলভ্যানিয়া থেকে শেনানাডোয়া উপত্যকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলাইনার সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

স্বাধীন ছুনিয়া থেকে আগত এই সব লোকজনের সঙ্গে ছিল আফ্রিকা থেকে ধরে আনা ক্রীতদাসের দল। এই সব হতভাগ্যদের পূর্বপুরুষদের তাদের স্বগ্রামে ধরা হোত, এবং দাস জাহাজের অন্ধকার খোলের মধ্যে গরু ছাগলের মত বোঝাই করে তাদের সমুদ্র পেরিয়ে নিয়ে আসা হত। নিউ ইংল্যাণ্ডে

কিছু সংখ্যককে চাকর হিসাবে বিক্রী করা হত, আরও বেশী সংখ্যক চালান হত মধ্যাঞ্চলীয় উপনিবেশগুলিতে ; কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যককে পাঠান হত দক্ষিণ অঞ্চলে বাগিচার দাস শ্রমিক হিসাবে। ১৭৫০ সাল নাগাদ এই ক্রীতদাসের সংখ্যা হল প্রায় আড়াই লক্ষ।

আমেরিকার অপর অধিবাসী হল রেড ইণ্ডিয়ানরা। তারা ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। শ্বেতাঙ্গরা প্রথম যখন আমেরিকায় আসে তখন তাদের জনসংখ্যা ৮ লক্ষ ছিল বলে অনুমিত হয়। ঔপনিবেশিকরা তাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত ও ঠকাত। ফলে মাঝে মাঝে তারা ক্রোধান্ধ হয়ে উৎপীড়কদের উপর হামলা চালাত ও মেরে কেটে একাকার করে দিত। ঔপনিবেশিকরাও রক্তের শোধ নিত রক্তে এবং তাদের প্রতিশোধ ছিল আরও ভয়ঙ্কর। ১৬৩৭ সালের পেকো যুদ্ধে প্রতিহিংসা যেভাবে চরিতার্থ হয় ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। ঐ যুদ্ধে ক্যাপ্টেন জন ম্যাসনের নেতৃত্বে একদল নিউ ইংল্যাণ্ডবাসী একটি রেড ইণ্ডিয়ান শহরে হানা দেয়। নিষ্ক্রমণের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়ে এই পিউরিটানের দল শহরটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ফলে পাঁচশত রেড ইণ্ডিয়ান নরনারী ও শিশু আগুনে ভস্মীভূত হয়।

ম্যাসাচুসেট্টসের পিউরিটানদের চরিত্রে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য তারা অন্যান্য অঞ্চলের বসতিকারীদের অপেক্ষা ভিন্ন ছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য ছিল দ্বিমুখী—একদিকে প্রশংসার্হ, অন্য দিকে ভয়ঙ্কর। প্রথমতঃ পিউরিটানরা ছিলেন শিক্ষানুরাগী। ১৬৩৬ সালে সেই জঙ্গলে উপনিবেশের শ্বাপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্যেই তারা হার্ভার্ড কলেজের প্রতিষ্ঠা করে। আর ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সরকারী স্কুলে পড়াশুনার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু অপরদিকে এরা ছিলেন ধর্মান্ধ। এই ধর্মান্ধতার পরিণতিস্বরূপ ১৬৯২ সালে ম্যাসাচুসেট্টস এর নিউ সালেমে ডাইনীদের বিচার ও হত্যার মত জঘন্য লোমহর্ষক ঘটনাবলী ঘটেছিল।

নিউ ইংল্যাণ্ডের ছোট শহরগুলিতে জীবনযাত্রা প্রবাহিত হত মূলতঃ চার্চ, স্কুল ও গ্রামের মনোরোম হরিৎ প্রান্তরকে কেন্দ্র করে। এখানকার জনসাধারণ জোট বেঁধে বাস করত, ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে পরস্পরের অধিকতর নির্ভরতার মনোভাব ছিল। শহরের জনসম্মিলনিতে গণতন্ত্রের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল—সেখানে সকলে আলাপ

আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক শাসন পরিচালনা করতেন। এইভাবে বহুকাল পূর্বেই নিউ ইংল্যাণ্ডে দেখা গিয়েছিল দুইটি বিষয়ের অপূর্ব সমাহার—সংস্কার ও সাম্য পাশাপাশি চলেছিল সেখানে।

পটোম্যাক নদীর দক্ষিণে, যেখানে ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলাইনার বাগিচা মালিকরা দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল, সেখানে কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থা ততটা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। ঘন ঘন সভায় দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা প্রতিবাসীদের জুটিয়ে আনা কঠিন ছিল। তার কারণ হল কেন্দ্রস্থলে জমায়েৎ হওয়া ও ফিরে যাওয়ার জন্য সময়ের প্রশ্ন। সরকারী স্কুল চালানর পক্ষেও এটাই হল সবচেয়ে বড় বাধা, দূরত্বের কারণে তা হতে পারে নি। ফলে প্রতিটি বাগিচাই কার্যতঃ একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হয়ে দাড়াল, যেন পুরা-কালের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী এক একটি।

এইভাবে গড়ে উঠবার ফলে দক্ষিণে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। সেখানকার স্বাধীন অধিবাসীদের মধ্যে একদিকে ছিল সম্পদশালী অভিজাতরা যারা তাদের খামারে কাজ করবার জন্য ক্রীতদাস রাখত, আর অপরদিকে ছিল সাধারণ কৃষকরা যাদের অনেকে ছিল ভীষণ দরিদ্র, তারা দিনগুজরান করত কায়ক্লেশে। একমাত্র শহরগুলিতে ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে নিউ-ইংল্যাণ্ডের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিল না। এই দুটি অঞ্চলের স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যেও এই প্রভেদ প্রকট। উত্তরের অধিকাংশ লোকেরই বেশ ছিমছাম ধরণের সাদা কাঠের বাড়ী ছিল। দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলে সামান্য কয়েকজন বাগিচা মালিকের ছিল সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলে প্রাসাদোপম অট্টালিকা ; আর পাহাড়িয়া খামারগুলির শ্বেতাঙ্গ কৃষিজীবিদের সবচেয়ে ভাল বাড়ীগুলি হল সেই আদিম ধাঁচের কাঠের বাড়ী বা কেবিন। আর নিগ্রোদের সম্বন্ধে বলতে গেলে জর্জ ওয়াশিংটনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলতে হয় যে তা ছিল "এক গাদা ক্রীতদাস থাকবার জন্য মাথার উপর ঢাকনা মাত্র।"

দক্ষিণের লোকেরা ধর্ম প্রসঙ্গে খুব উদাসীন না হলেও তাদের মধ্যে নিউ-ইংল্যাণ্ডের গোড়ামি ছিল না। বাগিচাগুলিতে জীবনযাত্রা ছিল রমণীয়, আরও হত ভাল, লোকে বেশ গা এলিয়ে থাকত। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীতদাসদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হত এবং ফলে তারা অসুখী হলেও মোটের উপর তারাও এই জীবনযাত্রার ছকে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল। ধনী-ব্যক্তিরা নাচ,

মদ্যপান, শিকার, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বিলাসে আসক্ত ছিলেন—এই সমস্ত বিলাস-ব্যসনের কথায় নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের মনে ঘৃণা ও আতঙ্কের সঞ্চার হত।

মধ্য অঞ্চলে বড় বড় জমিদারী যেমন ছিল, তেমনি ছিল মাঝারি ও ছোট আকারের খামার। কোয়েকার-পন্থী উইলিয়াম পেনের হিতৈষণামূলক নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে পেনসিলভ্যানিয়া একদল সুখী কৃষকের আবাসস্থল হয়ে উঠল। সেখানে সকলেরই বাড়ী ছিল এবং রেড ইণ্ডিয়ান প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেশ শান্তিতেই বাস করত তারা। সেখানে আইনের ন্যায়দণ্ড সমভাবে প্রযুক্ত হত, শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল এবং কোয়েকার অধ্যুষিত এই প্রদেশে যেভাবে খুশী ভজনা করা চলত। "ভ্রাতৃসুলভ প্রীতির" নগরী ফিলাডেলফিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রধান নগরীতে পরিণত হয়েছিল। মুদ্রাকর ও রাষ্ট্রনীতিক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এই নগরীর সমৃদ্ধিতে আরও সহায়তা করেন।

নিউইয়র্ক নগরী আজ যে বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল নগরীর ইতিহাসের প্রথম দিকে। সর্বজাতির কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে নিউইয়র্কের খ্যাতি চিরকালের। ওলন্দাজদের আমলেই এর সূত্রপাত। হাডসন নদীর উপর এর অবস্থিতি এবং পোতাশ্রয়টিও অতি সুন্দর। হাডসন নদী একে দেশের অভ্যন্তর ভাগের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছি-

দেশের এই বিভিন্ন ধরণের জনগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত কি করে ভাই ভাই হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়েছিল, সেটাই হল আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসের মূল কথা। প্রথমতঃ তাদের পরস্পরকে জানতে হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে, এমন কি তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত দেশে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। পথঘাট ছিল অতি সামান্য আর তাও খুবই খারাপ। গাড়িতে করে মাত্র কয়েক শ' মাইল যেতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। উত্তর থেকে দক্ষিণ ক্যারোলাইনা বা জর্জিয়ায় যাবার একমাত্র পথ ছিল আটলান্টিক সমুদ্র দিয়া জাহাজে।

পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও উপনিবেশগুলির মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হচ্ছিল। ডাক চলাচল ব্যবস্থার পত্তন হল এবং মুদ্রণ যন্ত্র আমদানী করা হল। ধীরে ধীরে চিঠিপত্র, খবরের কাগজ ও পত্রপুস্তিকার আদান প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারারও বিনিময় হতে লাগল।

উপরন্তু উপকূলভাগের সহস্র মাইল পরিমিত এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলেও বসতিকারিগণের মধ্যে অনেক কিছুই একই ধরণের ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল ইংরেজ; ইংল্যাণ্ডের স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কিত আচার আচরণ, যথা জুরির দ্বারা বিচার কিংবা স্বাধীন ইংরেজরা আর যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেত সেগুলি চালু করেছিল তারা। সেখানকার ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলি সরকারী অর্থের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করত এবং একাধিকবার তারা বিধান প্রণয়নে বাধা দেবার জন্য রাজা কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণরের বেতন আটকে দিয়ে তার শাস্তিবিধান করেছে। একমাত্র স্বাধীন ইংরেজ বংশোদ্ভূতরাই এরকম কাজ করতে সাহস পায়।

যথাকালে কলোনিগুলি পরস্পরের সঙ্গে কাজ কারবার শুরু করল এবং সকলের সমস্বার্থমণ্ডিত বিষয়ে একযোগে কাজ করতে লাগল। এই ধরণের প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বিত হল ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে। তখন ম্যাসাচুসেট্‌স বে, প্লিমাথ, কনেটিকাট এবং নিউ হ্যাভেন নিউ ইংল্যাণ্ড কনফেডারেশনে যোগদান করে, উদ্দেশ্য: "আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক কার্য, সমস্ত ন্যায়কার্যে পরস্পরের পরামর্শ গ্রহণ যার ফলে সত্য ও স্বাধীনতার ঐশীবাণীর রক্ষা ও প্রচার সম্ভব হয় এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধিত হয়।" নিউ ইংল্যাণ্ড কনফেডারেশনের কাউন্সিলের অধিবেশন বেশ কিছুকাল ধরেই বসত। শেষ পর্যন্ত ম্যাসাচুসেট্‌স—বে এবং প্লিমাথ একটি উপনিবেশ এবং কনেটিকাট ও নিউ হ্যাভেন আর একটি উপনিবেশে যুক্ত হয়ে যায়।

ভার্জিনিয়া, ম্যাসাচুসেট্‌স এবং নিউইয়র্কের প্রতিনিধিরা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য আর একটি পারস্পরিক হিতব্রতী সমিতি গঠন করেছিল। এর দ্বারা কার্যক্ষেত্রে লাভ হয়েছিল সামান্যই। কিন্তু এটা হল এমন একটা নজীর যা উপনিবেশগুলিকে উত্তরকালে সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ব্রিটিশ আমেরিকা যে যে কারণে দৃঢ় মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তার প্রধান কারণ হল মহাদেশটির অধিকার নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে মরণ পণ লড়াই। নূতন পৃথিবীতে ফরাসী ও স্প্যানিশরা যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলছিল, ইংরেজরা ১৬৯০ সালের পূর্বে তৎপ্রতি বিশেষ নজর দেয় নি। কিন্তু জমি দখল করা নিয়ে ঐ সমস্ত রাষ্ট্রে যখন ইংরেজের সঙ্গে রেষারেষি শুরু করল তখন ইংরেজ উপনিবেশগুলি দেখল যে তাদের নিয়েই টানা হেঁচড়া শুরু হয়েছে।

তাদের সীমান্তে তখন অন্যেরা এসে হামলা করে পালিয়ে যায়; ফরাসী ও স্প্যানিশদের নিযুক্ত রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের উপর হামলা চালায়; এবং সবার উপরে উপকূলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল সম্ভাব্য বিজয়ীদের কার্যকলাপে। এই সমস্ত বিপদের ফলেই ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা সতর্ক হয়ে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নতুন পৃথিবীতে ফরাসীদের যে সাম্রাজ্য ছিল তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ক্যানাডার এক বিরাট অংশ মিসিসিপি নদীর উপত্যকা এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ভাগ অর্থাৎ আধুনিক মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল। এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল এ্যালিথেসি পর্বতমালা থেকে রকি পর্বত পর্যন্ত এবং ক্যানাডা থেকে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত। এ্যালিথেসি পর্বতমালার পূর্বদিকে স্বল্পপরিসর অঞ্চলজুড়ে ইংরেজদের মোট যে ভূমির অধিকার ছিল ফরাসীদের সাম্রাজ্যের এই আয়তন তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশি।

এই অঞ্চলের উপর ফ্রান্স, যে অধিকার দাবী করেছিল তার মূলে ছিল অত্যুৎসাহী মিশনারী এবং কতিপয় অভিজাত ব্যক্তির অভিযান। এই অভিজাতদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন রেনে রবার্ট ক্যাভেলিয়ার। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেট লেকস্ থেকে যাত্রা করে মিসিসিপি নদীর সন্ধান পান এবং তার ভাঁটা ধরে দক্ষিণে মেক্সিকান উপসাগরে উপনীত হন। এইভাবে তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেশটি পরিভ্রমণ করেন। ক্যাভেলিয়ার মিসিসিপির মোহনায় ফ্রান্সের পতাকা উত্তোলন করেন এবং যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তিনি এসেছেন তার সমস্তটার উপরই রাজা চতুর্দশ লুই-এর অধিকার দাবী করেন। রাজার সম্মানে তিনি এই ভূভাগের নামকরণ করেন লুইজিয়ানা।

নতুন পৃথিবীতে ফরাসীদের সাম্রাজ্যের আয়তন অতি বিশাল হলেও সেখানে ঔপনিবেশিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ হাজারের মত। অপরদিকে পূর্ব অঞ্চলে ইংরেজদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ কিন্তু জনসংখ্যার এই অসাম্য ফরাসী [illegible] দূর করতে পেরেছিল অন্য উপায়ে। তারা রেড ইণ্ডিয়ানদের মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেছিল। ফরাসীরা তাদের সংগে সমগোত্রীয়ের মত ব্যবহার করত, তাদের সংগে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং নিজেদের প্রয়োজনে তাদের কাজে লাগাত। অপরদিকে ইংরেজরা নতুন পৃথিবীর পরিবেশের সংগে অতি সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি।

আমেরিকা মহাদেশের অধিকার নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রায় ৭৫ বছর কাল যে সংগ্রাম চলেছিল তার সূচনা হয় ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। উইলিয়মের রাজত্ব তখন। ক্যাথলিকধর্মী ফ্রান্স এবং প্রোটেষ্টাণ্টবাদী ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধের আগুনের আঁচ এসে পৌছায় আমেরিকায় এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা অনতিবিলম্বে আত্মরক্ষার যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে।

এ্যালিঘেনি পর্বতমালার একখাতের মধ্যদিয়ে ইংরেজদের একটি উপনিবেশ পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই উপনিবেশটি অর্থাৎ নিউইয়র্ক গ্রেটলেকস্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তার উত্তর সীমান্ত ছিল ক্যানাডা, ফরাসীরা দেখল ইংরেজদের হাতথেকে যদি এই উপনিবেশটি ছিনিয়ে নেওয়া যায় তাহলে আমেরিকায় ব্রিটেনের অধিকৃত ভূখণ্ড দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে। আর তার পর নিউইয়র্ক থেকে ফরাসীরা আটলান্টিক উপকূল বরাবর উত্তরে ও দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে নূতন পৃথিবীতে ইংলণ্ডকে পর্যুদস্ত করে ফেলবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ক্যানাডার ফরাসী গভর্ণর কাউণ্ট ফ্রণ্টেনাক ক্যানাডার সীমান্ত থেকে নিউইয়র্ক এবং নিউইংলণ্ডের উপর কঠোর আক্রমণ চালাবার নির্দেশ দিলেন। ফরাসীরা এবং তাদের সহযাত্রী হিসাবে রেড-ইণ্ডিয়ানরা নিউইয়র্কের সেনেকটাডি এবং নিউহ্যাম্পশায়ারের ডেভার, এই শহর দুটির উপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে শহর দুটি বিধ্বস্ত করে ফেলল।

১৬৯৭ সালে ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধ হারজিতের মীমাংসা না হয়েই শেষ হল। ১৭০১ সালে স্প্যানিশ সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ শুরু হল, কারণ রাজা চতুর্দশ লুই তখন স্পেনের শূন্য সিংহাসন দাবী করে নিজের পৌত্রকে তাতে আসীন করেন। রাজা লুই আশা করেছিলেন এর ফলে ক্যাথলিক পন্থী ফ্রান্স এবং স্পেন একতাবদ্ধ হয়ে প্রোটেস্টাণ্টপন্থী ইংলণ্ডকে পরাজিত করতে পারবে। যাইহোক, এই যুদ্ধের জন্য ইংরেজরা দস্তুরমত তৈরী ছিল এবং ইউরোপের রণভূমিতে ডিউক অব মার্লবরো ফরাসীদের হারিয়ে দিলেন। আমেরিকায় এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল এবং উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা এবং নিউইংলণ্ডে রেড-ইণ্ডিয়ানদের হামলা বেশ সাফল্যের সংগেই ফরাসীরা চালিয়ে যেতে থাকল। কিন্তু ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের যে সন্ধি হয় তদনুসারে ফ্রান্স বিজয়ী ইংরেজদের হাতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং অপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তুলে দিতে বাধ্য হয়।

আবার ১৭৪৪-৪৮ সালে রাজা জর্জের যুদ্ধের সময় আমেরিকা এই আন্তর্জাতিক অশান্তির ফল উপলব্ধি করে। এই গোলমালের সময় ঔপনিবেশিক সৈন্য বাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল।

পূর্ববর্তী যুদ্ধ সমূহে ইংরেজরা ঔপনিবেশিক বাহিনীকে মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছে এবং ছোটখাটো সংঘর্ষে তাদের নিয়োগ করেছে—ইংরেজ নৌবহর সেই সময় তাদের সাহায্য করত। কিন্তু তবুও সহযোগীতার অভাবের জন্য এর ফলাফল খুব একটা ভালো হয়নি। কিন্তু রাজা জর্জের যুদ্ধের সময়, কেপব্রেটন আইল্যাণ্ডে সেণ্টলরেন্স নদীর মোহনা রক্ষা করবার জন্য যে লুইবরো দুর্গটি ছিল, মেইন-এর কর্ণেল উইলিয়ম পেপারেল ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই শক্তিশালী দুর্গটি দখল করেন। নিউইংলণ্ডের আইনসভাগুলির বিধানবলে এই সৈন্য-বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং কমোডোর ওয়ারেন-এর নেতৃত্বে একটি বৃটিশ নৌ-বহর তাদের সাহায্য করেছিল। ফরাসীদের কয়েকটি যুদ্ধ ঘাঁটি অবরোধ কালে আমেরিকানরা প্রচুর সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিয়ে সাফল্যলাভ করেছিল। এর ফলে তারা প্রশংসার্হ হয়েছিলেন, আর নিউ ইংলণ্ডের জনসাধারণের গর্বে বুক ভরে উঠেছিল।

যাইহোক, যুদ্ধ শেষ হল এবং ঔপনিবেশিগুলিতে দেখাদিল হতাশা এবং ক্রোধ। শান্তির সর্ত হিসেবে ইংরেজরা ফ্রান্সকে লুইবরো দুর্গ ফিরিয়ে দিল। উপনিবেশবাসীরা মনে করল যুদ্ধে তাদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়েছে। উপনিবেশ-বাসীদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য ইংলণ্ড তাদের যুদ্ধ অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করলেন। ইংলণ্ডের মনস্তুষ্টিবিধানের এই প্রচেষ্টা, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে নূতন পৃথিবীর অধিকার নিয়ে শেষ সংগ্রামটি, 'সেভেন ইয়ারস ওয়ার' কিংবা 'ফ্রেঞ্চ এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ওয়ার' (১৭৫৬-৬৩) তখন ঘনিয়ে এসেছে।

শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকাতেই যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা নয় পৃথিবীর সর্বত্রই তা ছড়িয়ে পড়েছিল। উভয় দেশেরই সাম্রাজ্যবাদের স্পৃহা প্রকট হয়ে উঠেছিল। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গা এই উভয়দেশ পণ্যের নতুন বাজার, ধনসম্পদ ও নূতন উপনিবেশের সন্ধানে গিয়েছিল, তার সর্বত্রই এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল।

ইংলণ্ড বুঝেছিল এই সংগ্রামে তার সম্পদ ব্যয়িত হবে অত্যন্ত বেশি। ফলে সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল থেকে যৎকিঞ্চিৎ হলেও যে সাহায্য পাওয়া যাবে

তার মূল্য হবে অপরিসীম। অতএব ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় উপনিবেশ-গুলিকে তাদের শক্তি সংহত করতে বলা হল এবং নিউইয়র্কের আলবেনিতে একটি সম্মেলন আহূত হয়।

আমেরিকার সুবিখ্যাত কতিপয় চিন্তানায়ক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পেনসিলভ্যানিয়ার প্রতিনিধি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, রোড আইল্যাণ্ডের প্রতিনিধি ষ্টিফেন হফ্‌কিন্স এবং ম্যাসাচুসেট্‌সের প্রতিনিধি টমাস হাচিনসন। সংস্কার মুক্ত এই সমস্ত চিন্তানায়করা ফরাসী এবং রেডইণ্ডিয়ানদের সংগে যুদ্ধের আশংকা দূরীভূত করবার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। এই সূত্রেই তারা আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলির ভবিষ্যতও ভাবতে থাকলেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন ইউনিয়ন গঠন করবার একটি মনোজ্ঞ পরিকল্পনা পেশ করলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি জেনারেল কাউন্সিল গঠিত হবে, তার সদস্য সংখ্যা হবে ৪৮ জন এবং এই ৪৮ জন নির্বাচিত হবে ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক। কাউন্সিলে কলোনীগুলির প্রতিনিধিত্বের হার নির্ধারিত হবে তার সম্পদ এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে। কাউন্সিলের দায়িত্ব হবে ঔপনিবেশিক সৈন্যদল গঠন ও পোষণ করা, কর নির্ধারণ করা এবং সরকারী কাজকর্ম চালান। কাউন্সিলের শীর্ষে থাকবেন রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রেসিডেণ্ট জেনারেল। তাঁর ক্ষমতা থাকবে বিধিবদ্ধ আইনগুলির বিচার বিবেচনা করবার এবং কাউন্সিলের সম্মতিক্রমে সামরিক অধিনায়কদের নিযুক্ত করবার।

ফ্র্যাঙ্কলিনের পরিকল্পনা বাস্তবানুগ হলেও তা অগ্রাহ্য হল। উপনিবেশ-গুলির গভর্ণরগণ এবং আইনসভাগুলি মনে করলে যে এতে কর্তৃত্ব খুব বেশি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। ইংরেজরাও এই পরিকল্পনা সম্পর্কে শংকিত হয়েছিল এইভেবে যে এর ফলে নিজেদের সম্পর্কিত বিষয়ে কলোনীগুলির এতটা স্বাধিকার থাকার চেষ্টা খুব নিরাপদ নাও হতে পারে। আবেনি পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলেও আমেরিকার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এথেকেই উপনিবেশবাসীরা ইউনিয়ন গঠনের সূত্রটি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে যে কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেস, যারা স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছর আমেরিকাকে শাসন করেছিল, গঠিত হয়েছিল এই ইউনিয়নের ভিত্তিতে।

অতএব, ইংলণ্ডের সংগে সহযোগীতা করবে কিনা, কিংবা ফরাসীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবে কিনা, সেটা নির্ভর করল এককভাবে উপনিবেশগুলির উপর। ইতিমধ্যে কিন্তু এ্যালিঘেনি পর্বতমালার পশ্চিমে ওহায়ো উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে যদিও তা তখনো ঘোষিত হয় নি।

বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়ের নিকটই এই অঞ্চলটির দখলদারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইংলণ্ড যদি এই ভূভাগ দখলে রাখতে পারে তাহলে তার উপনিবেশ-গুলি থেকে লোকজন এ্যালিঘেনি পেরিয়ে এসে একদিন সেখানে বসতি করতে পারবে এবং নিজেদের মহাদেশের বিস্তার ঘটাবে। অপরদিকে ফ্রান্স যদি দখলে রাখতে পারে তাহলে তারা ইংরেজদের উপকূলেই আটকে রাখতে পারবে এবং যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহকরে ইংরেজদের যথাসময়ে নতুন পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে।

ফরাসীরা ওহায়ো নদী এবং তার শাখানদীগুলি বরাবর পরপর কয়েকটি দুর্গ তৈরী করতে থাকল। ভার্জিনিয়ার গভর্ণর ডিন উইডি জর্জ ওয়াশিংটন নামক একজন একুশ বৎসর বয়স্ক মেজরকে পাঠালেন ফরাসীদের সতর্ক করে দিতে যাতে তারা ব্রিটিশরাজের সম্পত্তি এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। এইভাবে ওয়াশিংটনের নামের সংগে আমরা প্রথম পরিচিত হলাম। ফরাসীরা ওয়াশিংটনের কথায় কর্ণপাত করল না। ফলে বৃটিশ অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য ওয়াশিংটন ফোর্ট নেসাসিটি নামক দুর্গ তৈরী করলেন এবং সেখানে সৈন্য সমাবেশ করলেন। কিন্তু এই ঘাঁটি রক্ষার মত যথেষ্ট লোকবল তাঁর না থাকায় ফরাসীরা যখন আক্রমণ করল ওয়াশিংটন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

এই পরাজয়ের গ্লানি দূর করবার জন্য ইংরেজরা ফরাসীদের ফোর্ট ডুকান নামক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গটি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য জেনারেল ব্র্যাডকের নেতৃত্বে দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করল। ওয়াশিংটনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ব্র্যাডক ইউরোপীয় প্রথায় ঘন ঘন সারিতে লোক সাজিয়ে আক্রমণ চালালেন। ফরাসী এবং রেডইণ্ডিয়ানরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ করছিল এবং তাদের স্থির নিশানা ইংরেজ সৈন্যদের সহজেই গুলীবিদ্ধ করতে লাগল। তরুণ ওয়াশিংটন মান রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন (বুলেটের ঘায়ে তাঁর ইউনিফর্ম ছিন্ন হয়েছিল এবং তিনি আসীন থাকতে থাকতে দুইটী ঘোড়া গুলীবিদ্ধ হয়েছিল)।

কিন্তু ব্র্যাডকের বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল, এক হাজার সৈন্যর সংগে তিনিও সেই যুদ্ধে মারা যান।

ফরাসীদের জয়ের পালা এল। ইংরেজগণ এবং ঔপনিবেশিকদের মধ্যে সহযোগীতার অভাবও এই জয়ের মূলে ছিল। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক আইনসভা কিছু কিছু সৈন্য যোগালেও তারা চাইত যে সৈন্যদের কোথায় পাঠান হবে ও কে তাদের নেতৃত্ব করবে সেটা তারাই ঠিক করবে। অপরদিকে বৃটিশ জেনারেলরা ঔপনিবেশিক সৈন্যদের নিকৃষ্ট ধরণের মনে করত এবং তাদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করত।

১৭৫৭ সালের সেই দুর্দিনে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সমরমন্ত্রী উইলিয়ম পিট দপ্তরের ভার নিলেন। বিজ্ঞ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং উৎসাহী উইলিয়ম পিট ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক বাহিনীতে নবজীবনের সঞ্চার করলেন এবং তাদের উত্তরে গ্রেটলেকস্ এবং কানাডার সীমান্ত পর্যন্ত পাঠালেন। এই অভিযানে বহু ফরাসী দুর্গ দখল করা হল, তার মধ্যে ফোর্ট ডুকানও ছিল। এই দুর্গটির পিটের সম্মানে নামকরণ হল পিট্‌স্‌বার্গ।

শেষ পর্যায়ে এলো ক্যানাডা অর্থাৎ নূতন ফ্রান্সের উপর আক্রমণ। ১৭৫৯ সালে কুইবেকের যুদ্ধে এই সংগ্রামের নিষ্পত্তি হয়, সেখানে প্রত্যুষের পূর্বে ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল উল্‌ফ্‌ আক্রমণ চালিয়ে ফরাসী অধিনায়ক মার্কুইস-মণ্টকাম-কে হতচকিত করে দেন। এই জয়লাভের পর পরবর্তী বৎসর কানাডায় উৎখাত পর্ব চলেছিল।

পৃথিবীর সর্বত্রই ইংরেজরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিতল। স্পেন যখন ফরাসীদের সাহায্যে এগিয়ে এল ব্রিটেন তখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে স্পেনের অধিকৃত অঞ্চল অবরোধ করল এবং হাভানা, কিউবা এবং ফিলিপাইনসের ম্যানিলা অধিকার করে নিল। ভারতবর্ষেও ইংরেজরা ফরাসীদের উপর পুরাপুরি জয়লাভ করলে।

১৭৬৩ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে সমগ্র ক্যানাডা এবং নিউ অর্লিয়নস্ ব্যতিরেকে মিসিসিপি নদীর পূর্বতীরস্থ বিরাট ভূভাগ ব্রিটেনকে সমর্পণ করল। নিউ অর্লিয়নস পেল স্পেন এবং ফরাসীরা স্পেনকে মিসিসিপির পশ্চিমস্থ তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি দিল। নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলের অদূরে দুটি ছোট দ্বীপের অধিকার ফরাসীদের রাখতে

দেওয়া হল, সেখানে তাদের মৎস্যশিকারী জাহাজগুলি থাকবে। আজও দ্বীপ দুটি ফরাসীদের দখলে আছে।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় ফ্রান্সের সমস্ত সম্ভাবনা লোপ পেল এবং তখন ইংলণ্ডের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রইল স্পেন। তবে বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় সেদিন স্পেনের প্রকৃত দখল ছিল খুবই কম। তারা বরং মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় সাম্রাজ্যের প্রসারে অধিক যত্নবান ছিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই জয়লাভ আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের কাছে বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা সেনাদল গঠন এবং যৌথস্বার্থের খাতিরে রসদসংগ্রহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে সহযোগীতার বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছিল। পৃথকভাবে শাসিত ১৩টি উপনিবেশের মধ্যে ঐক্য এসেছিল বেশ কয়েক বছর পরে কিন্তু তবুও এই যুদ্ধটি হয়েছিল সেই পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। যুদ্ধের অপর ফল হল যে কলোনীগুলি তাদের নিজেদের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হোল। ইংরেজরা বদ্‌খদ্‌ পোষাকে সজ্জিত আমেরিকান সেনানীদের দেখে যতই নাসিকা কুঞ্চিত করুক না কেন মূল কথা হল যে ইংরেজদের পেশাদারী সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা সাফল্যের সংগে বিভিন্ন যুদ্ধে লড়েছে এবং আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন সৈনিক হিসেবে ইংলণ্ড থেকে যারা এসেছিল তাদের সবার চেয়ে উঁচু দরের।

আর, এই যুদ্ধের ফলে এ্যালিঘেনির অপর পারে এবং মহাদেশের অভ্যন্তরে বিস্তারলাভ করবার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হল। সেখানে নূতন ভূখণ্ড ও নূতন সুযোগ রয়েছে শত শত মাইল বিস্তৃত এলাকায়, আর সেইখানেই আমেরিকানদের স্বাধীনতা এবং সকলের সমান সুযোগ লাভের অধিকারেরও বিস্তৃতিলাভ ঘটবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমেরিকার বিপ্লব

আমেরিকার বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়—যেমন রাজা তৃতীয় জর্জ এবং পার্লিয়ামেণ্ট কিভাবে উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছিল, সরকারে প্রতিনিধিত্ব না দিয়ে কর ধার্য করেছিল, তাদের বাড়ীতে সৈন্যদের রাখতে বাধ্য করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত উপনিবেশগুলিকে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছিল। এই কারণগুলি কিন্তু বাহ্য, এগুলির পিছনে ছিল কয়েকটি মূল বিষয়: এগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ মুখ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রূপ এবং তার সঙ্গে কলোনিগুলির সম্পর্ক প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী মতবাদ।

আমেরিকানদের মতে তেরটি উপনিবেশ হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ তেরটি স্বায়ত্বশাসনশীল অঞ্চল, যেমন আছে বর্তমানের ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া। এই সমস্ত উপনিবেশের অধিবাসীরা ইংরেজ, এবং একারণে ম্যাগ্‌না কার্টার সময় থেকে ইংরেজরা যে সমস্ত সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে, উপনিবেশ-বাসীরাও সে সব সমানাধিকার পাবার অধিকারী বলে নিজেদের মনে করত। রাজার প্রেরিত গভর্ণর তাদের আইনসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে এতে আমেরিকানদের তেমন আপত্তি ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গভর্ণর আইনসভাকে লঙ্ঘন করবেন না, বা সভার ইচ্ছানুযায়ী চলবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গভর্ণররা এর ব্যত্যয় করতেন না, কারণ তারা বেতন পেতেন কলোনিগুলি থেকেই।

বহুদূরে অবস্থিত রাজা আঞ্চলিক বিবাদ বিসম্বাদে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন, এমন আশা তারা করতেন না। একারণ গভর্ণররা প্রায়শঃই অসুবিধার সৃষ্টি করত না।

জেমস্‌টাউনের পত্তনের সময় থেকেই ব্রিটিশ সরকার কলোনিগুলির অধিকার প্রসঙ্গে ভিন্নতর মত পোষণ করে এসেছে। তাদের মতে কলোনিগুলির পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনলাভের অধিকার নাই, এবং সেখানকার অধিবাসীরা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত রাজানুরক্ত ইংরেজদের সমান নয়। তাদের কর্তব্য হল প্রধানতঃ নূতন বাজার সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থরক্ষা করা। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে ব্রিটিশরাজকে নানান যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল বলে তারা কলোনিগুলিকে কঠোরভাবে শাসন করতে ও শোষণ করতে পারেনি। এখন, ১৭৬৩ সালে ফ্রান্স ও স্পেন হটে যাবার পর, তাদের মনে হল যে এইবার কর্তৃত্ব খাটাবার সময় হয়েছে। সময় হয়েছে নৌচলাচল আইন সংশোধন করে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থকে বলি দেওয়ার; সময় হয়েছে যুদ্ধের দরুণ কোষাগারে যে টান পড়েছিল, কর বাড়িয়ে তা পূরণ করবার।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষ ন্যায় বা কোন্ পক্ষ অন্যায় করেছিল সে প্রশ্নের কোন সম্যক জবাব দেওয়া যায় না। আমেরিকা মনে করত সে সাম্রাজ্য হবে কতকগুলি রাজানুরক্ত ও স্বাধীন কলোনী নিয়ে গঠিত ফেডারেশন, অপরপক্ষে ইংলণ্ড শক্তিশালীকেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতেই বিশ্বাস করত। উভয় পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করেছে এবং পরিণামে উভয়ের মধ্যেই গভীর অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। সচরাচর যেরকম ঘটে থাকে শেষপর্যন্ত মাথাগরম লোকেরাই চূড়ান্ত সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করেছিল।

আমেরিকানরা স্বাধীনতালাভের পর কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আমেরিকানরা যে মতবাদ প্রচার করেছিল তা গ্রহণ করেন। ১৭৬০ সালে অসন্তুষ্ট উপনিবেশ বাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকারকে যে সমস্ত বিষয়গুলি মেনে নেবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পেয়েছিল পরবর্তী কালে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ডোমিনিয়নশ তার অনেকগুলি গ্রহণ করেছিল।

সাম্রাজ্য সম্পর্কে ইংলণ্ডের ধারণা ছিল যে সবকিছুই হোল রাজার তাঁবেদার, তারা স্বায়ত্বশাসনশীল কোন অংশ নয়। শর্করা আইনের মাধ্যমে আমেরিকার বাণিজ্য যখন ব্যাহত করা হোল তার মধ্য দিয়ে এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রধানতঃ নিউ ইংল্যাণ্ড ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সংগে সবিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত ছিল। তারা গুড় আমদানী করত এবং তার থেকে 'রাম' তৈরী করে তা বিক্রী করত। এই ব্যবসায়ে নিউ ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের অধিকৃত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অঞ্চলকে উপেক্ষা করত কারণ তারা পণ্যের উচ্চ মূল্য দিতে পারত না। ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বাগিচা মালিকরা অভিযোগ করল যে তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। এবং পার্লামেণ্ট নিউ ইংলণ্ডকে জবরদস্তি করে তাদের সংগে বাণিজ্য করতে বাধ্য করল। এটা করা হোল ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে মাল আমদানীর ওপর অত্যন্ত উচ্চহারে রক্ষণমূলক শুল্ক বসিয়ে।

পশ্চিমাঞ্চলে অনেক জায়গা অধিকার করবার ফলে ইংরেজরা আর একটি অসুবিধা জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল যার দরুণ তারা আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থা কঠোরতর করতে বাধ্য হয় এবং ফলে গোলমাল বেড়ে চলে। নূতন এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল প্রধানতঃ ফরাসীরা এবং তাদের মিত্র রেড্-ইণ্ডিয়ানরা। ইংরেজদের সম্পর্কে তারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। ফরাসীরা রেডইণ্ডিয়ানদের এই বলে উত্তেজিত করল যে ইংরেজরা শীঘ্রই তাদের বাড়ীঘর থেকে বিতাড়িত করবে। ফলে রেডইণ্ডিয়ানরা চিফ্ পন্টিয়াকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে বসল এবং ইংরেজদের কয়েকটি দুর্গ দখল করল।

এরূপ অবস্থায় পশ্চিমাঞ্চলে পূর্বাঞ্চলের ন্যায় স্বায়ত্বশাসন চালু করা স্পষ্টতই সম্ভব নয়। সেখানে প্রয়োজন সৈন্য ও ফাঁড়ি এবং তাদের দিয়ে অ্যালিঘেনি পর্বতমালার অপরদিকস্থ শত্রুভাবাপন্ন অধিবাসীদের দাবিয়ে রাখা।

সুতরাং রাজা তৃতীয় জর্জ এবং তদীয় মন্ত্রীসভা পশ্চিমাঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিলেন এবং কলোনীগুলির অধিবাসীদের পক্ষে সেখানে বসতির পত্তন করা বন্ধ করলেন। যারা ইতিমধ্যেই অ্যালিঘেনি পেরিয়ে ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের উপর ফিরে আসবার হুকুম জারি হোল। রাজা আরো ফর্মান্ দিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলের রেডইণ্ডিয়ানরা ভবিষ্যতে তাদের জমি শুধুমাত্র সরাসরি রাজার কাছে বিক্রী করবে। এছাড়া তিনি

সরকারের পক্ষে লাভজনক পশুলোম ব্যবসায় চালাবার জন্য কয়েকজন এজেন্ট নিযুক্ত করেন। আমেরিকানরা এতে শুধু নিরাশই হোল না তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোল।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে রাজার এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে কিছু পরিমাণ যৌক্তিকতা ছিল আর এরকম করবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা গিয়েছিল। উপনিবেশ বাসীদের পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে যদৃচ্ছভাবে সেখানকার সম্পদ শোষণ করতে দিলে পরিণামে বিশৃংখলা দেখা দিতই। অপরপক্ষে একথাও বলা চলে যে আমেরিকানদের পুরাপুরি উপেক্ষা করে রাজা জর্জ ও তার মন্ত্রীরা অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়েছেন কারণ আমেরিকার সৈন্যরা ফরাসীদের পরাজিত করতে সাহায্য করেছিল এবং স্বতই তারা এই সাফল্যের সুফল উপভোগ করবে বলে আশা করেছিল।

এইভাবেই পশ্চিমাঞ্চলের বিপুল সম্পদের মালিকানা রাজার হাতে চলে গেল, কলোনীগুলির কিছুই রইল না। এর উপর আবার বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো কয়েক হাজার ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা হোল নতুন দুনিয়ার সম্পদ রক্ষা করবার জন্য এবং তাদের ভরণপোষণের খরচার অংশ কলোনিগুলিকে দিতে হোল। কলোনিবাসীদের দুর্ভাগ্যের শেষ এখানেই নয়। কোয়ার্টারিং এ্যাক্ট মারফত ইংলণ্ডথেকে নির্দেশ এলো যে সৈন্যদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থায় তাদের সাহায্য করতে হবে।

কলোনিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতিটি ব্যবস্থাতেই যে প্রবল গোলযোগের সূত্রপাত হোত তা থেকেই রাজা এবং পার্লামেন্টের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। অপরপক্ষে আমেরিকানরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে এত বেশিমাত্রায় সচেতন ছিল যে অতি সামান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতেও তারা ভীষণ গোলমাল শুরু করে দিত। সূচের খোঁচা মনে হোত যেন তরবারির আঘাত।

১৭৬৪ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জর্জ গ্রেনভিল। তিনি আমেরিকা সম্বন্ধে জানতেন খুব সামান্য এবং তাদের সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তা তাঁর ভাল লাগেনি। একদল কাষ্টমস্ অফিসার এবং টহলদারী জাহাজ আমেরিকায় পাঠিয়ে তিনি নৌ-চলাচল আইন আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করলেন। তারপর সংবাদপত্র, পুস্তিকা এবং দলিল দস্তাবেজের উপর ট্যাম্প

শুল্ক আদায়ের প্রস্তাব করলেন। এই শুল্ক থেকে যে অর্থ আসবে তা থেকে আমেরিকায় ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের সহায়তা হবে।

পার্লামেন্টে ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট যখন পাশ হোল তখন কিন্তু ব্রিটেন বা আমেরিকায় কেউ-ই ধারণা করতে পারেনি যে এর কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে। উদাহরণ স্বরূপ—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পর্যন্ত কোন গোলমালের আশংকা করেন নি। তিনি বরং তার দুজন বন্ধুকে ষ্ট্যাম্পবিক্রীর চাকরীর জন্য দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু আইনটি পাশ হবার সংগে সংগেই আমেরিকার সমস্ত কলোনি এটিকে প্রতিরোধ করতে লাগল। ভার্জিনিয়ার প্যাট্রিক হেনরি হাউস অব্ বার্গেস-এ ঘোষণা করলেন ভার্জিনিয়া বাসীদের উপর কর ধার্য করবার অধিকার একমাত্র ভার্জিনিয়া আইনসভারই আছে। তিনি তারপর এইমর্মে এক প্রস্তাব পাশ করালেন যে, ভার্জিনিয়া আইনসভা ছাড়া "অন্য যে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি-গোষ্ঠিকে এই ধরণের ক্ষমতা দেবার যে কোন প্রয়াসই বে-আইনি, সংবিধানের অসম্মত এবং অন্যায়; এবং এর উদ্দেশ্য হোল ব্রিটিশ তথা আমেরিকানদের স্বাধীনতা নষ্ট করা"।

ষ্ট্যাম্প অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ম্যাসাচুসেটসেও প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সেখানে জেমস্ ওটিস্ এবং স্যামুয়েল অ্যাডামস্ যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। জননেতা অ্যাডামস্ সুবক্তা ছিলেন। ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ব্যবস্থার প্রচণ্ড নিন্দা করে তিনি ইতিমধ্যেই বিখ্যাত। অ্যাডামস্ ব্রিটিশ সিংহকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে বললেন যে আইনসম্মতভাবে প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর ধার্য করার অর্থ হোল জনসাধারণকে ক্রীতদাসে পরিণত করা।

নিউ ইংলণ্ড নিউ ইয়র্ক এবং পেনসিল ভ্যানিয়ায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। ষ্ট্যাম্প বিক্রেতারা জনসাধারণের চাপে পড়ে কাজ ছেড়ে দিল। সনস্ অব লিবার্টি প্রভৃতি কয়েকটি চরমপন্থী দল গঠিত হোল আরো উত্তেজনার খোরাক জোগাবার জন্য। নয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হোল তাতে ভার্জিনিয়ার সুরে সুর মিলিয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হোল যে কলোনিগুলিতে কর ধার্য করার অধিকার শুধুমাত্র সেখানকার আইনসভাগুলিরই আছে।

ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষরা কিন্তু কলোনির অধিবাসীদের এত গোলমাল

করবার কোন কারণই খুঁজে পেল না। তাদের মতে পার্লামেন্ট হচ্ছে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং তারা সকলেরই স্বার্থ রক্ষা করে। ইংলণ্ডের অনেক অংশই পার্লামেণ্টে কোন প্রতিনিধি নির্বাচন করত না তবুও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জনসাধারণ তাঁদের কমন্স সভায় নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপিত করবার সুযোগ ছিল এবং তারই ফলে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ রক্ষিত হবার একটা নিশ্চয়তা ছিল।

প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের মতবাদ তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নানারূপ টালবাহানার মধ্য দিয়ে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অন্যতম পদক্ষেপ হোল আমেরিকার এই বক্তব্য। কোন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় সেখানকার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে সরকার কোনরূপ কর ধার্য করতে পারবেন না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাজনৈতিক ভাবধারায় এইখানেই হোল মূল পার্থক্য এবং শেষ পর্যন্ত এর মীমাংসা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে।

ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট মাত্র এক বৎসর চালু থাকার পর প্রত্যাহার করা হয়। আমেরিকানরা এতে প্রচণ্ড উল্লসিত হয়েছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আরো কয়েকটি অত্যন্ত বিশ্রী আইন জারী করা হোল। টাউনসেণ্ড অ্যাক্টে উপনিবেশগুলিতে আমদানী করা কাঁচ, সীসা, রং, কাগজ এবং চায়ের উপর নতুন করে শুল্ক বসান হোল এবং বলা হোল এ থেকে যে রাজস্ব আসবে রাজা নিযুক্ত গবর্ণরের বেতন দেওয়া হবে সেই অর্থ থেকে। এইভাবে এই সমস্ত রাজকর্মচারীদের উপর উপনিবেশের আইনসভাগুলির যে কর্তৃত্ব ছিল তা নষ্ট হোল, এবং অন্যদিকে পার্লামেন্ট স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল যে তারা আমেরিকানদের সমস্ত বিষয়েই অধিকতর কর্তৃত্ব খাটাতে চায়।

আমেরিকায় আবার জোর প্রতিবাদ উঠল। এবং স্যামুয়েল অ্যাডামস্ কলোনিগুলিতে সার্কুলার পাঠিয়ে তাদের টাউনসেণ্ড অ্যাক্ট এবং নৌ-চলাচল আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান করলেন, কারণ এই সব আইনে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছিল। ফলে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আন্দোলন শুরু হোল এবং ব্রিটেনও খুব রেগে গেল। তারা ম্যাসাচুসেটসের আইনসভা ভেঙে দিল এবং বসটনে দুই রেজিমেন্ট ইংরেজ সৈন্য পাঠাল।

১৭৭০ সালের মার্চ মাসের যে দিনে ইংলণ্ড শুধুমাত্র চা ব্যতীত আর সমস্ত

পণ্যের উপর ধার্য করা শুল্ক প্রত্যাহার করেছিল সেইদিনই ব্রিটিশ সৈন্য এবং আমেরিকানদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। ইতিহাসে এটি 'বসটন ম্যাসাকার' নামে খ্যাত। কয়েকজন তরুণ একজন প্রহরীর গায়ে বরফের ঢেলা ছুঁড়ে মেরেছিল। প্রহরীটি তখন আর একজনকে ডেকে আনে। এইভাবে গোলমালের সূত্রপাত হয়। ক্রমে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভীত ইংরেজ সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করে। এই সংঘর্ষে পাঁচজন আমেরিকানের মৃত্যু ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত সামুয়েল অ্যাডামস্ যে দাবী করেছিলেন তদনুযায়ী বসটন থেকে ইংরেজ সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়া হয়।

বিপ্লবের পূর্ববর্তী দশ বছরে ইংলণ্ড এক একবার উপনিবেশগুলির প্রতি কঠোর হয়ে উঠেছিল আবার সেই কঠোর ব্যবস্থাগুলি রদও করেছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে তৎকালের যারা নীতি নির্ধারণ করতেন তারা আমেরিকায় কি নীতি অনুসরণ করবেন সে বিষয়ে একমত ছিলেন না। উইলিয়ম পিট এবং লর্ড নর্থ ছিলেন আপোষ আলোচনার পক্ষপাতী এবং তারা গ্রেনভিল কিংবা টাউনসেণ্ড প্রভৃতিরা যে সব শুল্ক ধার্য করেছিল সেগুলি প্রত্যাহার করতে কিংবা সংশোধন করতে চেষ্টা করতেন। ইংরেজ বণিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমেরিকার প্রতি সহানুভূতিশীল—এরা ছিলেন হুইগ্ দলীয়। এই বণিকরা চাইতেন সুখী এবং সমৃদ্ধ আমেরিকায় গিয়ে বাণিজ্য করতে। আমেরিকা শত্রুভাবাপন্ন হলে তাদের পণ্য বয়কট হবে এটা তারা চাইতেন না।

অপরপক্ষে আমেরিকায়ও ব্রিটিশের অনুকূলে কিছু লোক ছিল। এরা ছিলেন প্রধানতঃ পয়সাওয়ালা লোক। চরমপন্থীদের উত্তেজনায় যে দাঙ্গা অথবা বয়কট প্রভৃতি হোত তারা তার বিপক্ষে ছিলেন কারণ এই ধরণের বিশৃংখলায় ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়।

বিপ্লবের পূর্বে অধিকাংশ আমেরিকানই ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে মিশ্র মনোভাব পোষণ করত। নূতন কোন কর ধার্য হলে তারা ক্রুদ্ধ হোত এবং কর রহিত হলে তাদের মধ্যে স্বস্তি এবং কৃতজ্ঞতার ভাব দেখা দিত। উপনিবেশবাসী সাধারণ লোকে অবশ্য ইংলণ্ড থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ঠিক চায় নি। তারা চেয়েছিল ক্ষেত খামারে বা দোকান বাজারে শান্তিতে কাজ করে দিন গুজরান করতে। তবে মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসের গতি

নির্ধারিত করে চরমপন্থীরা। তারা শান্তিপূর্ণ জনসাধারণের মধ্যে যে বিভেদ বর্তমান তাকে দুস্তর করে তোলবার প্রচেষ্টা পায় এবং শেষ পর্যন্ত তার সমাধান দেখা যায় শুধুমাত্র হিংসাত্মক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

আমেরিকার চরমপন্থীদের এই সব কার্যকলাপের মধ্যে বিখ্যাত হোল ১৭৭৩ সালের বসটন 'টি পার্টি'। এই চা আমদানী করত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানীটি আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হয় এবং পার্লামেণ্টের রক্ষণাধীনে আসে। 'রাজা জর্জ' এবং পার্লামেণ্টে তার বশংবদরা স্থির করলেন যে কোম্পানীর যে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত চা আছে আমেরিকায় কম দামে সেগুলি বিক্রয় করবেন। এই চা এর উপর পাউণ্ড প্রতি তিন পেনী শুল্ক দিতে হলেও দেখা গেল যে তারা এমন দামে চা বিক্রী করতে চাইলেন যা আমেরিকানরা আর কোথাও পাবে না।

কিন্তু আমেরিকার দেশপ্রেমিকরা বিষয়টি অন্যভাবে দেখলেন। সস্তা দাম তাঁরা আমলই দিলেন না। তারা দেখলেন শুল্ক দিতে হচ্ছে। এই নীতিগত বিরোধই তাদের কাছে প্রকট হয়ে উঠল। 'একচেটিয়া ব্যবসায়' এবং পার্লামেণ্ট কর ধার্য করতে পারবে না এই ধূয়া তুলে তারা ঐ চা গ্রহণ করতে অরাজী হলেন। বসটনে অনেকগুলি জনসভা হোল এবং শেষে একদল নাগরিক রেডইণ্ডিয়ান সেজে জাহাজে উঠে চায়ের পেটিগুলি জলে ফেলে দিল।

আমেরিকানদের এই কাজে রাজা জর্জের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। উপনিবেশগুলির উপর তার কোনকালেই সহানুভূতি ছিল না। এইবার তিনি স্থির করলেন ম্যাসাচুসেটস্ বিশেষ করে অকুস্থল বসটনকে শাস্তি দেবেন। ১৭৭৪ সালে এর পরই যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসল তখন রাজার দাবীমত ইন্‌টলারেবল অ্যাক্টস্ গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে যতদিন পর্যন্ত জলে ফেলে দেওয়া চা-এর মূল্য মিটিয়ে দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত বসটনে সর্বপ্রকার সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ম্যাসাচুসেটস্ একটি ব্রিটিশ সৈন্য ঘাঁটিতে পরিণত হোল। তার প্রধান জেনারেল গেজ।

এই সমস্ত ঘটনায় অন্যান্য উপনিবেশগুলিও ব্যথিত হয়েছিল এবং তারা ম্যাসাচুসেটস্‌কে সহানুভূতি জানিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য পাঠাল। উত্তেজনা বেড়েই চলল। ভার্জিনিয়ার হাউস অব বার্জেস থেকে প্রস্তাব হোল সব কয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধি নিয়ে

ফিলাডেলফিয়ায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করবার। এই হোল প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস। ১৭৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ম্যাসাচুসেটসের জন অ্যাডামস্ স্যামুয়েল অ্যাডামস্ ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটন ও প্যাট্রিক হেনরী। সাউথ ক্যারোলাইনার জন রাটলেজ ও ক্রিষ্টোফার গ্যাড্‌সডেন্ প্রমুখ বিখ্যাত আমেরিকান নেতৃবর্গ।

এই সম্মেলন খুব সতর্ক ও সংযতভাবে অনুষ্ঠিত হোল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল "কলোনিগুলির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা······সেগুলির ন্যায্য অধিকার এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ বিজ্ঞজনোচিত পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা······এবং সমস্ত সৎ লোকেরা গ্রেট ব্রিটেন এবং উপনিবেশগুলির মধ্যে যে ঐক্য স্থাপিত দেখতে চান তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা"। একটি অধিকারের সনদ তৈরী করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হোল; এই সনদে উপনিবেশবাসীরা তাদের স্বাধীনতায় পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানাল এবং ঘোষণা করল যে প্রত্যেক শহর ও কাউন্টিতে বিভিন্ন কমিটি ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। যারা এই বয়কটের অন্যথা করবে কমিটি তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে যাতে কংগ্রেস জানতে পারে কারা আমেরিকার স্বার্থের অনুকূলে বা প্রতিকূলে চলছে। এই বিচিত্র উপায়ে কলোনিগুলির প্রতি অন্যায়ে যারা গা করেনি তাদের ভয় দেখান হোল। সমস্ত গোলমালের সমাধান না হলে ১৭৭৫ সালের মে মাসে আর একটি সম্মেলন হবে একথাও ঘোষণা করে দেওয়া হোল। গোলমালের কিন্তু সমাধান হোল না। ম্যাসাচুসেটসে তখন শত্রুতামূলক মনোভাব খুব প্রবল। সেখানকার স্থানীয় সৈন্যবাহিনী যারা খবর পাবামাত্রই যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে পারত বলে 'মিনিটমেন' বলে পরিচিত হয়েছিল, তারা করকর্ডে একটি অস্ত্রাগার স্থাপন করল। ১৭৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল জেনারেল গেজ বসটন থেকে একদল ব্রিটিশ সৈন্য পাঠালেন ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দখল করতে এবং জন হ্যানকক এবং স্যামুয়েল অ্যাডমস্ এই দুইজন বিশ্বাসঘাতককে গ্রেপ্তার করে আনতে।

পল রিভিয়ার এবং উইলিয়ম ডয়েস মাঝে দুজন দেশপ্রেমিক এই খবর নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়িয়ে গেলেন সবাইকে সাবধান করে দিতে। ইংরেজ সৈন্য এগিয়ে আসবার আগের দিন রাত্রে এই খবর পেয়ে কিছু সংখ্যক

'মিনিটমেন' তাদের রাস্তা আটকাবার জন্য তৈরী হয়ে রইল। ইংরেজরা তাদের ছত্রভঙ্গ হতে বলল, কিন্তু সে নির্দেশ পালিত হয় নি। তখন গুলি ছোঁড়া শুরু হোল, শুরু হোল আমেরিকার বিপ্লব। এই দিনের সংঘর্ষে আট জন আমেরিকান নিহত হয়।

কংকর্ড যাবার পথে ব্রিটিশরা খুব অল্পই বাধা পেয়েছিল। কিন্তু বসটনে ফিরবার পথে তাদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হোল। রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে এবং পাথরের দেওয়ালের আড়াল থেকে দেশপ্রেমীরা ইংরেজ সৈন্যদের উপর গুলি চালিয়ে বহুলোককে হতাহত করল। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যরা নিরাপত্তার জন্য নগরে ফিরে এলে কিন্তু সেখানে দেখতে পেলো ১৬ হাজার উপনিবেশবাসী সৈন্য তাদের ঘিরে ফেলেছে।

এই প্রথম যুদ্ধের সংবাদ অন্যান্য কলোনিতে পৌছালে অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি দেখা দিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় কেউ কেউ খুশি হয়েছিল। আবার অনেকে 'মিনিটমেন'দের এই হঠকারিতার নিন্দা করলেন। অধিকাংশ লোকই ভাবছিলেন যে তখনও হয়তো শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা রয়েছে।

১০ই মে ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হোল, সকলেই তখন অব্যবস্থিত চিত্ত। কংগ্রেসে যেমন ইংলণ্ডের সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোল তেমনই প্রতিনিধিরা সন্ধি স্থাপনের জন্য রাজা জর্জের কাছে আবেদন করলেন। অপরদিকে আপন নিরাপত্তার খাতিরে তারা একটি সৈন্যদল গঠন করবার পরিকল্পনা নিয়ে এগোলেন এবং সর্বাধিনায়ক পদে বরণ করলেন জর্জ ওয়াশিংটনকে। ম্যাসাচুসেটসে যুদ্ধ শুরু হোল আর সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব করবার জন্য নির্বাচিত হলেন ভার্জিনিয়ার একজন। এথেকেই বোঝা যায় যে উপনিবেশগুলি তখন একতা ও সহযোগীতার পথেই অগ্রসর হচ্ছিল।

অপরপক্ষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শান্তির জন্য কলোনিগুলির এই আবেদন উপেক্ষা করে অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। রাজা জর্জ তার নিয়মিত সৈন্যদের সহায়তার জন্য হেস অ্যাপহাস্ট এবং ব্রানস্উইকের নরপতিদের কাছ থেকে বিশ হাজার জার্মান সৈন্য ভাড়া করে আনলেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকান সৈন্যরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তৎপর হয়ে উঠেছে। বসটনে তারা নগরীর উপকণ্ঠস্থ বাংকারহিল দখল করল এবং গোলাবারুদ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে স্থানটি নিজেদের দখলে

রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ঐ বছরের শেষভাগে কানাডায় একটি অভিযান পাঠান হয়। তারা মন্ট্রিল দখল করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণে বাধ্য হয়। আমেরিকানদের যেমন এই পরাজয়, তেমনি ব্রিটিশ পক্ষ ভার্জিনিয়ার নরফোক এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লসটনে পরাজিত হয়।

আমেরিকার বসতিকারীরা স্বাধীনতা অর্জনের পথে অনিচ্ছার সংগে হলেও এগিয়ে চলল। ১৭৭৫ সালে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছিল তাতে তাদের উদ্দেশ্যছিল ইংরেজ হিসাবে নিজেদের অধিকার বজায় রাখা, আমেরিকান হিসাবে নয়। এমন কি জেনারেল ওয়াশিংটন যখন বসটনে সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাধীনতার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না।

বিপ্লবের কোন সময়ই এই সংঘর্ষ সর্বাত্মক সংগ্রামে, যাতে সমস্ত সমর্থ লোকই জড়িয়ে পড়ে, এমন কিছুতে পরিণত হয় নি। আমেরিকার লোকসংখ্যা তখন ৩০ লক্ষ, কিন্তু ওয়াশিংটনের সৈন্য সংখ্যা কোন সময়ই ২৫ হাজারের বেশি ছিল না, আর সর্বাপেক্ষা দুঃসময়ে তার সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারেরও কম। আমেরিকার কৃষকরা যখন দেখত যে তাদের বাড়ীঘর বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তখন তারা সৈন্যদলে যোগ দিত আবার বিপদ উত্তীর্ণ হলে সৈন্যদল ছেড়ে চলে যেত।

অপরপক্ষে আবার বহু আমেরিকান ব্রিটিশপক্ষে যোগ দিয়েছিল। ফলে বিপ্লব গৃহযুদ্ধের রূপও পায়। টোরিরা ছিলেন অধিকাংশক্ষেত্রেই সম্পন্ন লোক। তাঁরা আমেরিকার গণতান্ত্রিক তথা জনগণের শাসনের সম্ভাবনায় যতটা শংকিত হয়েছিলেন রাজা জর্জ এবং তাঁর মন্ত্রীদের চণ্ডনীতিতে ততটা ভীত তাঁরা হন নি।

১৭৭৫ থেকে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত আমেরিকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন স্যামুয়েল অ্যাডামস্-প্যাট্রিক হেনরীর মত কঠোর দেশপ্রেমিরা। তারা স্বপ্ন দেখতেন ভবিষ্যতে স্বাধীন আমেরিকা নিজ প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলছে। সত্যই তাঁরা ছিলেন স্বপ্নালু ও ভাবুকা, এই সাধনায় সিদ্ধির পথে যে কি বাধা আসতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন না, কিন্তু আপন বিশ্বাসকে অটুট রেখেছিলেন তাঁরা। এই সব দেশপ্রেমিক এবং চরমপন্থীরা সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিপ্লব কমিটি সংগঠিত করেছিলেন, তারা আইনসভা-

গুলিকে সশস্ত্র পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, রাজভক্তির কোন প্রকাশ নির্মমভাবে দমন করেছিলেন এবং অনেকক্ষেত্রে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরও স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই বিপ্লবীদের মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছিলেন টমাস পেইন নামক জনৈক ইংরেজ। তিনি ১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়ায় বসতি করতে আসেন এবং অল্পকালের মধ্যেই গ্রেটব্রিটেন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রচণ্ড দাবী তোলেন। পেইন ছিলেন সুলেখক। রাজশক্তিতে তাঁর ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। তিনি "কমনসেন্স" নামে ১৭৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকায় তিনি দেখালেন আমেরিকানদের কার্যের মধ্যে ঘোরতর অসংগতি—একদিকে তারা রাজার সৈন্যের সংগে যুদ্ধ করছে আর অন্তদিকে মীমাংসার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে। "ইংলণ্ড হোল ইউরোপের, আমেরিকা তার নিজস্ব!" পেইন ঘোষণা করলেন, আর বললেন "শেষযোগ-সূত্র ছিন্ন হয়েছে।"

'কমনসেন্স' প্রচুর বিক্রীহোল এবং জনসাধারণকে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। উত্তেজনা যত বাড়তে লাগল এবং যুদ্ধের গতি যত দ্রুতহোল শান্তির সম্ভাবনা ততই লোপ পেতে থাকল। কংগ্রেসও এই সময় সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়ে আরও সাহসের পরিচয় দিল। জুন মাসে কংগ্রেস বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, টমাস জেফারসন্ জন অ্যাডামস্ প্রমুখ পাঁচজনের এক কমিটি গঠন করল, কমিটি স্বাধীনতার ঘোষণা রচনা করবার দায়িত্ব পেল।

ঘোষণার প্রথম খসড়া করলেন জেফারসন এবং পরে তার কিছু সংশোধনও করলেন অন্যান্য সদস্যরা। শেষ পর্যন্ত ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই কংগ্রেস ঘোষণাটি পর্যালোচনা করে আরো কিছুটা সংশোধিত রূপে সেটিকে গ্রহণ করল। ঐ দিনটিতেই আমেরিকার স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হল।

স্বাধীনতার ঘোষণায় দৃঢ় এবং পরিষ্কার রূপে [illegible] জানিয়ে দেওয়া হোল কেন উপনিবেশগুলি মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। এছাড়াও তাতে আমেরিকানদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে বর্ধিত করে বলা হোল ; "আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি—যে সকল মানুষ জন্মসূত্রে সমান ; সৃষ্টিকর্তা তাদের কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকারে ভূষিত করেছেন ; এই সবের মধ্যে আছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা এবং সুখানুসরণের অধিকার।"

ঘোষণাতে আরও বলাহোল সরকারের সৃষ্টি হোল এই সমস্ত অধিকারকে আয়ত্বাধীন করবার জন্য এবং শাসিতের সম্মতি থেকেই সরকার তার ন্যায্য ক্ষমতা আহরণ করে থাকেন। যখন সরকার এই সমস্ত উদ্দেশ্যের ব্যাত্যয় করেন তখন "জনসাধারণের অধিকার আছে তার পরিবর্তন অথবা অবসান ঘটাবার" এবং আপন স্বার্থে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত করবার।

ইউরোপের তমিস্রাছন্ন যুগ থেকে যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার সৃষ্টি হচ্ছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তা রূপপেল। ঘোষণাপত্রে স্বেচ্ছাচারের উপর চরম আঘাত হেনে বলা হোল যে সরকার হোল জনসাধারণের সেবক; প্রভু নয়। এই ঘোষণা আজিও বিশ্বে প্রেরণা যোগাচ্ছে এবং যত দিন মানুষের মনে স্বাধীনতা প্রীতি থাকবে ততদিন যুগিয়ে চলবে।

ঘোষণাপত্রে ইংলণ্ডের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার পর এই নূতন জাতিকে বাঁচবার জন্য প্রবলভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এমনকি জর্জ ওয়াশিংটনের বিচক্ষণতা, সাহস ও অতুলনীয় নেতৃত্বও যেন মধ্যে মধ্যে এই প্রবল সমস্যার মীমাংসা করতে পারছিল না।

ওয়াশিংটন জেনারেল হাউকে তার ১১ হাজার সৈন্যসহ কোনরূপে বসটন থেকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হলেন, কিন্তু হাউ যখন আবার গুরুত্বপূর্ণ নিউইয়র্ক নগরী দখল করবার জন্য ওয়াশিংটনের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন তখন ফলাফল হাউ-এর অনুকূলে গেল। নূতন বলে বলীয়ান ব্রিটিশ এবং জার্মান সৈন্যরা বারবার আমেরিকানদের পর্যুদস্ত করল এবং তাদের নিউ জার্সির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে হটে যেতে বাধ্য করল।

মহাদেশীয় কংগ্রেস যারা যুদ্ধ করছিল তাদের যথেষ্টভাবে সাহায্য দিতে পারল না, নূতন তেরটি অংগরাষ্ট্র এই ভয়ে কর ধার্য করতে পারল না যে কর চাপালে জনসাধারণ হয়ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্রোহ করেছে তেমনি তাদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াবে। অতএব সৈন্যদলের যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করা সম্ভব হোল না, তাদের মনোবল হ্রাস পেতে লাগল এবং দিনে দিনে বেশি সংখ্যায় লোক দল ছেড়ে পালাতে থাকল।

সৈন্যদলের তখন ঘোরতর দুর্দিন। ইংরেজরা ওয়াশিংটনকে দলবল সমেত ডেলাওয়ার নদীর অপর পারে পেনসিলভ্যানিয়ায় হটিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে ওয়াশিংটন তাঁর অতুলনীয় সামরিক কর্মক্ষমতার পরিচয় দিলেন। ১৭৭৬

সালের বড়দিনের রাত্রে তিনি পাল্টা আক্রমণ চালালেন। বরফের চাঙড়ে ভর্তি ডেলাওয়্যার নদী ডিঙি নৌকায় করে পার হয়ে ওয়াশিংটন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ট্রেনটনে একদল পানোয়ও ইংরেজ সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বড়দিনের উৎসবের মধ্যে এই ব্রিটিশ সেনারা সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হয়ে গেল। এর কিছু পরেই আমেরিকানরা প্রিন্সটনে আবারও জয়ী হল এবং সাময়িকভাবে নিউজার্সি তাদের অধিকারে ফিরে এলো।

১৭৭৭ সালে ঘোরতর যুদ্ধ হোল। এই যুদ্ধগুলির গুরুত্ব হয়েছিল সমধিক। জেনারেল হাউ-এর সৈন্যরা নিউ-ইয়র্ক থেকে জাহাজে করে ফিলাডেলফিয়ায় এসে আমেরিকানদের রাজধানী অধিকার করে নিল। ওয়াশিংটন এবং তাঁর সৈন্যরা নগরীর বাইরে ভ্যালি ফোর্জে আশ্রয় নিলেন। সেখানে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাদের না ছিল রসদ না ছিল বাসস্থানের ব্যবস্থা। ইংরেজরা তখন যদি এগিয়ে এসে আরো চাপ দিত তাহলে আমেরিকানদের শক্তি হয়তো চিরতরে পর্যুদস্ত হোত, কিন্তু হাউ-এর মধ্যে সেরকম উদ্যম ছিল না; আবার একথা মনে করবারও যথেষ্ট কারণ আছে যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে হাউ ছিলেন আমেরিকানদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রে ওয়াশিংটন এইভাবে পর্যুদস্ত হতে থাকলেও সেখানথেকে কয়েকশত মাইল উত্তরে নিউইয়র্কের স্যারাটোগায় নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। রসদ সরবরাহের জন্য ইংরেজরা তিনহাজার মাইল লম্বা অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ঘাঁটি তৈরী করেছিল। সেগুলি যথাযথভাবে কার্যকরী হোল না এবং তদুপরি সেনাপতিদের অযোগ্যতার জন্য এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইংরেজদের একটি পুরা সৈন্যদল ধ্বংস হোল।

ওই শতাব্দীর প্রথমদিকে ফরাসীরা যেভাবে চেষ্টা করেছিল ঠিক তেমনি করেই ব্রিটেন নিউইয়র্ক রাজ্যের সমস্ত প্রতিরোধ পর্যুদস্ত করে আমেরিকাকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলবার একটি পরিকল্পনা করেছিল। পরিকল্পনা ছিল তিনদিক থেকে নিউইয়র্কে অভিযান চালনা হবে এবং সৈন্যবাহিনীগুলি নিউইয়র্ক নগরীর দেড়শ মাইল উত্তরে হাডসন নদী উপত্যকায় অ্যালবানীতে মিলিত হবে। জেনারেল বারগোয়েন অভিযান শুরু করবেন কানাডা থেকে, জেনারেল হাউ নিউইয়র্ক নগরী থেকে উত্তর দিকে সৈন্যপাঠাবেন, এবং জেনারেল সেন্টলেজার লেক অন্টারিও থেকে রাজ্যের মধ্যদিয়ে পূর্বদিকে অভিযান পরিচালনা করবেন।

পরিকল্পনাটি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হোল। পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ এলেকায় অরিস্ক্যানিতে জেনারেল সেন্টলেজারের অগ্রগতি বাধাপেল এবং হাউ-এর সৈন্যরা এসে পৌছল না। স্যারাটোগায় বিশহাজার আমেরিকান কৃষক ও সৈন্য বারগোয়েন ও তাঁর ছয় হাজার সৈন্যকে অবরুদ্ধ করলে এবং ১৭৭৭ সালের অক্টোবর মাসে তারা আত্মসর্পণে বাধ্য হয়।

স্যারাটোগায় যে সৈন্যহানি হয়েছিল সেটা ইংলণ্ডের পক্ষে খুব বড় কথা নয়, কিন্তু তার সম্মানের হানি ঘটেছিল এতে অনেক বেশি। ইংলণ্ডের পুরাতন দুই শত্রু ফ্রান্স ও স্পেন এইবার আমেরিকানদের সাহায্যের আবেদনে কর্ণপাত করল।

কূটনৈতিক পর্যায়ে বিদেশি রাষ্ট্রের সংগে কার্যকলাপে আমেরিকানদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, ব্রিটেনই বরাবর আমেরিকার পক্ষে এই কাজ চালিয়ে এসেছে। কিন্তু দেখাগেল নতুন এই জাতির প্রতিনিধি রূপে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন অপূর্ব কূটনীতিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ফ্রাঙ্কলিন স্থযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিলমাত্র বিলম্ব করতেন না।

বেশ কিছুকাল যাবতই আমেরিকানরা ইউরোপ থেকে গোপনে কিছু সাহায্য পেয়ে আসছিল। এছাড়া ফ্রান্সের মারকুইস-ডি-লাগয়েত, জার্মানির ব্যারণ ডন ষ্টুবেন ও ব্যারণ ভন কাল্ব, এবং পোলাণ্ডের কাউন্ট পুলাস্কি প্রমুখ কতিপয় ইউরোপীয় সমর বিশেষজ্ঞ স্বেচ্ছায় আমেরিকান সৈন্যদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। তারা আমেরিকান সেনাদের শিক্ষিত করে তুললেন এবং শৃংখলাবদ্ধ করে তুললেন। তবুও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি আমেরিকাকে পুরাদস্তুর সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের ভয় ছিল যে এইভাবে সাহায্য দিলে আবার হয়তো ইংলণ্ডের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে হেরে যেতে হবে।

স্যারাটোগার যুদ্ধের পর বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ফরাসী সম্রাটকে বোঝাতে সমর্থ হলেন যে ফ্রান্স ও আমেরিকা একযোগে ইংলণ্ডকে পরাস্ত করতে সমর্থ। এই বিষয়ের আভাস পেয়ে ইংলণ্ড তার আমেরিকান উপনিবেশগুলির সংগে যে কোন সর্তে সন্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকল। ইংলণ্ডের কথা হোল যে উপনিবেশিগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই থাকবে। দুবছর আগে হলেও হয়তো এই প্রস্তাব উপনিবেশগুলি সানন্দে সম্মত হতো, কিন্তু এক্ষণে তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ১৭৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্স এবং যুক্ত-

রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হোল। উভয় রাষ্ট্রই অঙ্গীকার করলে একপক্ষ শান্তিস্থাপনে উৎসুক না হওয়া পর্যন্ত মিত্র হিসাবে অপরপক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এর পর স্পেন এবং হল্যাণ্ড আমেরিকানদের জাহাজ দিয়ে সাহায্য করল, তাদের আশা এইভাবে তারা ইংরেজদের কাছে যে অঞ্চলগুলি হারিয়েছিল তার কিছুটা অন্তত ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ফ্রান্স থেকে অল্পকালের মধ্যেই ঋণ, রসদ এবং সৈন্যরা এসে পৌছতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে কাজে লাগল ফরাসী নৌবহরটি যা তৎকালে ইংলণ্ডকে ছেড়ে দিলে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। ফরাসীরা ফিলাডেলফিয়া অবরোধ করতে পারে এইরূপ আশংকা করে ইংরেজরা রাজধানীটি ছেড়ে চলে গেল। অপরদিকে ফরাসীরা তাদের ফ্রান্সের বন্দরগুলি থেকে কয়েকটি জাহাজ আমেরিকানদের হাতে তুলে দিলে এবং ইংলিশ চ্যানেলে জাহাজগুলি কিছু হামলা চালালো। ক্যাপটেন জন পল জেমস্ ইংলণ্ডের উপকূলে হামলা চালিয়ে সেখানে পদার্পণ করলেন এবং বিজয় দর্পে হেয়োইট হ্যাভেন (এখানে তিনি এর আগে কয়েক বৎসর বাস করেছিলেন) শহরটি ধ্বংস করেন। জোনস ছিলেন বনহোম রিচার্ড নামক জাহাজে ইয়র্ক শায়ারের উপকূলের কাছে। সেরাপিস নামক ব্রিটিশ জাহাজের সংগে ক্যাপটেন জোনসের সংঘর্ষ হয় এবং তিনি সাফল্য লাভ করেন। তীরের এত কাছে এই যুদ্ধ হয়েছিল যে বহুলোক তা প্রত্যক্ষ করে।

বেনেডিক্ট আর্নল্ড নামক একজন আমেরিকান জেনারেল এই যুদ্ধের সময় পদোন্নতি না হওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হাডসন নদীর তীরবর্তী ওয়েষ্ট পয়েন্টস্থ (যেখানে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি একাডেমী অবস্থিত) একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের অধিকর্তা। তিনি ব্রিটিশের সংগে ষড়যন্ত্র করলেন দুর্গটি তাদের হাতে তুলে দেবেন ; কিন্তু তার কাগজপত্র সময়মত ধরা পড়ে যায়। আর্নল্ড পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের সংগে যোগ দেন এবং স্বদেশের বিরুদ্ধে তাদের ভার্জিনিয়া অভিযানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসাবে সহায়তা করেন।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যুদ্ধক্ষেত্র উত্তরাঞ্চল থেকে সরে গেল। ওয়াশিংটনের সৈন্যদল নিউইয়র্কের কাছাকাছি অবস্থান করতে থাকল, উদ্দেশ্য নগরীতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদের আটকে রাখা যাতে তারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে

এগিয়ে যেতে না পারে। এতে অবশ্য কোন লাভ হোল না। কারণ তখন দক্ষিণাঞ্চল এবং পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল যুদ্ধের দিক দিয়ে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করল।

ব্রিটেন যখন পশ্চিমাঞ্চলে উপনিবেশগুলির নূতন বসতি নিষিদ্ধ করে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন সেই নির্দেশ পুরাপুরি পালিত হয় নি। পেনসিল-ভ্যানিয়া থেকে ক্যারোলাইনা পর্যন্ত অঞ্চলের দুঃসাহসী বসতিকারীরা ধীরে ধীরে অ্যাপলেসিয়ান পর্বতমালার অ্যালিঘেনি, ব্লুরীজ এবং স্মোকি পর্বত পেরিয়ে অপরপারস্থ উর্বর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের মধ্যে ড্যানিয়েল বুন নামক একজন ১৭৬৯ সালে কেনটাকি পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং কয়েক বছরের মধ্যেই টেনেসি অঞ্চলে কায়েম হয়ে বসেন। ড্যানিয়েল বুন রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সবিশেষ খ্যাত হয়েছিলেন।

এই সব আমেরিকান বসতিকারীদের মধ্যে প্রবল দেশপ্রেম ছিল এবং বিপ্লব যখন শুরু হোল তখন তারা পূর্বাঞ্চলস্থ দেশবাসীদের সাহায্য করবেন বলে জানালেন। ইতিমধ্যেই দেখা গেল যে সীমান্তবর্তী ব্রিটেনের শক্ত ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে তারা বিপ্লবের যথেষ্ট আনুকূল্য করতে পারেন। অপর পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন হলে আমেরিকা আবার পশ্চিমাঞ্চলকে নিজস্ব এলাকা বলে দাবী করতে পারবে।

এই অনুসারে জর্জ রজার্স ক্লার্ক নামে কেনটাকিতে বসতিকারী জনৈক ভার্জিনিয়ানকে দুই শত লোকের একটি দলের নেতৃপদে বরণ করা হয়। দলটি উত্তর এবং পশ্চিমদিকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। মিসিসিপির অপর পারে ছিল এক বিস্তীর্ণ বসতিহীন অঞ্চল স্পেন নিজস্ব বলে দাবী করত সেই এলাকাটি। সংখ্যা হিসেবে দুইশত সৈন্য খুবই কম সন্দেহ নেই, কিন্তু নিউ ইংলণ্ড, নিউ ইয়র্ক এবং পেনসিলভ্যানিয়া যুক্ত করলে যতটা হয় ঐ সৈন্যদল তা দখল করতে সমর্থ হয়েছিল।

ক্লার্ককে বলা হোত "পশ্চিমাঞ্চলের ওয়াশিংটন"। তিনি ফরাসী এবং ইলিনয় অঞ্চলের ফরাসী এবং রেডইণ্ডিয়ানদের ব্রিটেনের বন্ধুত্ব পাশ থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বন্ধুতে পরিণত করলেন। এইভাবে ঐ তরফে গোলমালের সম্ভাবনা লোপ করে তিনি মিসিসিপি ও ওয়াবাস নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশ দুর্গগুলি দখল করতে এগোলেন। ঐ অঞ্চলে ইংলণ্ডের শক্তিকে ক্ষুন্ন করে দিয়ে

ক্লার্ক মহাদেশের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিজয় দর্পে এগিয়ে আমেরিকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ অঞ্চলে বিপ্লবের শেষ দৃশ্য অভিনীত হবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। উভয় ক্যারোলইনা এবং জর্জিয়ায় বহুলোকই রাজানুরক্ত এই ধারণা নিয়ে ইংরেজরা ক্লিনটন এবং কর্ণওয়ালিশের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করলেন যাতে তারা এই দুটি অংগ রাষ্ট্রকে বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারেন। প্রায় দু'হাজার প্রাচীনপন্থী আমেরিকান টোরি ইংরেজদের সংগে যোগ দিয়েছিল এবং সভানা ও চার্লসটন বন্দর তাদের দখলে এলো।

এর পর ইংরেজরা এগিয়ে চলল যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। উত্তর অঞ্চলে যত না সফল হয়েছিল তার চেয়ে বেশী সাফল্যলাভ হোল এই অঞ্চলে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল ক্যামডেনে জেনারেল গেটসের বিরুদ্ধে জয়লাভ। গেটস্ই স্যারাটোগায় ইংরেজদের পরাজিত করেছিলেন। গেটস্কে পরে দেখা গিয়েছিল ক্যামডেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ১৮০ মাইল দূরে সৈন্যদল পর্যুদস্ত হবার পর একা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে চলেছেন। তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন উঠেছিল তখন।

শেষ পর্যন্ত আমেরিকানরা ফ্রান্সিস ম্যারিয়ন প্রমুখদের নেতৃত্বে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধে ব্রিটেনের শক্তি ক্ষয় করতে শুরু করল এবং কিংস মাউণ্টেনে একদল দুর্ধর্ষ সীমান্তবাসী কর্ণওয়ালিশের পেশাদার সৈন্যদের পর্যুদস্ত করল। এর অল্পকালের মধ্যেই ওয়াশিংটন তার অন্যতম সুদক্ষ সেনানায়ক ন্থানিয়েল গ্রীনকে ক্যারোলইনায় প্রেরণ করলেন। ফলে ইংরেজদের আরো ক্ষতি হোল। ১৭৮১ সালে ইংরেজরা উত্তরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

বিপ্লবের শেষ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভার্জিনিয়ার ইয়র্ক টাউনে এক উপদ্বীপের উপর। এই জায়গাটি ছিল আমেরিকায় প্রথম ইংরাজ বসতি জেমস টাউনের কয়েক মাইলের মধ্যে। সেখানে কর্ণওয়ালিস ও বেনেডিক্ট আর্নল্ড ৭ হাজার সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তারা অপেক্ষা করছিলেন নিউ ইয়র্ক থেকে জাহাজযোগে নূতন সৈন্য আগমনের।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

আমেরিকার বিপ্লবে উপনিবেশবাসীদের জয়লাভের প্রায় দুই শতাব্দী পর আজ সংগতভাবেই এই প্রশ্ন করা চলে যে সেদিনকার সমস্ত দেশপ্রেমিক আমেরিকান কেন অবিলম্বে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে নি। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থিতিশীল মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য এরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন ছিল। এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে তখনকার অংগরাজ্যগুলি তাদের স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস করত; এবং আজকের পশ্চিম ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যেমন জোট বেঁধে ফেডারেল ইউনিয়ন গঠন করতে শংকা বোধ করে সেদিনকার অংগরাজ্যগুলির মনেও তেমনি আশংকা ছিল।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন ও তাগিদে পড়ে আমেরিকার উপনিবেশগুলি কোন রকমে শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছিল। তাদের প্রতিনিধি ছিল মহাদেশীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেস যুদ্ধ চালাবার জন্য তাদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করত এবং তাদের পক্ষে অন্য রাষ্ট্রের সংগে চুক্তিও করত। তবে তখন কোন লিখিত আইন বা সংবিধান ছিল না যার বলে কংগ্রেস জনসাধারণের পক্ষে একাজ করতে পারে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই রচিত হোল সংহতির বিধি বা আর্টিকল্‌স্ অফ কনফেডারেশন। এই বিধিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কতগুলি লক্ষ্য এবং কার্যধারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ১৭৭৭ সালে বিধিগুলি প্রথম প্রস্তাবিত হয় কিন্তু ১৭৮১ সালের মার্চমাসের পূর্বে কংগ্রেস তা অনুমোদন করে না। এর অন্যতম মূল কারণ ছিল মেরীল্যাণ্ডের আপত্তি এবং এই আপত্তি ভবিষ্যতে অংগরাজ্যটির দূরদর্শিতারই পরিচয় দেয়। কতকগুলি অংগরাজ্য তখন অভিযান চালিয়ে আবিষ্কার করা এবং পুরাতন ভূমিদারী প্রথার বলে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা নিজ নিজ রাজ্য বলে দাবী করছিল, কিন্তু, অনেক অংগরাজ্যের সেরকম কোন দাবী ছিল না। মেরীল্যাণ্ড জানিয়ে দিল যে এ্যালিবেলি পর্বতমালা এবং মিসিসিপির মধ্যবর্তী অঞ্চলের সবটুকুই যতদিন না যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাবে ততদিন পর্যন্ত তারা সংহতির বিধিতে স্বাক্ষর করবে না। এর অর্থ হোল যে এই নতুন অঞ্চল শাসন করবে জাতীয় সরকার, অংগরাজ্যগুলি নয়। এবং কংগ্রেস প্রয়োজনমতো বসতিকারীদের নিকট এই জমি বিক্রী করে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবে। এই শর্ত আরোপ করার ফলে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মেরীল্যাণ্ড জাতীয় শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

সংহতির বিধিগুলি কিন্তু খুব পরিষ্কার ছিল না এবং জোরদারও হয়নি। আয়তন এবং জনসংখ্যার কোন বিচার না করেই প্রত্যেক অংগরাজ্যকে কংগ্রেসে একটি করে ভোট দেওয়া হয়েছিল এবং ১৩টির মধ্যে নয়টি ভোট হলেই আইন পাশ করা যেত। আর এই মূল বিধির সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল তেরটির সবকটি ভোটের।

বিধি অনুযায়ী কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা বা চুক্তি সম্পাদন করার, ঋণ সংগ্রহ করার, রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ও অপর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে স্বীকৃতি দেবার এবং বৈদেশিক নীতি ও রেড ইণ্ডিয়ান বিষয়ক ঘটনাবলী পরিচালনা করার অধিকার পেল। এই দায়িত্বগুলি অসামান্য ছিল এবং সামগ্রিক বিচারে জনসাধারণের ভবিতব্যের উপর প্রভাব ছিল অপরিসীম। কিন্তু কংগ্রেস আইন পাশ করলে তাকে কার্যকরী করবার মতো কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা তখন দেশে ছিল না।

আমেরিকান প্রজাদের ব্যক্তিগত জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন যখন উঠল তখন অংগরাজ্যগুলি কংগ্রেসের সামনে বাধা হয়ে দেখা দিল। কংগ্রেস কোন

নাগরিককে কর দিতে বাধ্য করতে পারত না, কিংবা কর না দিলে আদালতেও তার বিচার করতে পারত না। প্রয়োজন যতই হোক না কেন সক্ষম ব্যক্তিকে আইনের সাহায্যে সৈন্যবাহিনীতে তলব করবার ক্ষমতাও কংগ্রেসের ছিল না। সংহতির বিধানে অংগরাজ্যগুলিকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বলে স্বীকার করা হোল এবং জাতির কল্যাণে তারা কি করবে বা না করবে তা নির্ধারণ করবার দায়িত্ব রয়ে গেল আইনসভাগুলির উপর।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যাঁরা চাইতেন তাদের পক্ষে অবস্থা আরো অসহনীয় হয়ে উঠল। অংগরাজ্যগুলি তখনও গাদাগাদা কাগজের নোট বাজারে ছাড়ছিল এবং বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুল্কধার্য করে যাচ্ছিল—কংগ্রেসের এতে কিছুই বাধা দেবার ছিল না। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হোল সংগতি সম্পন্ন লোকেরা, কারণ দেখা গেল তাদের হাতের সরকারী ঋণপত্রের মূল্য এক দশমাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করবার জন্য কোন রকম শুল্ক না থাকায় শিল্পগুলির বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হোল। অপরদিকে সীমান্ত অঞ্চলের জমিদারগণের রেড ইণ্ডিয়ানদের উৎপাতের দরুণ জমির কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গেল, কারণ সৈন্যবাহিনীর তখন রেড ইণ্ডিয়ানদের হামলা বন্ধ করবার মতো শক্তি ছিল না।

এই সময়ে অবশ্য গোলমালের মধ্যেও একটি বিষয়ে বিশেষ সার্থকতা লাভ করা গিয়েছিল। পশ্চিম অঞ্চল জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবার পর কংগ্রেস ওহায়ো নদী এবং গ্রেট লেকসের মধ্যবর্তী এলাকা নিয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল গঠন করল এবং সেখানকার শাসনব্যবস্থা একজন গভর্নর এবং তিনজন জজের উপর ন্যস্ত করল। ওই অঞ্চলের বসতিকারীদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হোল, ব্যবস্থা হোল অবৈতনিক সরকারী শিক্ষার এবং দান ব্যবস্থা পুরাপুরি রহিত করে দেওয়া হোল। স্থির হোল জনসংখ্যা যেমন বাড়বে তেমন সেখানে বিভিন্ন রাজ্য গঠিত হবে। এই রাজ্যগুলি অতঃপর ইউনিয়নে পুরাতন সদস্য রাজ্যগুলির সংগে সমান অধিকার ভোগ করবে। এইভাবেই ভবিষ্যত বিস্তৃতির সূচনা হোল এবং সরকার যে তাদের সমস্ত প্রজাকেই আমেরিকান নাগরিকের পূর্ণ অধিকার দিতে কৃতসংকল্প তারই ইংগিত পাওয়া গেল।

ইতিমধ্যে ম্যাসাচুসেটসে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার ফলে

জাতীয় সরকারকে পুনর্গঠিত করবার দাবী বৃদ্ধি পায়। ড্যানিয়েল শেস্ নামক বিপ্লবকালীন জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ঋণভারগ্রস্ত একদল নাগরিক রাজ্যটির আর্থিক নীতির প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে স্প্রিংফিল্ডে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রাগারটি আক্রমণ করে। এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমন করা হোলেও এই হানাহানি এবং বিশৃংখলা সারাদেশে শংকার সূত্রপাত করে।

*　　　*　　　*

জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কিছুকাল ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিহীনতা সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন অংগরাজ্যের গভর্নরদের নিকট লিখিত এক সার্কুলারে ওয়াশিংটন বললেন, "এই সংহতিবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের সাধারণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, না হলে এই ইউনিয়ন বেশীদিন টিকতে পারবে না।"

ওয়াশিংটনের এই ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হোল, কংগ্রেস স্বীকার করল জাতীয় ব্যবস্থাবলীর পরিচালনায় তারা ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এত কমে গিয়েছে যে অনেক সময় কোরাম থাকে না। তখন কিছুকালের মতো যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অস্তিত্বলোপ পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে পটোম্যাক নদীতে বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে মেরীল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়ার মধ্যে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থকরা আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করবার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। জর্জ ওয়াশিংটনের মাউন্ট-ভার্নলস্থ বাসস্থানে বেসরকারী পর্যায়ে আলোচনা করবার জন্য বিবদমান রাজ্যদুটির প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠানো হোল। অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পেল এই বিবাদের সংগে অন্যান্য রাজ্যের স্বার্থও জড়িত এবং স্থির হোল যে, পরবর্তী বৎসরে অ্যানাপোলিসে এক সম্মেলনে এই সর্বজনীন বাণিজ্য সমস্যা আলোচনার জন্য এক বৈঠক হবে এবং সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদেরই আমন্ত্রণ জানানো হবে। সংহতির বিধানের অন্যতম বিশেষ ত্রুটি ছিল আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃত্বের অভাব।

১৭৮৬ সালের এই অ্যানাপোলিস সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ

করেছিল মাত্র পাঁচটি রাজ্য। প্রতিনিধির সংখ্যা কম হোলেও তাদের কর্মদক্ষতা ও স্থির প্রতিজ্ঞা সম্মেলনের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্কের আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন। জন্মসূত্রে তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান এবং বিপ্লবের সময় ওয়াশিংটনের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তিনি ওয়াশিংটনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটেন। হ্যামিল্টন শক্তিশালী সরকার গঠনের প্রয়োজনীতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং যখন বুঝতে পারলেন যে অপর প্রতিনিধিরা বাণিজ্য সমস্যা ছাড়াও সংহতির বিধির সংশোধন করতেও প্রস্তুত, তখন তিনি প্রস্তাব করলেন যে সরকারের সংগঠন বিচার বিবেচনা করে দেখবার জন্য ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক। কংগ্রেস হ্যামিল্টনের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং পুনরায় ১৩টি অংগরাজ্যের নিকট আমন্ত্রণ প্রেরিত হয়।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রাজ্যগুলির উৎসাহ খুব বেশী দেখা গেল এবং রোড আইল্যাণ্ড ব্যতীত আর সকলেই সেখানে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। সম্মেলনে যোগদানকারীরা সংরক্ষণশীল হলেও বেশ শক্তিমান। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন বৃত্তিজীবী, কেউ বা ব্যবসায়ী আবার অনেকে বাগিচা মালিক। বিপ্লবের যাঁরা উদ্‌গাতা তাঁদের অনুপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এই দলের সবাই ছিলেন কোন না কোন রকমের আংশিক অথবা পূর্ণ কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহবাদী। জন হ্যামলক এবং স্যামুয়েল অ্যাচামস্ ম্যাসাচুসেটস্ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন নি অপর দিকে ভার্জিনিয়া থেকে নির্বাচিত হয়েও প্যাট্রিক হেনরী সম্মেলনে যোগ দিলেন না। তিনি বললেন যে, সম্মেলনের মধ্যে কুমতলব দেখতে পাচ্ছেন।

এগার বৎসর পূর্বে যে কক্ষে বসে কংগ্রেস স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছিল সেইখানেই এই সম্মেলন শুরু হয়। এই সংবিধানিক সম্মেলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন, আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন, জেমস্ ম্যাডিসন। জন ডিকিন্‌সন এবং গুভারনার মরিস বক্তৃতা করেন। সূচনাতেই অধিকাংশ প্রতিনিধির মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—বোঝা যায় যে তাঁরা শুধুমাত্র দুর্বল বিধিগুলিকে 'সংশোধন' করতে আসেননি তাঁদের উদ্দেশ্য সেগুলিকে বাতিল করে দিয়ে এক নূতন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা। যাঁরা আপত্তি করলেন অথবা বিশেষ

সাবধানতা প্রকাশ করলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ঘোষণা করলেন, "এটা খুবই সম্ভব যে আমরা যে পরিকল্পনা পেশ করব তা হয়তো গৃহীত হবে না। হয়তো বা আমাদের আর একটি ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। আজ যদি জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমরা আমাদেরই অপছন্দমতো কোন কাজ করি তাহলে ভবিষ্যতে আমরা এর কি জবাবদিহি করব? আমাদের এমন এক মান সৃষ্টি করতে হবে যা সাধু এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ করবে; সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করবেন ঈশ্বর।" ওয়াশিংটনের এই বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিনিধিরা ইউনিয়নকে আরো জোরদার করে তুলবার জন্য প্রস্তাব করলেন।

* * *

প্রস্তাবগুলির মধ্যে দুটিই ছিল প্রধান। একটি উত্থাপন করল ভার্জিনিয়া, বৃহদায়তন রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিস্থানীয়, এবং অপরটি উত্থাপন করল ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিস্থানীয় নিউজার্সি। ভার্জিনিয়ার প্রস্তাবে প্রশাসনিক, সাংবিধানিক এবং বিচারবিভাগীয় এই তিনটি শাখা নিয়ে গঠিত একটি প্রকৃত জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আইনসভা অর্থে কংগ্রেসের দুটি পরিষদ (উচ্চ এবং নিম্ন) থাকবে। উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ সেনেটে জনসংখ্যা এবং সম্পদের আনুপাতিক হারে প্রতিটি অংগরাজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করবে, আর নিম্ন অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হবে প্রত্যেক রাজ্যের জনগণ কর্তৃক।

ভার্জিনিয়ার এই প্রস্তাব রাজ্য আইন পরিষদগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। এর ফলে রাজ্যগুলি আর শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে কাজ করতে পারবে না, পারবে না অপছন্দ হলে কেন্দ্রীয় আইনকে নিজ এলাকায় অকার্যকরী করে দিতে। এই পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে যে কোন রাজ্যের অধিবাসীরই প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি থাকবেন এবং কংগ্রেস অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কনেটিকাট্ হয়তো কোন কর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিন্তু কংগ্রেসের গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্য তার আনুকূল্য করে প্রস্তাবটি যদি পাশ করে তাহলে কনেটিকাটকে তা মেনে নিতে হবে এবং আইন কার্যকরী করতে হবে।

নিউজার্সির প্রস্তাবে আরো বেশি সতর্কতা প্রকাশ পায়। তারা আশংকা

প্রকাশ করল ভার্জিনিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু হোলে ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলি জনবলের মুখে হেরে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার একটার পর একটা বিষয়ে তাদের নস্যাৎ করে দেবেন কারণ বৃহৎ রাজ্যগুলি শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরেই নিজেদের সুবিধামতো আইন পাশ করাতে পারবে। এ কারণে নিউজার্সি প্রস্তাব করল যে কংগ্রেসে একটিমাত্র পরিষদই থাকুক এবং সংহতির বিধিতে যেমন আছে তেমন করে আইন পরিষদে প্রত্যেকটি রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তবে কংগ্রেসকে আরো ক্ষমতাশালী করা হোক যাতে তারা কর ধার্য বিষয়ে এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে রাজ্যগুলিকে কোন নির্ধারিত নীতিতে সম্মত করতে পারে। নিউজার্সির প্রস্তাবে রাজ্য সরকারগুলির সার্বভৌমত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হোল এবং বলা হোল যে অধিবাসীদের নয়, রাজ্য সরকারকেই জাতীয় সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেওয়া দরকার।

ভার্জিনিয়া এবং নিউজার্সির প্রস্তাবে প্রভেদ ছিল অনেক। তবুও ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ নানারকম আপোস আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে পৌছতে পারলেন, অবশ্য এজন্য তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে বিতর্ক করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হোল ভার্জিনিয়ার প্রস্তাবমতো কংগ্রেসের দুটি পরিষদই থাকবে ; তবে উচ্চ পরিষদে প্রত্যেকটি রাজ্যই সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করবে প্রতিটি রাজ্য আইন পরিষদে দুজন করে সেনেটর পাঠাবে। আর নিম্ন পরিষদে কংগ্রেসম্যানের সংখ্যা হবে সেই রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে এবং ভার্জিনিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী এই কংগ্রেসম্যানের বা প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচিত করবে জনসাধারণ।

এই বিষয়টিই সম্মেলনের সবচেয়ে বড়ো বাধা এবং এর মীমাংসাও খুব সহজসাধ্য হয় নি। যেমন, দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি দাবী করল যে তাদের বহুসংখ্যক নিগ্রো ক্রীতদাস ভোটের অধিকারী নয়, কিন্তু তবুও জনসংখ্যা নির্ধারণে তাদেরও যেন গণনায় ধরা হয়। তাহলে নিম্ন পরিষদে তাদের প্রতিনিধিসংখ্যা বেশি হবে। শেষ পর্যন্ত স্থির করা হয় যে জনসংখ্যার হিসাব-কালে নিগ্রো ক্রীতদাসদের তিনপঞ্চমাংশকে স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যার সংগে যুক্ত করা হবে।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংবিধানে অংগরাজ্যের সার্বভৌম অধিকার রদ করে

দিয়ে তা ন্যস্ত করা হোল জনসাধারণের উপর; এই জনসাধারণের পক্ষে কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় সরকার কর্তৃত্ব করবে এবং অন্যান্য বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে রাজ্য সরকার। ঘোষণা করা হোল যে কেন্দ্রীয় আইনই হোল দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং "প্রত্যেক রাজ্যের বিচারকরা সেই আইন অনুযায়ী চলবেন, আর এই কেন্দ্রীয় আইনের প্রতিকূল যদি কোন রাজ্যের সংবিধান বা আইন থাকে তা সেক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না।" স্থির হোল অতঃপর কোন অংগরাজ্য আর কোন প্রকার সন্ধি বা চুক্তি করতে পারবে না, যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না, মুদ্রা তৈরী করতে পারবে না, কিংবা একে অপর রাজ্যের পণ্যের উপর কর ধার্য করতে পারবে না। কর্তৃত্ব এইরূপে হাতবদল হয়ে যাবার পরিবর্তে সংবিধানে ঘোষণা করা হোল যে "যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যে একটি প্রজাতান্ত্রিক ধরণের সরকার গঠনের নিশ্চয়তা দেবে এবং প্রতিটি রাজ্যকে বহিঃশত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করবে।"

যাই হোক, এই পরিবর্তনের ফলে কিন্তু অংগরাজ্যগুলি কোনরূপেই জাতীয় সরকারের বশংবদে পরিণত হয়নি। প্রথমতঃ, কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং তারা আইন প্রণয়নে অথবা আইনে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে অপরের সমর্থন লাভের সুযোগ পাবে। আর দ্বিতীয়তঃ নিজ নিজ এলাকায় রাজ্যসরকারগুলি জনসাধারণের ব্যক্তিগত কল্যাণ বিষয়ক প্রায় সমস্ত বিষয়ের উপরই আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবেন। এই বিষয়টির সংগেই রাজ্য সরকারের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। এইভাবেই রাজ্য আইনসভাগুলি সেখানকার নাগরিকদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা, ব্যবসায় এবং স্টেট্‌ব্যাংক গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রয়োগ, সরকারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, রাস্তা ও সড়ক তৈরী, এবং অঞ্চলীয় ভিত্তিতে আগে বহু বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব ও জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করতে থাকল।

কেন্দ্রীয় সংবিধান অনুসারে জাতীয় সরকার তিনটি শাখায় বিভক্ত হোল— আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগ। প্রত্যেকটি শাখারই অপর শাখার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু ক্ষমতা থাকে যাতে কিনা একটি শাখা অতিরিক্ত শক্তিশালী অথবা স্বৈরতন্ত্রী হয়ে না ওঠে।

কংগ্রেস অথবা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে জাতীয় কল্যাণ এবং বৈদেশিক বিষয়ের নানা ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করবার ক্ষমতা দেওয়া হোল। কংগ্রেসের

নির্দিষ্ট কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল কর ধার্য করা, ঋণ সংগ্রহ করা, আন্তঃরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা, মুদ্রা ব্যবস্থায় সাম্য রক্ষা করা, সৈন্যবাহিনী গঠন ও পোষণ করা, যুক্তরাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলগুলি শাসন করা, এবং ইউনিয়নে নূতন রাজ্যের প্রবেশাধিকার দেওয়া। আরো ব্যাপক অর্থে (এবং এই ব্যবস্থার ফলেই কংগ্রেস সত্যই শক্তিশালী হয়ে উঠল) কংগ্রেসকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বজনীন কল্যাণের জন্য অর্থব্যয় করা এবং কংগ্রেসকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাগুলিকে যথাযথরূপ কার্যকরী করবার জন্য প্রয়োজনীয় সকলবিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হোল। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কোনরূপ আইনের প্রস্তাব করার অধিকার দেওয়া হোল প্রতিনিধি পরিষদকে, এবং সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেল কংগ্রেসের নিম্ন পরিষদ।

ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে কংগ্রেসের পক্ষে কতকগুলি কার্য নিষিদ্ধ করা হোল। বিদ্রোহ অথবা বহিঃশত্রুর অভিযানের ক্ষেত্রে যখন জন-নিরাপত্তার খাতিরে প্রয়োজন তখন ছাড়া কংগ্রেস কোন সময়েই অধিবাসীদের হেবিয়াস কর্পাসের (যে বিধি অনুসারে পুলিশকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য আদালতের সম্মতি নেবার প্রয়োজন হয়) অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তাছাড়া কংগ্রেস পারবে না বিচার ব্যতিরেকেই শাস্তি দিতে অথবা আইনে নিষিদ্ধ না হওয়ার পূর্বে অনুরূপ কোন কার্য করার জন্য শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে কোনরূপ বিধি প্রণয়ন করতে। কংগ্রেস বাণিজ্য ও রাজস্বের ব্যাপারে এক রাজ্যের বন্দরকে অন্য রাজ্যের বন্দরের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারবে না এবং কোনরূপ খেতাব দিতে পারবে না।

কংগ্রেসম্যানদের বেতন দেবে কেন্দ্রীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার নয়। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেল। সেনেটররা নির্বাচিত হবেন ৬ বছরের জন্য এবং প্রতিনিধি পরিষদের সভ্যরা ২ বছরের জন্য। প্রতি ২ বছর অন্তর সেনেটের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের পুনর্নির্বাচন হবে।

কংগ্রেস যে আইন পাকা করবে তাকে প্রয়োগ করবে সরকারের প্রশাসন শাখা। এই শাখা কংগ্রেসের আইনমতো কর সংগ্রহ করবে, সৈন্যবাহিনী পোষণ করবে, এবং মুদ্রা ও নোট তৈরী করবে—এককথায় কংগ্রেসের আইন কার্যকরী করবার সমস্ত দায়িত্ব এদের। এই প্রশাসন বিভাগের শীর্ষে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট,—তার দায়িত্ব হবে "আইন যাতে সততার

সংগে কার্যকরী হয় তৎপ্রতি যত্নবান হওয়া।" প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হবে ৪ বছর। একই সংগে কাজ করবেন ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। তিনি সেনেটের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন এবং কংগ্রেসের নির্দেশমতো অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থারও পরিচালনা করবেন। এই ব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রণা সভার। এই মন্ত্রণা সভায় থাকেন পররাষ্ট্র সচিব, অর্থ সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, প্রতিরক্ষা সচিব এবং অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান। এরা প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ প্রধান প্রশাসকের নির্দেশমতো চলেন এবং তাকে সাহায্য করেন।

যাইহোক, প্রেসিডেন্ট কিন্তু কংগ্রেসের হাতের ক্রীড়ানক নন। সংবিধানে ব্যবস্থা করা হোল যে বিল পাশ হবার পর, প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করে তাতে স্বাক্ষর করলেই সেটি আইনে পরিণত হবে, এবং তিনি অনুমোদন না করলে ব্যবস্থাটির উপর ভেটো দিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য তা আইন পরিষদে ফেরত পাঠাতে পারবেন। অতঃপর যদি সেই বিলটি পুনরায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেসে পাশ হয় তাহলে প্রেসিডেন্টের বিনা স্বাক্ষরেই তা আইনে পরিণত হবে। এই ভেটোর অধিকার খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের তিনটি শাখার ক্ষমতা যাতে যথাযথভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় তারই নিশ্চয়তা রয়েছে এই অধিকারটিতে, কারণ এ হোল এই তিন শাখার শক্তি ও স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের মধ্যে সাম্য বিধান ও প্রতিরোধের অস্ত্র।

এছাড়া প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের স্থল ও নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়কও থাকবেন, এবং তিনি সেনেটের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষ বৈদেশিক কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিও করতে পারেন। অনুরূপভাবে তিনি সেনেটের অনুমোদন নিয়ে রাষ্ট্রদূত, সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি এবং কেন্দ্রের অফিসিয়াল (উচ্চপদস্থ কর্মচারী) নিয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনবোধে প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন, এবং সচরাচর তিনি বার্ষিক 'স্টেট অব দি ইউনিয়ন' বাণীতে কংগ্রেসের নিকট বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করবেন। অপরপক্ষে কংগ্রেসেরও *উৎকোচ গ্রহণ, রাষ্ট্রদ্রোহ কিংবা "অন্য গুরুতর অপরাধ" প্রভৃতির দায়ে প্রেসিডেন্টকে অভিযুক্ত ও পদচ্যুত করার অধিকার আছে। এই শেষোক্ত অধিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে।

সংবিধান প্রণেতারা এ বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন যে প্রেসিডেন্টের কর্তব্য এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে যাতে তিনি শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত না হন। প্রেসিডেন্টকে হতে হবে জনসাধারণের মুখ্য প্রতিনিধি এবং তাঁরই নেতৃত্বে দেশবাসী একতাবদ্ধ হবে।

প্রধান প্রশাসক অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি নিরূপিত হল। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য প্রথমে কংগ্রেসের উভয় পরিষদে তাদের মোট প্রতিনিধি সংখ্যার সমসংখ্যক নির্বাচক নির্বাচিত করবে। এই নির্বাচন সমাধা হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভার নির্দিষ্ট পন্থায়। এই নির্বাচকগণ পরে ব্যালটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে। কোন প্রার্থী সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে তিনিই হবেন প্রেসিডেন্ট, আর পরবর্তী সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। আবার কেউ যদি সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অর্থাৎ মোট ভোটের অর্ধেকের বেশী) অর্জন করতে না পারে, কিংবা দুইজন প্রার্থী যদি সমান সংখ্যক ভোট পায়, তাহলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে প্রতিনিধি পরিষদ। এক্ষেত্রে প্রতিটি অংগরাজ্যের একটি করে ভোট থাকবে।

ইলেক্টোরাল কলেজ অর্থাৎ এই বিশেষ নির্বাচন পদ্ধতি নির্দ্ধারণের পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান প্রণেতাদের। এই পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট কংগ্রেস অথবা আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়ার ফলে তিনিও এদের উপর নির্ভরশীল থাকবেন না। পক্ষান্তরে বিভিন্ন রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী লোকেদের প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করবেন। প্রথমে আশা করা হয়েছিল যে নির্বাচকরা প্রার্থী নির্বাচনে আপন পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেবেন, কিন্তু অচিরেই দেখা গেল রাজনীতিকরা এবং পার্টির নেতারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিতে বলছেন এবং নির্বাচকরা তা মেনে নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাটা হয়ে দাঁড়াল যে বিজয়ী রাজনৈতিকদলের নির্বাচকরা প্রত্যেক রাজ্যে স্বতঃই তাদের পার্টির পূর্ব মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেন। রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী মনোনীত করেন এবং প্রত্যেক রাজ্যের ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের পছন্দ অপছন্দ ব্যক্ত করেন এবং কয়েক মাস পর নির্বাচকরা সেই নির্বাচনের ফল অনুমোদন করেন।

সরকারের তৃতীয় শাখা হোল বিচার বিভাগ। এই শাখায় আছে সুপ্রীম

কোর্ট এবং কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন ছোট আদালত বা ট্রাইবুনাল। জাতীয় অথবা আন্তঃরাজ্য বিরোধের ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্ট বিচার করবেন এবং এক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রেও অত্যধিক ক্ষমতার প্রতিরোধ ও সাম্য-বিধানের নীতিও রয়েছে। সুপ্রীম-কোর্টে থাকবেন একজন প্রধান বিচারপতি এবং আটজন সহযোগী বিচারপতি। সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট তাদের নিয়োগ করবেন, এবং তাঁদের ও নিম্ন আদালতের বিচারকদের অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

ফেডারেল কোর্টগুলি সমস্ত অংগরাজ্যেই কার্যকরী ছিল এবং এইভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নাগরিকরা তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকত। কোন লোক কেন্দ্রীয় আইন অমান্য করলে তার বিচার হবে ফেডারেল কোর্টে এবং সে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে কারাদণ্ড দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কোন কারাগারে আটকে রাখা যাবে। অপরদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার মতো সংগত কারণ দেখাতে পারে তাহলে সে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনের অন্যথা করায় কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে সেই ব্যক্তি সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিত উক্ত আইনের যথার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে। যদি আপীলকারী সুপ্রীমকোর্টে জয়লাভ করে, তাহলে যে আইন অনুযায়ী তার বিচার হয়েছিল সেটি সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষিত হবে এবং বাতিল করে দেওয়া হবে। এথেকেই প্রতীয়মান হয় যে সরকার জনসাধারণের অধিকারকে কত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি নাগরিকই আইনের আওতায় থেকে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত ও প্রেসিডেন্টের অনুমোদিত কোন আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত এগোতে পারে এবং ফলতঃ সে আইন হয়তো বাতিলও হয়ে যাবে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে জড়িত বিরোধের ক্ষেত্রে ফেডারেল কোর্টগুলি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এমন কি যুক্তরাষ্ট্র কোন বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন করলে, এবং রাষ্ট্রদূত ও সচিবরা জড়িত এরকম ক্ষেত্রেও ফেডারেল কোর্ট বিচার করবার অধিকারী। আবার, দুই বা ততোধিক অংগরাজ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটলে, কোন একটি অংগরাজ্যের সংগে অপর অংগরাজ্যের কোন নাগরিকের বিরোধ ঘটলে, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন অংগরাজ্যের

নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ ঘটলে তারও মীমাংসা করবে ফেডারেল কোর্ট। তবুও রাজ্য এবং স্থানীয় আদালতগুলিরও বিচার করবার মতো অনেক বিষয় থেকে যায়—তারা সাধারণ নাগরিকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করে।

সংবিধানের শেষভাগে প্রয়োজন মতো এই বিধিগুলি সংশোধন অথবা এতে নতুন বিধি যোগ করবার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের উভয় পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্য থাকলে কোন সংশোধনের প্রস্তাব করা চলবে, অথবা সংশোধনের বিষয়ে মোট দুই-তৃতীয়াংশ অংগরাজ্য যদি আবেদন করে তাহলে প্রস্তাবটি পেশ করবার জন্য একটি বিশেষ সম্মেলন আহূত হবে। উভয়ক্ষেত্রেই অংগরাজ্যগুলির আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ যদি সম্মত হয় তাহলে সংশোধন কার্য্যকরী হবে এবং তা সংবিধানেও যুক্ত হবে। দেখা গেছে যে, সংবিধান সংশোধনের খুব বেশি প্রয়োজন হয় নি কারণ এটি খুব কঠোর নয় এবং কংগ্রেস ও বিভিন্ন কোর্ট বিধিগুলির ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করতেও সমর্থ।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে এই বাস্তব সংবিধান রচনার কাজ এগিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে শাসন করবার উপযোগী একটি শক্তিশালী সংবিধান রচিত হল। ১৭৮৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর এই সংবিধানটিতে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কার্য সমাপ্ত হয়। ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রতিনিধিরা যখন সংবিধানে স্বাক্ষর করলেন তখন তাঁদের কয়েকজনের মনে কিন্তু খানিকটা দ্বিধা থেকে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবলেন অংগরাজ্যগুলিকে সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে হয়তো তারা বড়ো বেশি এগিয়ে গিয়েছেন। আবার এও তাদের মনে হোল আমেরিকার অধিবাসীরা তাদের এই কাজটিকে অনুমোদন করবেন কি না? প্রতিনিধিরা যখন একে অপরের নিকট বিদায় নিচ্ছিলেন তখন প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিক, বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন জর্জ ওয়াশিংটনের চেয়ারখানির পিছনে আঁকা সূর্যের একটি ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন "এই অধিবেশনের মধ্যে যখন আমাকে আশা ও আশংকা বারবার দোলা দিচ্ছিল তখন আমি বারংবার প্রেসিডেন্টের পেছনে আঁকা ঐ সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছি সূর্যের কি উদয় হচ্ছে অথবা অস্ত যাচ্ছে; কিন্তু এখন আমি অত্যন্ত খুশি হলাম এই জেনে যে সূর্য উদিত হচ্ছে অস্ত যাচ্ছে না!"

প্রতিনিধিরা এক বিরাট কাজ করলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাগাড়ম্বর বর্জন করে তাঁরা গণতান্ত্রিক সরকারের মূলনীতিগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেদিন যে অবস্থা ছিল বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে ভিন্নতর হলেও সেদিনের এই গণতান্ত্রিক মূলনীতিগুলির যে মূল্য ছিল আজিও তা বর্তমান। এই চিরস্থায়ী দলিলটির রচনায় বহু লোক সহায়তা করলেও ভার্জিনিয়ার জেমস্ ম্যাডিসনকে সচরাচর "সংবিধানের জনক" বলা হয় এবং সংবিধান রচনার অধিকাংশ কৃতিত্বই তাকে দেওয়া হয়ে থাকে।

*   *   *

কাজ শেষ হবার পর খসড়া সংবিধানটি কংগ্রেসে পেশ করা হোল এবং কংগ্রেস সেগুলিকে পাঠিয়ে দিল বিভিন্ন রাজ্যের কাছে যাতে তাঁরা বিশেষভাবে আহূত সম্মেলনে এটিকে অনুমোদন করেন। সংবিধানটিকে কার্যকরী করবার জন্য প্রয়োজন ছিল নয়টি অংগরাজ্যের অনুমোদন। কিন্তু তাও খুব সহজে সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন রাজ্যের উপর এই সংবিধানকে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এক তিক্ত সংগ্রামের শুরু হোল। রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক না হয়ে বিশেষ রাজ্য সম্মেলন দ্বারা সংবিধান অনুমোদনের যে ব্যবস্থা প্রতিনিধিরা করেছিলেন তা যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচায়ক, কারণ আইনসভাগুলি সম্ভবতঃ কোনমতেই এ সংবিধানে সম্মত হোত না। সংবিধানের সমর্থক অর্থাৎ ফেডারেলিস্টরা এ বিষয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করলেন। পেন্‌সিলভ্যানিয়ায় সংবিধান সমর্থকরা অবিলম্বেই এক সম্মেলন আহ্বান করে এক প্রস্তাবে সংবিধান অনুমোদন করলেন। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটল যে বিরোধী-পক্ষ সংহত হয়ে প্রতিরোধ করবার কোন সুযোগ পেল না। কিন্তু এই কার্যের ফলে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার শুরু হোল।

ম্যাসাচুসেট্‌সে সংবিধান বিরোধীরা ছিল সংখ্যাধিক, কিন্তু এক্ষেত্রেও বেশ বুদ্ধিমত্তার সংগে ফেডারেলিস্টরা কাজ করেছিলেন। ম্যাসাচুসেট্‌স্ সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন জন হ্যাল্‌কক। নূতন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদে তাকে বরণ করা হবে এরকম একটা ভাসাভাসা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে সংবিধানের সপক্ষে টেনে আনা হোল। শেষ পর্যন্ত সামান্য ভোটের ব্যবধানে ম্যাসাচুসেট্‌স্ সংবিধান অনুমোদন করে। কিন্তু তারা সর্ত দিল যে এতে কয়েকটি সংশোধন যোগ করতে হবে।

সংবিধানের উদ্গাতারা উপলব্ধি করলেন যে খুব তাড়াতাড়ি এগোলেও তাতে হয়তো শেষ পর্যন্ত সংবিধানের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করা সম্ভব হবে না। সংবাদপত্র এবং বক্তৃতা বিতর্কের মাধ্যমে তাদের বারংবার সংবিধান বিরোধীদের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিতে হোল। সংবিধানের সমালোচকরা বললেন যে গরীবের স্বার্থ হানি করে ধনীদের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার পক্ষে সংবিধান হোল একটি 'ষড়যন্ত্র' বিশেষ। অভিযোগ হোল সরকার সাধারণ মানুষের উপর নির্মমভাবে কর ধার্য করবে, তাদের বাধ্য করবে ধাতব মুদ্রায় (যা তাদের কাছে নেই) ঋণ পরিশোধ করতে, এবং তাদের আইনের বলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাবে যুদ্ধ করতে। সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা হল এই বিষয়ে যে সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যবস্থা নেই যাতে জনসাধারণের থাকবে বক্তৃতার স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং থাকবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন, জেম্‌স্ ম্যাডিসন এবং জন জে—এই তিনজনে মিলে "দি ফেডারেলিস্ট পেপারস্" নামে পর পর কতগুলি প্রবন্ধ লিখে সংবিধানের সুযোগ সুবিধার বিশদ আলোচনা করলেন। এই বহুল প্রচারিত প্রবন্ধগুলিতে তারা অতিরিক্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিপদের কথা অকুণ্ঠায় স্বীকার করে নিয়ে দেখলেন যে, আর্টিকল্‌স্ অব কনফেডারেশন থেকে সমগ্র দেশে কি সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবন্ধগুলিতে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রথায় আইন ও শৃংখলা রক্ষার সুবিধার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁরা বললেন যে রাজ্যগুলিতেও তো শক্তিশালী উপদলগুলি আইনসভার অধিকারে এসে তাদের খুশিমতো সবকিছু চালায়। অতএব নতুন সরকারও তার চেয়ে বেশী অত্যাচারী হবে এ ধারণা অহেতুক। ফেডারেলিস্ট পেপারসে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হোল সেগুলি আমেরিকার জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং অনেক সন্দেহবাদী সংবিধানের সমর্থনে এসে যান।

ইতিমধ্যে ডেলাওয়ার, নিউজার্সি এবং জর্জিয়া সর্বসম্মতভাবে সংবিধান সমর্থন করল এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে অন্যান্য রাজ্যগুলিও সংবিধানের সপক্ষে এসে যায়। জুনমাসে নিউহ্যাম্পশায়ার সংবিধান অনুমোদন করে। ফলে কার্যকরী হবার জন্য প্রয়োজনীয় নয়টি ভোটই সংগৃহীত হয়; কিন্তু

ভার্জিনিয়া ও নিউইয়র্ক এই দুইটি বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এই বিষয়ে তখনও প্রচণ্ড বিতর্ক চলছে। অথচ নতুন সরকারের পক্ষে এদের সমর্থনও বিশেষ প্রয়োজন।

ভার্জিনিয়ার প্যাট্রিক হেনরী ছিলেন সংবিধান-বিরোধী দলের নায়ক। তিনি বললেন যে সংবিধানের মুখবন্ধটি বিশেষ আপত্তিকর, কারণ এতে বলা হয়েছে "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ।" তাঁর মতে বলা উচিত ছিল "আমরা, অংগরাজ্যগুলি।" এই তীব্র বিতর্কে জর্জ ওয়াশিংটন এবং জেমস্ ম্যাডিসনের প্রভাবও সংবিধানের পক্ষে বিস্তার করা হোল। শেষ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের ধনাঢ্য বাগিচা মালিকদের সংগে পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবাসীদের মধ্যে এক কোয়ালিশন সম্ভব হয় এবং শেষ পর্যন্ত সামান্য সংখ্যাধিক্যে সংবিধান অনুমোদন লাভ করে। বাগিচা মালিকরা স্বতঃই শক্তিশালী সরকার এবং মুদ্রা মূল্যের স্থিতিমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতী, অপরদিকে সীমান্তবাসীরা সংবিধান সমর্থন করলেন এই কারণে যে তাঁরা সীমান্তে সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের পক্ষপাতী এবং আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ব্যবস্থারও সমর্থক।

নিউইয়র্ক রাজ্যে এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ গোলমাল হয়। শেষ পর্যন্ত আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই সংবিধান অনুমোদন লাভ করে। এক সময়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যখন নিউইয়র্ক নগরী ভয় দেখাল যে তারা রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ইউনিয়নে যোগদান করবে। পাউকিপ্‌সিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৩০-২৭ ভোটে সংবিধান নিউইয়র্ক রাজ্যে অনুমোদিত হয়। তেরটির মধ্যে এগারটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করল এবং ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার নির্বাচিত হয়ে গিয়েছে। অতএব অবশিষ্ট দুটি রাজ্য রোড আইল্যাণ্ড এবং উত্তর ক্যারোলাইন শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নে যোগ দিতে স্বীকার হোল। রোড আইল্যাণ্ড ফিলাডেলফিয়ার সংবিধান বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দেয়নি আর সংবিধান অনুমোদনের জন্য কোন সম্মেলনও আহ্বান করেনি। কিন্তু পরে যখন অন্য রাজ্যগুলি এই বলে ভয় দেখাল যে তারা রোড আইল্যাণ্ডকে বৈদেশিক রাষ্ট্র হিসেবে বিচার করবে এবং তার পণ্যের ওপর শুল্ক ধার্য করবে তখন এই রাজ্যটি যোগদানে সম্মত হয় এবং ইউনিয়নও পূর্ণাংগতা প্রাপ্ত হোল। ইউনিয়নের প্রথম তেরটি রাষ্ট্র হোল কানেটিকাট, ডেলাওয়ার, জর্জিয়া, মেরীল্যাণ্ড, ম্যাসাচুসেটস, নিউ-

হ্যাম্পশায়ার, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক, নর্থ ক্যারোলাইনা, পেনসিলভ্যানিয়া, রোড আইল্যাণ্ড, সাউথ ক্যারোলাইনা এবং ভার্জিনিয়া।

পরস্পরের সংযুক্ত হবার বিষয়ে রাজ্যগুলির আপত্তি যা কিছুই থাক না কেন, সংবিধান যেদিন চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হোল সেদিন সারা দেশে প্রচণ্ড খুশির জোয়ার এলো। ম্যাসাচুসেটস্ থেকে সাউথ ক্যারোলাইনা পর্যন্ত প্রতেকটি শহরেই ভোজসভা, কুচকাওয়াজ এবং বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হোল, আর সংবাদপত্রগুলি এই বিরাট ঘটনার জয়গানে হয়ে উঠল মুখরিত। আর্টিকলস্ অব কনফেডারেশন অনুযায়ী গঠিত পুরাতন কংগ্রেসের তখন নাভিশ্বাস। তারা নতুন ব্যবস্থার হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংবিধান পন্থীদের এই জয় হোল পূর্ণাংগ এবং বিশেষ ব্যাপক। একথা সত্য যে হ্যামিল্টন এবং অপর কয়েকজন সরকারকে আরও শক্তিশালী রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং সেনেটররা জীবৎকালের জন্য নিযুক্ত হবেন এবং আরও চেয়েছিলেন অংগরাজ্যগুলির সমস্ত ক্ষমতাই হরণ করতে। কিন্তু তবুও সংবিধানের চূড়ান্তরূপ তাদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিল। অপরদিকে এই দল বিল অব রাইটস্ অথবা মানবাধিকার বিষয়ক প্রশ্নে বিরোধীপক্ষের দাবী স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সংশোধনরূপে সেগুলিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মূল সংবিধানের সংগে এই বিষয়টির প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ না থাকায় হ্যামিল্টনের দল বিরোধী-পক্ষের এই দাবী সম্পর্কে বিশেষ কোন আপত্তি করেন নি।

অনতিবিলম্বেই রাজ্যগুলি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য নির্বাচক স্থির করে ফেলল এবং রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসক নির্বাচনের জন্য ব্যালটও গৃহীত হোল। এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না, "জাতির জনক" জর্জ ওয়াশিংটন সর্ববাদীসম্মতক্রমে নির্বাচিত হলেন। এই জাতীয় বীরের ছিল অদ্ভুত আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান এবং বিনয় নম্র প্রকৃতি। ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট পদ চাননি এবং তিনি চেয়েছিলেন ভার্জিনিয়ায় তার বাগিচার দেখাশোনা করেই জীবন কাটিয়ে দিতে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন ম্যাসাচুসেটসের জন অ্যাডামস্ এবং প্রথম কয়েক বছর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হোল নিউইয়র্ক নগরী।

মাউন্ট ভার্ননের বাড়ী ছেড়ে ওয়াশিংটন যখন নিউইয়র্ক অভিমুখে চললেন

তখন সর্বত্রই তিনি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করলেন, তাঁর সম্মানে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হোল। লোকে পুষ্পবৃষ্টি করল, তোপধ্বনি হোল তাঁর সম্মানে এবং কয়েক বছর আগে যারা তার অধীনে বিপ্লবের সংগ্রাম করেছে কৃতজ্ঞ নয়নে এসে দাঁড়াল ওয়াশিংটনকে দেখতে। ওয়াশিংটন শ্রদ্ধা ও প্রীতির এই নিদর্শনে অভিভূত হয়ে তাদের ধন্যবাদ জানালেন। নিউইয়র্কে পৌঁছবার পর এক আনন্দোজ্জ্বল অনুষ্ঠানে জেনারেল ওয়াশিংটনকে সংবর্ধনা জানানো হয়, এবং ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ওয়াল ষ্ট্রীটের ফেডারেল হলে জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্টরূপে অভিষিক্ত হলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ওয়াশিংটন থেকে পোলক্

জর্জ ওয়াশিংটন দু' দফায় প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং সেই সময় তার দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসাভাজন ছিলেন তিনি। কিন্তু আমেরিকান রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশবাসীর মধ্যে অবিমিশ্র জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছেন খুব কমই। কিছু সংখ্যক লোক সব সময়ই শাসনব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বার করে এবং ফলতঃ দেখা যায় নির্বাচনের সময় একচতুর্থাংশ থেকে অধিক সংখ্যক ভোটার স্বতঃই প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করেছে, তা সেই প্রেসিডেন্ট অপর অংশের নিকট যতই জনপ্রিয় হোক না কেন।

ওয়াশিংটন নিজেকে রাজনীতি নিরপেক্ষ রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে বোঝা গিয়াছিল যে তিনি একজন ফেডারেলিষ্টপন্থী, এবং তারই ফলে তার বিরোধীরা তাকে "অত্যাচারী" ও একনায়কতন্ত্রী বলত। ফেডারেলিষ্ট বিরোধীরা অর্থাৎ কিনা যাঁরা সংবিধান গ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন তারা অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিরোধীপক্ষে জোট বাঁধলেন এবং এই জোটের নাম দিলেন রিপাবলিকান পার্টি। তবে এই পার্টি কিন্তু বর্তমানের রিপাবলিকান পার্টির পূর্বসূরী নয়, পরন্তু এরা বর্তমানের

ডেমোক্র্যাট দলের পূর্বসূরী। বর্তমানে রিপাবলিকানরা ফেডারেলিষ্টদের কাছাকাছি এবং তাদেরই ধ্বজাধারী বলে মনে করা হয়।

ফেডারেলিষ্ট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছিল তা হল : সংবিধান প্রয়োগ করা হবে বা তার ভাষ্য করা হবে কি প্রকারে। ফেডারেলিষ্টরা বলেছিলেন যে সংবিধানের ধারাগুলিকে এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে যাতে জাতীয় সরকার আইন প্রণয়ন এবং সেগুলির প্রয়োগের ব্যাপারে সর্বাধিক পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। অপরদিকে রিপাবলিকানরা বিশ্বাস করতেন যে, সংবিধানের ধারাগুলি এমনভাবে বিচার করতে হবে যার ফলে সরকার শুধুমাত্র সেই সমস্ত অধিকারই প্রয়োগ করবেন যা তাদের সংবিধানে দেওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন তার মন্ত্রণাসভায় বিরোধীপক্ষের দু'জন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রহণ করলেন। তৎকালীন মন্ত্রণাসভায় মাত্র চারটি দপ্তর ছিল। ফেডারেলিষ্টপন্থী আলেকজাণ্ডার হ্যামিন্টন হলেন অর্থসচিব। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা এবং সংবিধানিক সম্মেলন কালে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত টমাস জেফারসন্ পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হলেন। বিত্তশালী এবং সংস্কৃতিবান জেফারসন ছিলেন ফেডারেলিষ্ট বিরোধী, তবে চিন্তাধারা এবং আচরণে তিনি ছিলেন পুরাপুরি গণতান্ত্রিক।

দেখা গেল, শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিষয়েই হ্যামিন্টন এবং জেফারসন পরস্পরের বিরোধিতা করছেন। তাদের চিন্তাধারা যথেষ্ট পরিমাণে এক রকমের হলেও অনেক মূল বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা যেত। হ্যামিন্টন চাইতেন কেন্দ্রীয় সরকার হবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিত্তশালীদের স্বার্থ অনুসারে একদল বিশিষ্ট বনেদীলোক শাসনব্যবস্থা চালাবেন। জেফারসনের মত ছিল কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে খুব কম এবং এই সরকার পরিচালনা করার সাধারণ লোকেরা। জেফারসন জনসাধারণের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন এই জনসাধারণ সরকার পরিচালনায় আঞ্চলিক এবং রাজ্যসরকারের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করবেন।

নূতন শাসন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং সরকারের ঋণলাভের ব্যবস্থা করা। পুরাতন কংগ্রেস বিপ্লবের যুদ্ধের ব্যয়

নির্বাহের জন্য আমেরিকার নাগরিক এবং বিদেশ থেকে বহু ঋণ নিয়েছিলেন। অংগরাজ্যগুলিও তখন ঋণগ্রস্ত।

হ্যামিল্টনের কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ, বয়স মাত্র বত্রিশ। দু'বছরের মধ্যেই তিনি সমস্ত ঘাটতি পূরণ করে ফেললেন। যে পন্থায় এটা করা হয়েছিল ফেডারেলিষ্টরা তার প্রশংসা করলেও। রিপাবলিকানরা তার ভীষণ নিন্দা করল। বিদেশী ঋণ সমস্ত পরিশোধ করা হোক এবং তাতে কোন আপত্তি ওঠে নি। কিন্তু স্বদেশে যে সমস্ত ঋণপত্র ছাড়া হয়েছিল সেগুলিকে যখন পুরা মূল্যে শোধ করে দেওয়া হয় তখনই প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। দেশপ্রেমিক আমেরিকানরা এই ঋণপত্রগুলি ক্রয় করেছিল, পরে তারা দেখতে পেলো যে সেগুলি প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়েছে অতএব তাদের মধ্যে অনেকেই ঋণপত্রগুলি নামমাত্র মূল্যে ফাটকাবাজদের কাছে বিক্রী করে দেয়। ফলে দেখা গেল সরকার যখন ঋণ পরিশোধ করলেন তখন বহু ক্ষেত্রেই মূল ঋণদাতারা টাকা পেলো না, পরিবর্তে টাকা পেলো ফাটকাবাজরা, যাদের হাতে তখন ঋণ পত্রগুলি ছিল। এই কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে হ্যামিল্টন বললেন সে সরকারের ইজ্জত বাড়ানোর প্রতিই তার আগ্রহ বেশি, ব্যক্তিবিশেষ বা নাগরিকদের লাভক্ষতির প্রতি তিনি দৃষ্টি দেবেন না। এই ব্যবস্থায় খানিকটা অবিমৃষ্যকারিতার ভাব থাকলেও উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়েছিল। উত্তরকালে সরকারী ঋণপত্র সম্পর্কে আর কেউ সন্দিহান হননি এবং জনসাধারণের কাছ থেকে নতুন ঋণ সংগ্রহ করা খুব সহজ হয়ে গেল।

এর পর হ্যামিল্টন কংগ্রেসের মাধ্যমে অংগরাজ্যগুলির ঋণ সমস্ত জাতীয় কাঁধে তুলে নিলেন এবং সেগুলি পরিশোধও করলেন। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের আরো শক্তিবৃদ্ধি হোল। কোন কোন অংগরাজ্যের ঋণের পরিমাণ অন্যদের চেয়ে বেশি হলেও হ্যামিল্টনের নীতির ফলে তারা সমান ভাগে মোট ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হল। ভার্জিনিয়ার ঋণের পরিমাণ ছিল খুব কম। তারা আপত্তি করল যে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌সের বিশাল ঋণ পরিশোধের জন্য কর দেবে না হ্যামিল্টন এক কূটচালে সমস্ত নিষ্পত্তি করলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, স্থায়ী কেন্দ্রীয় রাজধানী দক্ষিণাঞ্চলে পটোম্যাক নদীর তীরে স্থাপিত হবে। অংগ-রাজ্যগুলির ঋণ নিজেদের ওপর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকাবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের নিকট প্রমাণ করল যে অর্থ বিষয়ে জাতীয় সরকারই হোল সবার উপরে।

এর পর হ্যামিল্টন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপনের পরিকল্পনা করলেন। এরও উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দেশের ব্যবসায়ী সমাজের সমর্থন লাভের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আরও দৃঢ় করা। ব্যাংকটি হ'ল ব্যাংক অব ইংলণ্ডের অনুরূপ। সরকার এবং বেসরকারী লগ্নীকারকরা এর মূলধন জোগালেন এবং এর মুনাফার অংশ লাভ করতে থাকলেন। কর এবং জমি বিক্রয় থেকে গভর্ণমেন্টের আরব্ধ সমস্ত অর্থ এই ব্যাংকে জমা হতে থাকল এবং ব্যাংক থেকে সমগ্র দেশে একই ধরণের কাগজের নোট ছাড়া হোল। এই নোটগুলি অংগরাজ্যগুলিতে প্রচলিত নোটের স্থান অধিকার করে। সংবিধানের কোথাও এই ধরণের ব্যাংক স্থাপনের কথা ছিল না। কিন্তু ফেডারেলিষ্টরা বললেন যে এই ক্ষমতা সংবিধানে অন্তর্নিহিত আছে। কংগ্রেস যদি কর ধার্য করতে পারে; ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং ঋণ পরিশোধও করতে পারে তবে জাতীয় ব্যাংক স্থাপন করে তার মাধ্যমে এই সমস্ত কাজ কারবার না করতে পারার কোন যৌক্তিকতা নেই।

জাতীয় তহবিলে অর্থসংগ্রহের জন্য ফেডারেলিষ্ট কংগ্রেস বিদেশী মালের আমদানির উপর শুল্ক এবং হুইস্কির উপর আবগারী শুল্ক ধার্যের অধিকার দিয়েছিল। এই সমস্ত ব্যবস্থায় অনেক রাজস্ব সংগৃহীত হতে থাকলেও মতদ্বৈধতাও প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়। হুইস্কির ওপর করধার্য করার প্রতিবাদে পেনসিলভ্যানিয়ায় যে কৃষকরা মদ চোলাই করত তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই হুইস্কি বিদ্রোহ দমন করবার জন্য পনর হাজার কেন্দ্রীয় সৈন্য নিয়োগ করা হয় এবং বিদ্রোহ দমন হয়ে যায়।

আমদানী শুল্ক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া হোল বিচিত্র রকমের। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলির মতে ইউরোপ থেকে আমদানী করা জুতা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যন্ত্রপাতির ওপর শুল্ক ধার্য করা ভাল। কারণ ১৭৯০ সাল নাগাদ ঐ সমস্ত অঞ্চলে নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং তারা বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল তখনও কৃষিজীবী। তাদের সংগে বিদেশীদের একটা সুন্দর ব্যবস্থা ছিল যার ফলে বাগিচা মালিকেরা তুলা এবং অন্যান্য কাঁচামাল বিদেশে চালান দিত এবং সেগুলি থেকে উৎপাদিত পণ্য দেশে ফিরে আসত। এরজন্য বেশ ন্যায্য মূল্যই তারা দিত। অতএব এই সমস্ত পণ্যের আমদানীর ওপর উচ্চ হারে শুল্ক

ধার্য করা হোলে তাদের বিদেশের সংগে বাণিজ্য করায় মুনাফা অনেক কম হয়ে যাবে। এই শুল্ক ব্যবস্থার গোড়া থেকেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়, এবং সত্তর বৎসর পর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই শুল্কনীতি।

* * * *

আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে যেমন মতভেদ ছিল; ফেডারেলিষ্ট এবং রিপাব্লিকানদের মধ্যে ঠিক অনুরূপ গুরুতর মতভেদ দেখা যেত দেশের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কেও। ওয়াশিংটন যে বছর প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হন সেই বছরই ইউরোপে আর এক গুরুতর দুর্যোগ দেখা দেয়। তখন প্রতীয়মান হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র অনিবার্যভাবেই এতে জড়িয়ে পড়বে এবং অংকুরেই এই রাষ্ট্রের বিনাশ হবে।

উল্লিখিত দুর্যোগ হোল ফরাসী বিপ্লব। এর ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে এবং ষোড়শ লুই ও মেরী অ্যাণ্টোনিয়েটের গিলোটিনে মৃত্যু হয়। ফ্রান্সে রক্তপাত এবং বীভৎস যুদ্ধ বৃদ্ধি পাবার সংগে সংগে অন্যান্য ইউরোপীয় রাজন্যেরাও প্রাণভয়ে ভীত হন এবং বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেন। অনতিকালের মধ্যেই ইউরোপ মহাদেশে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে এবং দেখা গেল ফ্রান্স তার পুরাতন শত্রু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নিজ অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

ফ্রান্স এবং আমেরিকা তখনও পরস্পরের মিত্র। ফরাসীরা অকারণই আশা করেছিল আমেরিকার স্বাধীনতালাভে তারা যেমন সাহায্য করেছে নতুন রাষ্ট্রও সমভাবে তাদের সাহায্য করবে। রিপাব্লিকানদের নেতৃত্বে বহু আমেরিকান বিপ্লবীদের সমর্থন করতে থাকলেন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ধুয়া তুললেন।

কিন্তু প্রাচীন-পন্থী ফেডারেলিষ্টরা তাদের মতে সায় দিতে পারেন নি। ইউরোপের প্রাচীন-পন্থী রাজন্যদের মতো তারাও ফ্রান্সের ঘটনাবলীতে বিশেষ বিব্রতবোধ করতে থাকলেন।

আবার তাদের এটাও মনে হোল যে ইউরোপের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ক্যানাডা অথবা পশ্চিম দিক থেকে আমেরিকার আক্রান্ত হবার গুরুতর ঝুকি রয়েছে। একারণেই ১৭৯৩ সালে প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন আমেরিকার নিরপেক্ষ

থাকার কথা ঘোষণা করে এই যুক্তি দেখালেন যে, ফ্রান্সের সংগে যে চুক্তি হয়েছিল তা ছিল পূর্বতন সরকারের সংগে, বিপ্লবীদের সংগে নয়।

ইতিমধ্যে ফরাসীরা 'সিটিজেন' এডমণ্ড গেনেট্‌কে দূত হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য হোল আমেরিকাকে যুদ্ধে নামানোর ব্যবস্থা করা। গেনেট্‌ চাইলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলিকে ঘাঁটি করে ব্রিটেনের সমুদ্রপথের ব্যবসায় বাণিজ্যকে হামলা চালিয়ে বানচাল করে দিতে হবে, এবং যেহেতু স্পেন ইংলণ্ডের পক্ষ নিয়েছে অতএব যুক্তরাষ্ট্রস্থ ঘাঁটিগুলি থেকে পশ্চিমদিকে স্পেন অধিকৃত জায়গাগুলির ওপরও হামলা চালাতে হবে। গেনেট্‌ কুশলী এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন হলে হয়তো আমেরিকার সমর্থন লাভ করতে পারতেন কিন্তু তার আচরণে ঔদ্ধত্য দেখা দেয়। তিনি প্রকাশ্যে আমেরিকার ফরাসী সমর্থকদের সংগে মিলেমিশে নিরপেক্ষতামূলক ঘোষণার অন্যথা করবার চেষ্টা করেন। ফলে আমেরিকার জনমত গেনেটের বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত করা হয়।

ফ্রান্সের সংগে সম্পর্ক যেমন মধুর ছিল না, তেমনি ইংলণ্ডের সংগে সম্পর্কও তথৈবচ। তখনও কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটেন কয়েকটি দুর্গ অধিকার করে বসেছিল। বিপ্লবের পরেও তারা সেগুলিকে আমেরিকার হাতে সমর্পণ করে নি। ব্রিটেনের যুক্তি ছিল যে আমেরিকান ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশ প্রজাদের নিকট উপনিবেশের প্রথম যুগ থেকে যে ঋণ করেছে তা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তারা দুর্গগুলি হস্তান্তর করবে না। এই ঘাঁটিগুলি থেকে ইংরাজরা রেড-ইণ্ডিয়ানদের আমেরিকান অঞ্চলের উপর হামলা চালাবার জন্য প্ররোচিত করতে থাকল। তাদের আশা ছিল এই প্রকারে হয়তো তারা পশ্চিমাঞ্চলে যে জমি আমেরিকার অধিকারে গিয়েছে তার কিছুটা উদ্ধার করতে পারবে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ নৌবাহিনী গভীর সমুদ্রে আমেরিকান জাহাজগুলি আটক করে তা থেকে নাবিকদের ধরে নিতে থাকল। তারা অজুহাত দেখাল যে এই নাবিকরা হোল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর দলত্যাগী লোক। এভাবে যাদের তারা ধরে নিয়েছিল তারা অনেকে পলাতক ব্রিটিশ হলেও; অনেকেই ছিল প্রকৃত আমেরিকান নাগরিক।

দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবার পর ওয়াশিংটন পুনরায় ইউরোপ প্রসংগে আমেরিকার নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করেন। তিনি ১৭৯৪ সালে

জন জে.-কে. লণ্ডনে পাঠান। উদ্দেশ্য হোল ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যে মতভেদ বর্তমান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা দূর করা। ব্রিটিশরা পশ্চিমাঞ্চলের দুর্গগুলি ছেড়ে দিতে রাজী হোল, কিন্তু এর পরিবর্তে জে বাণিজ্য এবং নৌ-চলাচলে ব্রিটেনকে যে সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে এলেন আমেরিকানদের কাছে তা অত্যন্ত অবমাননাকর মনে হল এবং দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন এদিকে স্পেনের সংগে এক চুক্তি করলেন তার ফলে ফ্লোরিডার সীমানা নির্ধারিত হোল এবং মিসিসিপি নদীতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-চলাচলের অধিকার ও নিউ অর্লিয়েন্সের বন্দরে মাল নামানোর অধিকার স্বীকৃত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৭৯৬ সালে ওয়াশিংটন যখন কার্যভার ত্যাগ করে জীবনের শেষ তিনটি বৎসর কাটাবার জন্য মাউণ্ট ভার্ণনে ফিরে গেলেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানিক সরকার সার্থকভাবে চালু হয়ে গিয়েছে এবং দেশও যুদ্ধের আওতার বাইরে রয়েছে। বিদায় ভাষণে ওয়াশিংটন দেশবাসীকে একযোগে কাজ করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে তাদের বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সংগে স্থায়ী মৈত্রী বন্ধন এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। কঠোর ফেডারেলিষ্ট পন্থী জন অ্যাডামস্ হলেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। তৎকালীন ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটদানের বিচিত্র প্রথার ফলে বিরোধী দলের টমাস জেফারসন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট লাভ করে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এদিকে ইংলণ্ডের সংগে আমেরিকার আপোস হবার ফলে ফ্রান্স অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। ফলে গুরুতর গোলমালের সূত্রপাত হয়। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস এই গোলমালের নিষ্পত্তি করবার জন্য প্যারিসে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কিন্তু "এক্স, ওয়াই ও জেড্" ছদ্মনামী ফরাসী প্রতিনিধিরা বললেন যে মার্কিন প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা শুরু করবার আগেই তাদের ফ্রান্সকে ঋণ দিতে হবে এবং তাদের উপঢৌকন দিতে হবে। এই ঘটনায় আমেরিকায় ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। শুরু হয় এক গুরুতর অঘোষিত নৌযুদ্ধ। শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসের অসীম ধৈর্যের ফলেই তখন পুরাপুরি যুদ্ধ বেধে উঠতে পারে নি।

যুদ্ধের এই আশংকার মধ্যে ফেডারেলিষ্টরা দুটি আইন পাশ করিয়ে নেয় সেগুলির উদ্দেশ্য হোল বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

ব্যবস্থাকে জোরালো করা। এগুলি পরে ফেডারেলিষ্ট দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম আইন অর্থাৎ বিদেশী সংক্রান্ত আইনে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয় যাতে তিনি কোন বিদেশীর আচরণ যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করলে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে পারেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহমূলক আইনে ক্ষমতা দেওয়া হোল যে কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিদ্বেষমূলক ও কুৎসামূলক কোন কিছু লিখলে তাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া যাবে। প্রথম আইনটি কার্যকরী করা হয় নি, কিন্তু দ্বিতীয় আইনটি অনুসারে অতিমাত্রায় তিক্ত সমালোচনা করবার দায়ে কতিপয় রিপাব্লিকান পন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদককে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়।

এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে রিপাব্লিকানরা আইন দুটির তীব্র সমালোচনা শুরু করেন এবং যুক্তি দেখান যে এই আইনগুলি সংবিধানের প্রথম সংশোধনের বিরোধী। কারণ, প্রথম সংশোধনে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। জেফারসন এবং ম্যাডিসনের প্ররোচনায় যথাক্রমে কেনটাকি ও ভার্জিনিয়ার আইনসভাদুটি এই দুই আইনের প্রত্যাহারের দাবী নিয়ে প্রস্তাব পাশ করে। এছাড়া কেনটাকি আরও ঘোষণা করল যে কংগ্রেস যদি 'সংবিধান বিরোধী' কোন আইন পাশ করে তাহলে অংগরাষ্ট্রের সেই আইনকে প্রত্যাখ্যান করবার অথবা বাতিল করে দেবার অধিকার আছে। ফেডারেল সরকারের উপর এটি এক গুরুতর আঘাত হয়ে দাঁড়াল। ফেডারেলিষ্ট-দের এই কঠোর শাসনব্যবস্থায় যে যুক্তরাষ্ট্রবাসী শংকিত হয়ে পড়েছে তার প্রমাণ মিলল ১৮০০ সালের নির্বাচনে। খুব অল্পভোটের ব্যবধানে হলেও রিপাব্লিকান পন্থী টমাস জেফারশন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

নূতন সরকার শাসন ব্যবস্থার অধিকার করলেন এক নূতন রাজধানীতে এসে। ওয়াশিংটন তখনও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু এইভাবেই দক্ষিণাঞ্চলের উত্তরাংশে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপনের অংগীকার কার্যকরী হোল। ফিলাডেলফিয়া নগরী থেকে ওয়াশিংটন গ্রামটিতে রাজধানী সরিয়ে আনা অবশ্য নিউ-ইংলণ্ডের বনেদী প্রতিনিধিদের খুব ভাল লাগেনি। কিন্তু টমাস জেফারসন ছিলেন সহজ এবং অনাড়ম্বর জীবনের পক্ষপাতী এবং তার মতে এই ক্ষুদ্র গ্রামটিই হোল তার নীতি কার্যকরী করবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

বাস্তবিকপক্ষে প্রেসিডেন্ট হিসাবে জেফারসনের আচরণে সকলেই বিস্ময় বোধ করেছিল এবং নিজ কার্যে জেফারসনও মাঝে মাঝে বিস্মিত হতেন। সরকারের ব্যয়-সংকোচ করে, হুইস্কির উপর শুল্ক প্রত্যাহার করে, এবং রাষ্ট্রদ্রোহমূলক আইন অনুসারে আটক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে তিনি যা করেছিলেন তা অবশ্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু তিনি যখন ভূমধ্যসাগরে আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্য জাহাজের উপর উৎপাতকারী জলদস্যুদের শায়েস্তা করবার জন্য এক নৌবহর পাঠালেন তখন লোকে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিল। কিন্তু লোকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হোল যখন সংবিধানের কঠোর সমর্থক জেফারসন সংবিধানের এমন ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন যেটা ফেডারেলিষ্টদেরও নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্টের এই আচরণ প্রথমে জনমনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে কিন্তু তারা যখন দেখতে পেলো যে এগুলি শুভবুদ্ধি প্রণোদিত তখন তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। কালের গতির সংগে তাল রেখে জেফারসন নূতন নীতি অবলম্বন করেছিলেন। জেফারসন সবচেয়ে বড়ো কাজ যেটা করেছিলেন সেটা হোল লুইসিয়ানা অঞ্চল ক্রয় করা। এর জন্য তার যথাযথ সংবিধানিক ক্ষমতাও ছিল না আবার সম্মতিও তিনি নেননি এর জন্য। মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তট থেকে শুরু করে রকি পর্বতমালা পর্যন্ত এই বিরাট ভূখণ্ডটি ছিল ফ্রান্সের অধিকারে। ১৭৬৩ সালে ফ্রান্স এই এলাকাটি স্পেনের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ১৮০০ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্পেনের রাজাকে আবার বাধ্য করলেন এই অঞ্চলটি ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিতে। ইউরোপের যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি তখন নূতন বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন।

লুইসিয়ানার উপর পুনরায় কর্তৃত্ব পেয়ে ফরাসীরা আমেরিকানদের মিসিসিপি নদী এবং নিউ অর্লিয়ান্স বন্দর ব্যবহারের অধিকার রদ করে দিল। অথচ ওহায়ো উপত্যকার নূতন বসতিগুলির বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির পক্ষে এদুটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া দুর্বল স্পেনের পরিবর্তে তখন আমেরিকার সীমান্তে স্থিত হয়ে বসল প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি ফ্রান্স। তাদের আক্রমণমূলক মনোভাব আরো শংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জেফারশন খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করতে মনস্থ করলেন। তিনি স্থির করলেন যে অন্ততপক্ষে মিসিসিপি নদীতে নৌ-চলাচল অধিকার আদায় করতেই হবে, আর তা যদি সম্ভব না হয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষ নেবেন এবং এই অধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেন।

সৌভাগ্যবশতঃ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে গুরুতর সামরিক পরাজয় বরণ করেন এবং তারই ফলে তার আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয়। জেফারসনের দূতেরা প্যারিসে উপনীত হয়ে নিউ অর্লিয়ন্স এবং পশ্চিম ফ্লোরিডার জন্য ফরাসীদের ২০ লক্ষ ডলার মূল্য দিতে চাইল। ফরাসীরা তখন তাঁদের পাল্টা জিজ্ঞাসা করলে লুইসিয়ানা অঞ্চলের জন্য আমেরিকা কত মূল্য দিতে পারে। কিছুটা দর কষাকষির পর দেড় কোটি ডলার মূল্য স্থির হোল।

এই নামমাত্র মূল্য দিয়ে জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন দ্বিগুণেরও বেশি করে ফেলেছিলেন। এই নূতন অঞ্চলে পরে সৃষ্টি হোল মিনেসোটা, মিস্থরি, আইওয়া, ক্যানজাস্, মণ্টানা, উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, এবং লুইসিয়ানা ষ্টেট। কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এই অঞ্চল। এই ক্রয়ের ফলে মোহানা থেকে উৎস পর্যন্ত মিসিসিপি নদী পুরাপুরি আমেরিকান এলাকার মধ্যে এসে গেল এবং পশ্চিম সীমান্তে বিদেশীদের আধিপত্যের সমস্ত আশংকাও লোপ পায়।

এই নূতন ব্যবস্থার অব্যাহিত পরেই জেফারসন এই নূতন অঞ্চলের জরিপ এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত অঞ্চল উদ্‌ঘাটন করবার জন্য নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারী মেরী ওয়েদার লুইস এবং উইলিয়ম ক্লার্কের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন। একদল অভিজ্ঞ সৈনিক এই দলের সদস্য হয়। দলটি উত্তরাঞ্চলের বনভূমি অতিক্রম করে অবিগল এলাকায় উপনীত হয় এবং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার দাবী করে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত এই প্রথম স্থলপথে যাত্রা সম্পন্ন হোক।

লুইসিয়ানা অঞ্চল ক্রয় এবং সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের দ্বার উন্মুক্ত করায় জেফারসন যে সাহসিকতা ও কূটনীতির পরিচয় দিলেন দেশবাসী তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। কিন্তু স্বয়ং জেফারসন তখন সংবিধানের ধারা নিয়ে অত্যন্ত বিপন্ন-বোধ করতে থাকলেন। কারণ সংবিধানের কোথাও ভূমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয় নি, অবশ্য তাতে সেনেটের সম্মতিক্রমে প্রেসিডেণ্টের অন্য রাষ্ট্রের সংগে চুক্তি করবার অধিকার ছিল। এই মামুলী ভাষ্যের উপর নির্ভর করে জেফারসন লুইসিয়ানা ক্রয় করেছিলেন। একারণেই তার আশংকা হয়েছিল যে হয়তো বা সংবিধান বানচাল হয়ে যাবে।

জেফারসন দ্বিতীয়বার কার্যভার গ্রহণ করলে অপর একটি গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হন। এই সময়েও তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতার অত্যধিক প্রয়োগ করেছিলেন। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড তখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। উভয়েই চেষ্টা করেছে নৌ অবরোধ ঘটিয়ে অপর রাষ্ট্রটিকে শেষ করে দিতে। এবং এই কারণেই তারা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজগুলিকে এই দুই দেশের উপকূলের কাছাকাছি না আসবার জন্য সতর্ক করে দেয়। কিন্তু এতে আমেরিকা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হোল কারণ ইউরোপের সংগে তার বাণিজ্য তখন বেড়েই চলেছে এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে এই বাণিজ্যের গুরুত্ব অসীম। শত শত মার্কিন জাহাজ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল নিয়ে বিদেশি বন্দরের দিকে যাত্রা করেছিল কিন্তু সেগুলি বিবদমান দুই রাষ্ট্রের হাতে আটকা পড়ে যায়। ইংলণ্ডে তখন প্রচণ্ড লোকাভাব। ফলে তারা মার্কিন জাহাজের নাবিকদের ধরে নিয়ে গিয়ে নিজ নৌ বাহিনীতে ভর্তি করে দেয়।

যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার আশা নিয়ে জেফারসন বৈদেশিক বাণিজ্য পুরাপুরি বন্ধ করে দিতে কংগ্রেসকে সম্মত করালেন এবং নির্দেশ দিলেন আমেরিকান জাহাজগুলি যেন দেশের বন্দরেই থাকে। ১৮০৭ সালের এই নিষেধমূলক 'এম্বার্গো এ্যাক্ট' অবশ্য যথাযথভাবে সংবিধানের আওতার মধ্যে আসে না কারণ সংবিধানের বিধান ছিল যে কংগ্রেস বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এতদনুসারে বাণিজ্যকরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া যায় কিনা সংবিধানের এই ভাষ্য নিয়ে তুমুল বিতর্কের অবতারণা হোল।

এই নূতন আইনে কেউ-ই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ব্যবসায়ী ও কৃষক সমাজ সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতে। দুই বছর পরে এই আইনটি রদ করে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে আর একটি বিধান প্রণীত হয়। নূতন বিধানে বলা হোল যে ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সের কোন একটি রাষ্ট্র যদি আমেরিকার বাণিজ্যিক অধিকার রক্ষা করে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের সংগে বাণিজ্য চালু করবে এবং অপর রাষ্ট্রটিকে বয়কট করে যাবে। ফ্রান্স অবিলম্বে এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংঙ্গে বাণিজ্য পুনরায় চালু হয়।

১৮০৯ সালে জেফারসন কার্যভার ত্যাগ করেন এবং জেমস ম্যাডিসন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। প্রথম তিনজন প্রেসিডেণ্টই অমানুষিক পরিশ্রম করে

যুক্তরাষ্ট্রকে বড়োগোছের যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু ম্যাডিসনের পক্ষে তা আর সম্ভব হয় নি।

*　　　　*　　　　*

যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে প্ররোচিত করবার জন্য ইংলণ্ড অনেক চেষ্টা করেছিল, আর তাছাড়া কিছু আমেরিকান নিজ নিজ স্থানে চাইছিলেন যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হোক। পশ্চিমাঞ্চল তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছে। তারা চাইছিল সেখানে ব্রিটিশ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দিতে এবং উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে কানাডা দখল করে নিতে। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলের লোকেদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল স্পেন অধিকৃত ফ্লোরিডার উপর। যুদ্ধবাদী এই দলের নেতা ছিলেন কেনটাকির হেনরি ক্লে এবং সাউথ ক্যারোলাইনার জন সি ক্যালহুন। ১৮১২ সালে এরা দুজন এবং তাদের সমর্থকরা কংগ্রেসে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব পাশ করতে সমর্থ হোলেন।

১৮১২ সালের এই যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রয়োজনই ছিল না, সবাই এটা সমর্থনও করে নি এবং এতে কোন নির্দিষ্ট ফললাভও হয়নি নিউ ইংলণ্ডে এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল, তার প্রধান কারণ ছিলো যে রিপাব্লিকানরা তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। নিউ ইংলণ্ডের ফেডারলিষ্টদের কার্যকলাপে তখন সমগ্র দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই দলটি ছিল ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শের ধারক। কিন্তু এক্ষণে তারা ইউনিয়ন ছেড়ে যাবার হুমকি দেখাল, এবং যা আশা করা গিয়েছিল তার চেয়েও তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ না হলে হয়তো তা করতো।

এই যুদ্ধের অভিযান হয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে। প্রায় সাজসজ্জা হীন একদল আমেরিকান সৈন্য লেক ঈরীর মধ্যদিয়ে কানাডায় অভিযান চালায় কিন্তু অবিলম্বে হটে আসতে বাধ্য হয়। লেক ঈরী এবং লেক চ্যাম্‌প্লেনে নৌ-যুদ্ধ সাফল্য লাভ করবার ফলেই সেই সময় আমেরিকার উপর গুরুতর পাণ্টা আক্রমণ ঘটতে পারে নি। আরও দক্ষিণে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা ওয়াশিংটনের নিকটে একদল সৈন্য নামিয়ে দেয়। এই ইংরাজ সৈনিকরা খুব সহজেই ওয়াশিংটন দখল করে নেয় এবং ক্যানাডায় আমেরিকা যে ক্ষতি করেছে তার শোধ তুলবার জন্য হোয়াইট হাউস, ক্যাপিটল ও অন্যান্য সরকারী ভবনগুলি পুড়িয়ে দেয়। ইংরাজরা তৎপর বালটিমোরের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রবল প্রতিরোধের

জন্য বেশী এগোতে পারে না। এই নগরটির মুখে ছিল ফোর্ট ম্যাক হেনরী। ইংরাজরা তার উপর গোলা বর্ষণ করে ব্যর্থ হয়। এই যুদ্ধ থেকেই ফ্রান্সিস স্কট কী অনুপ্রেরণা লাভ করেন আমেরিকার জাতীয় সংগীত "স্টার-স্প্যাংগল্‌ড্‌ ব্যানার" লেখার।

যুদ্ধে আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো যে সাফল্য তা হয়েছিল সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর হয়ে যাবার পর। ঘেণ্ট-এ উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা মিলেছিলেন এই সন্ধির জন্য। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সে খবর তখনও আটলান্টিকের এপারে এসে পৌছয় নি। নেপোলিয়ন তখন ইউরোপে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং ইংরাজরা এক্ষণে একদল দুর্ধর্ষ সৈনিককে পাঠিয়ে দিল নিউ অর্লিয়ন্স অধিকার করবার জন্য। মিসিসিপি উপত্যকার সন্নিকটে একদল সীমান্তবাসী টেনেসীর অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনের নেতৃত্বে তাদের বাধা দেয়। জ্যাকসনের এই কঠোর পরিশ্রমী সৈন্যরা লক্ষ্যভেদে ওস্তাদ। তারা ট্রেঞ্চের আড়াল থেকে বারংবার ইংরাজদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। জ্যাকসনের এই সার্থকতার জন্য তিনি 'ওল্ড হিকোরি' নাম পেলেন এবং আমেরিকানদের প্রশংসা অর্জন করলেন।

ঘেণ্টের সন্ধিচুক্তিতে শুধুমাত্র যুদ্ধেরই অবসান ঘটল, কিন্তু ইংরাজ নৌবাহিনীতে বলপূর্বক কার্যে নিযুক্ত মার্কিন নাবিকদের কথা এতে কিছুই বলা হয় নি। অথচ এটা ছিল যুদ্ধের অন্যতম কারণ। কিন্তু ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবায় ফলে এসব বন্ধ হয়ে যায় এবং মার্কিন জাহাজগুলি আবার বিনা বাধায় সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসায় করতে থাকে।

১৮১২ সালের যুদ্ধের পর আমেরিকায় জাতীয় ঐক্য সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়, এরূপ ঐক্য পূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি। ইতিহাসের গতির ফলে রিপাব্লিকানরা রাষ্ট্রপরিচালনায় পূর্বে ফেডারিলিষ্টরা যেরূপ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেরূপ সুকোঠর পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সংগে গোলমাল, লুইসিয়ানা অঞ্চল ক্রয় এবং সর্বোপরি এই যুদ্ধ-এর সবগুলির ফলেই জাতীয় কর্তৃত্ব কঠোরভাবে প্রয়োগ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এমন কি কয়েকবছর পূর্বে লুপ্ত জাতীয় ব্যাংকটিকেও পুনরায় চালু করা হোল।

সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন মার্শাল প্রদত্ত বিভিন্ন রায়ের ফলে

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরো জোরদার হয়। মার্শাল ছিলেন ফেডারেলিষ্ট পন্থী। ১৮০১ সালে জন অ্যাডামস্ তাঁকে প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী ৩৪ বৎসর কাল সংবিধানিক কর্তৃত্ব নিয়ে বারংবার যে প্রশ্ন জন মার্শালের কাছে এসেছিল তিনি বরাবরই সেগুলিকে বাতিল করে দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠল কংগ্রেস সংবিধান বিরোধী কোন আইন পাস করলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে কিনা? মারবারি বনাম ম্যাসিডন মামলায় মার্শাল রায় দিলেন যে সুপ্রীম কোর্টের সে কর্তৃত্ব বর্তমান। আবার প্রশ্ন উঠল সংবিধানের ব্যত্যয় হয় এমন কোন আইন রাজ্যসরকার পাশ করলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে কি না? কোহেনস্ বনাম ভার্জিনিয়া রাষ্ট্রের মামলায় অ্যাডামস রায় দিলেন যে সুপ্রীম কোর্টের সেরূপ ক্ষমতা আছে। বর্তমানের শাসন ব্যবস্থায় সুপ্রীমকোর্টের যে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বর্তমান তার কৃতিত্ব জন মার্শালের।

পরিবহন ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সমগ্র দেশকে আরো ঐক্যবদ্ধ করল। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে স্টীমবোট আবিষ্কৃত হয়। তার ফলে আমেরিকায় নৌবাহী বাণিজ্য বিশেষ করে মিসিসিপি ও তার শাখানদীগুলিতে বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। শতাব্দীর চতুর্থ দশকে রেল রোড ব্যবস্থার উন্নতির সংগে সংগে আন্তঃরাষ্ট্র এবং আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে। এই সব উন্নতির ফলে নূতন নূতন নগরীর পত্তন হয়, স্থাপিত হয় নূতন শিল্প এবং শুরু হয় ইউরোপ থেকে বহিরাগতদের আগমনের হিড়িক।

*　　*　　*　　*

১৮১৬ থেকে ২৪ পর্যন্ত সময়টিকে আমেরিকায় "শুভেচ্ছার লগ্ন" বলা হয়। এই সময় দ্রুত বৈষয়িক উন্নতি হতে থাকে, ফেডারেলিষ্ট পার্টি ততদিনে লোপ পেয়ে গিয়েছে এবং রিপাব্লিকান দলের মধ্যেও পরস্পর বিরোধী উপদলের সৃষ্টি হয় নি। এই সময়েও প্রেসিডেন্ট জেমস্ মনরো বিভিন্ন বৈদেশিক বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরনীতি অবলম্বন করেছিলেন।

নূতন দুনিয়ায় তখন স্পেনের সাম্রাজ্য ছত্রভংগ হয়ে এসেছে। নেপোলিয়নের সংগে যুদ্ধ করে স্পেন তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে মেক্সিকো থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার সুদূরতম দক্ষিণপ্রান্ত অবধি তার উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ধ্বংস করবার মতো ক্ষমতা স্পেনের

ছিল না। ফ্লোরিডায় তখন বিশৃংখলা চলেছে এবং সেখানকার সেমিনোল উপজাতীয় রেড্ ইণ্ডিয়ানরা বারংবার সীমান্তে এসে যুক্তরাষ্ট্রের উপর হানা দিতে থাকে।

এই রেড্ ইণ্ডিয়ান উপজাতিকে শায়েস্তা করবার জন্য প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো দুর্ধর্ষ অ্যাণ্ড জ্যাকসনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ফ্লোরিডা সীমান্তে পাঠিয়ে দেন। প্রেসিডেণ্ট সেনাপতিকে এরূপ ক্ষমতা দেন যে প্রয়োজন হলে তিনি যেন রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সীমান্তের পরপারেও তাড়া করে নিয়ে যান। জ্যাকসন আধা-খেঁচড়া কাজে বিশ্বাস করতেন না। অতএব তিনি ১৮১৮ সালে সমগ্র ফ্লোরিডা সহজে দখল করে ফেললেন। কেন্দ্রীয় সরকার জ্যাকসনের এই কাজ সমর্থন করলেন এবং স্পেন আমেরিকার নিকট নতি স্বীকার করল। পরিবর্তে স্পেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পেল ৫০ লক্ষ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের এই যে দৃঢ় অবস্থা এসে গেল সে সম্পর্কে অন্য রাষ্ট্রগুলিও অনতি-বিলম্বে অবহিত হয়ে যায়। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রুসিয়া ইতিমধ্যে এক মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের সংগে যুদ্ধে লুপ্ত রাজ্যগুলির পুনরুদ্ধার করা। একারণ স্পেন যখন আমেরিকায় সাম্রাজ্য হারাবার প্রশ্ন নিয়ে এই রাষ্ট্রগুলির দরবারে উপস্থিত হোল তখন মিত্র রাষ্ট্রগুলি স্পেনের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য প্রস্তুত হোল। তাদের আরো মতলব ছিল এই সুযোগে নিজেরা কিছু কিছু দখল করবেন সেখানে। ফ্রান্সের লোভ ছিল মেক্সিকোর উপর এবং রাশিয়ার লক্ষ ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার উপর কারণ রাশিয়ার অধীনে ছিল অ্যালাস্কা।

এই সমস্ত পরিকল্পনার ফলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা বিশেষ শংকিত হয়ে পড়ে। আবার তারা আশংকা করল যে ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রশক্তি তাদের বিভিন্ন দিক থেকে চেপে ধরবার চেষ্টা করছেন। তার ফল হবে ভবিষ্যতে আরো অনেক যুদ্ধ এবং তা হবে যুক্তরাষ্ট্রেরই সীমান্তের কাছে।

ইংলণ্ডও অপরদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির এই মিতালীর বিরুদ্ধে ছিল। ল্যাটিন ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সংগে বেশ ব্যবসা বাণিজ্য চলছিল বলে ইংলণ্ড চায়নি এই রাষ্ট্রগুলি পুনরায় ফ্রান্স অথবা স্পেনের অধীনে চলে যায়। ফলে ব্রিটিশ দূত ক্যানিং যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রস্তাব করলেন যে ইংলণ্ডের সংগে যুক্তরাষ্ট্র একযোগে ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে পশ্চিমগোলার্ধ থেকে দূরে সরে

থাকবার জন্য বলবে। আর এই সংগে উভয় রাষ্ট্রই পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হবে যে ব্রিটেন ও আমেরিকা উত্তর অথবা দক্ষিণ আমেরিকার নূতন কোন অঞ্চল দখল করবার চেষ্টা করবে না।

প্রস্তাবটি অত্যন্ত লোভনীয়। পুরাতন শত্রু এর ফলে মিত্রে রূপান্তরিত হবে এবং ব্রিটিশ নৌবহর অত্যন্ত শক্তিশালী হবার ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিও যথার্থই সতর্ক থাকবে। কিন্তু পররাষ্ট্রসচিব জন কুইন্সি অ্যাডামস প্রমুখ আমেরিকানরা মনে করেন যে এই প্রস্তাবের পেছনে ইংলণ্ডের আসল উদ্দেশ্য হোল যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সংগে ল্যাটিন ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সরিয়ে রাখতে। এটা সব সময়ে স্বার্থের অনুকূল নাও হতে পারে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে আমেরিকা ব্রিটিশ নৌশক্তির গাধাবোটে পরিণত হবে মনে করে অ্যাডামস প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র একলাই এবিষয়ে অগ্রসর হোক।

শেষ পর্যন্ত অ্যাডামসের পরামর্শ অনুসারে প্রেসিডেণ্ট মনরো ১৮২৩ সালে কংগ্রেসে বিখ্যাত মনরো ডকট্রিন সম্বলিত বাণী পেশ করলেন। অত্যন্ত সাদা কথায় ও দৃঢ়তার সংগে প্রেসিডেণ্ট মনরো ইউরোপকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে তারা যেন পশ্চিমগোলার্ধে নূতন উপনিবেশ স্থষ্টির প্রচেষ্টা না করেন অথবা স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন। এই বাণীতে আরো বলা হোল যে যুক্তরাষ্ট্র অপরদিকে ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করতে থাকবেন।

পরবর্তী শতাব্দীতে আমেরিকা যে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে মনরো ডক্ট্রিন হল তার ভিত্তি। এরি ফলে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠল পশ্চিম গোলার্ধের শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং ল্যাটিন ও দক্ষিণ আমেরিকার রক্ষাকর্তা। পরবর্তীকালে অন্যান্য যে সমস্ত রাষ্ট্র আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির ওপর হস্তক্ষেপ করতে এসেছিল তাদেরও সতর্ক করে হঠিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্র নিজেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিষয়ে যখন তখন হস্তক্ষেপ করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণের অভিযোগ উঠল।

মনরো ডক্ট্রিনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা এবং আটলান্টিক মহাসাগরের ব্যবধান বাঁচিয়ে রোম ইউরোপ থেকে আমেরিকাকে পৃথক করে রাখা। কিন্তু পরবর্তীকালে মনরো ডক্ট্রিনের বিভিন্ন ভাষ্য করা হয়েছে এবং ফলে নীতিরও

পরিবর্তন ঘটেছে। মনরো ডক্‌ট্রিনের মূল কথা বর্তমানে অচল। কারণ যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আর ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির রক্ষাকর্তার কাজ করে না। কিন্তু তারা সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য আন্তঃঅ্যামেরিকান সংস্থার সদস্য হিসাবে কাজ করছে। তদুপরি এই শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সৈন্যরা ইউরোপে গিয়ে যুদ্ধ করেছে এবং বর্তমানে তারা বিশ্বের সমস্ত গোলযোগ পূর্ণ জায়গাগুলিতে মোতায়েন আছে। কিন্তু অন্যভাবে বিচার করলে এক ব্যাপক অর্থে ডক্‌ট্রিনের নীতিগুলি এখনও কার্যকরী। কারণ আমেরিকার জনসাধারণ এখন পূর্বের চেয়ে অনেকে বিশ্বাস করে যে বিশ্বের যেখানেই হোক না কেন আক্রমণ প্রতিরোধের ভিতরেই তাদের নিজেদের নিরাপত্তা বর্তমান।

* * *

প্রেসিডেণ্ট মনরোর কার্যকাল শেষ হবার সংগে সংগেই "শুভেচ্ছার লগ্ন"-র অবসান ঘটল। এতদিন পর্যন্ত জাতীয় সংহতির অন্তরালে যে আঞ্চলিক স্বার্থ-বুদ্ধি প্রণোদিত বিদ্বেষ ধূমায়মান ছিল ১৮২৪ সালের নির্বাচনে তার প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এই নির্বাচনে রিপাব্লিকান পার্টির চারজন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করেন। তারা হলেন ম্যাসাচুসেট্‌সের জন কুইন্সি অ্যাডামস, জার্জিয়ার উইলিয়ম এইচ ক্র্যাফোর্ড, টেনেসির এনড্রু জ্যাকসন এবং কেনটাকির হেনরী ক্লে।

চারজনের মধ্যে কোন প্রার্থীই গরিষ্ঠ সংখ্যক অথবা অর্ধেকের বেশি সংখ্যক ইলেক্টোরাল ভোট লাভ করতে পারেন নি। তবে জ্যাকসনই এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জনসাধারণের ভোট লাভ করেছিলেন। যাই হোক, প্রতিনিধি সভায় এই নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে হেনরি অ্যাডামসকে সমর্থন করলেন এবং এর ফলে অ্যাডামস প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হলেন। ইতিপূর্বে তাঁর পিতাও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ক্লে পশ্চিমাঞ্চলবাসী হলেও জ্যাকসনকে খুব অপছন্দ করতেন তিনি। জ্যাকসনকে তিনি বলতেন "সৈন্য সর্দার।" অপরদিকে তিনি অ্যাডামস্‌কে পছন্দ করতেন উচ্চরক্ষণ মূলক শিল্প, জাতীয় ব্যাংক এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত প্রাচীনপন্থী মতামতের জন্য।

ওল্ড হিকির অর্থাৎ জ্যাকসনের এই পরাজয়ে দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলে তাঁর সমর্থকরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এদিকে অ্যাডামস্‌ ক্লে উপদলের এই শাসন ব্যবস্থায়

তাঁদের চার বৎসরের কার্যকালে বিশেষ কিছুই সার্থকতা লাভ করতে পারলেন না। ১৮২৮ সালের নির্বাচনে নূতন ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিরূপে জ্যাকসন বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। জ্যাকসনের নীতি যে কি তা কেউ-ই জানতেন না তবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, গণতন্ত্রের মূর্ত রূপ।

জ্যাকসন তাঁর এই সুনাম অনুযায়ী কাজ করেছিলেন, যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন তিনি। যা কিছুকেই তিনি জনসাধারণের ইচ্ছা বলে মনে করতেন সেটাই তিনি কার্যকরী করতেন। ফলে শত্রুরা তাকে আখ্যা দিয়েছিল "রাজা প্রথম অ্যাণ্ড্র।" দেশের কোন রাজনৈতিক উপদল অথবা কোন অঞ্চল বিশেষের প্রতি তিনি আনুগত্যের বাহুল্য দেখান নি, তবে শ্রমিকশ্রেণী, ছোটো ব্যবসায়ী মহল এবং স্বল্পবিত্ত কৃষকরা তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করত। জ্যাকসন-এর প্রবল জাতীয়তাবাদ এবং পূর্বাঞ্চলের ব্যাংক ব্যবসায়ীদের স্বার্থের প্রতি অবিশ্বাসের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের মনোভাব মূর্ত হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলি আপন অধিকারে বিশ্বাসী ছিল তারা মনে করেছিল যে জ্যাক্সন্ তাদের মতামত সমর্থন করবে না কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের ভুল ভেংগে গেল। শুল্কের প্রশ্নে দক্ষিণের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলছিল এবং ১৮৩০ সালে জন সি, ক্যালহুন তার দক্ষিণ ক্যারোলাইনা রাজ্যের নেতৃত্ব নিয়ে ১৮২৮ সালের শুল্ক আইন রদ করে দেবার জন্য অগ্রসর হন। জেফারসনের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক ভোজসভায় অংগরাষ্ট্রগুলির অধিকার প্রভৃতি নিয়ে বেশ খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছিল। অকস্মাৎ প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন উঠে দাঁড়িয়ে "আমাদের ফেডারেল ইউনিয়নকে রক্ষা করতেই হবে" কামনা জানিয়ে ক্যালহুনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। পরে যখন দক্ষিণ আমেরিকা শুল্ক ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেবার জন্য অগ্রসর হয় এবং ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য পরিকল্পনা করেন তখন জ্যাকসন তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতিমতো এই কথাই বলে পাঠালেন যে এক্ষেত্রে তিনি ৪০ হাজার আমেরিকান সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় অভিযান চালাবেন। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা নতি স্বীকার করে, কিন্তু তার অপমানের ক্ষতিপূরণ হিসাবে শুল্কের হার কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্যাকসনের নীতি উত্তর পূর্ব অঞ্চলকে খুশি করলেও

জাতীয় ব্যাংক সম্পর্কে তাঁর নীতি তাদের খুশি করতে পারে নি। সরকার এবং সম্পন্ন ব্যবসায়ীরা একযোগে এই ব্যাংকটি চালাতেন। আর এই ব্যবসায়ীরা প্রায়ই ঋণ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। জ্যাকসন ছিলেন এই ধরণের সুযোগ সুবিধার অত্যন্ত বিরোধী। তিনি স্থির করলেন রাজনীতি সংকুল এই ব্যাংকটিকে আর বরদাস্ত করবেন না। জ্যাকসন ব্যাংক থেকে সমস্ত সরকারী অর্থ তুলে নেবার নির্দেশ দেন। চারদিকে প্রতিবাদ উঠল যে প্রেসিডেন্ট সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করছেন কারণ প্রধান বিচারপতি মার্শাল একটি রায়ে ব্যাংকটিকে সংবিধান সম্মত বলে স্বীকার করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট এই সমস্ত প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নি এবং ফলে ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর জাতীয় অর্থব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে ষ্টেট ব্যাংকগুলি।

ইতিমধ্যে দেশে শুরু হয় সরকারী মালিকানাধীন জমিজমা এবং নূতন শিল্পগুলিকে নিয়ে এক প্রচণ্ড ফাটকাবাজী। আর এই ফাটকাবাজীর আনুকূল্য করে ষ্টেট ব্যাংকগুলিও প্রচুর পরিমাণে কাগজের নোট ছাড়তে শুরু করে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির শুরু হয়। জ্যাকসন তখন নির্দেশ দিলেন যে জমির মূল্য বাবদ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে যে অর্থ জমা পড়বে তা দাখিল করতে হবে সোনা অথবা রূপায়।

জ্যাকসনের শাসন ব্যবস্থায় তিনি ছিলেন "একব্রহ্ম", তিনি নিজেই ছিলেন সরকারের সবকিছু। একারণ নিউ-ইয়র্কের মার্টিন ভ্যান ব্যুরেন-এর হস্তে কার্যভার তুলে দিয়ে তিনি হোয়াইট হাউস ত্যাগ করবার অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, শুরু হয় ১৮৩৭ সালের অর্থনৈতিক সন্ত্রাস। কাগজের নোটের তুলনায় সোনা এবং রূপার পরিমাণ তখন অত্যন্ত কমে গিয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নে অর্থলগ্নী একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়, সহস্র সহস্র লোক বেকার হয়ে পড়ে। আর এর সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে ভ্যান ব্যুরেনের উপর। ১৮৪০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দল পরাজিত হয়। জ্যাকসন এবং ভ্যান ব্যুরেনের বিরোধীপক্ষ দুটি একযোগে হুইগদল নামে প্রার্থী খাড়া করে। প্রার্থী উইলিয়ম হেনরী হ্যারিসন পশ্চিমাঞ্চলের লোক। রেড ইণ্ডিয়ানদের সংগে যুদ্ধ করে তিনিও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

মনরো, অ্যাডামস্‌ এবং জ্যাকসনের কার্যকালে পশ্চিমাঞ্চলে বসতি এবং স্থিতির কাজ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং লুইসিয়ানা অঞ্চল থেকে এলাকা বার করে নিয়ে কয়েকটি নূতন অংগরাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেগুলিকে ইউনিয়নে নিয়ে নেওয়া হয়। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে নিউ ইংলণ্ডের অধিবাসীরা এই বিষয়টিকে খুব ভাল চোখে দেখতে পারেন নি। তাঁদের আশংকা ছিল এর ফলে কংগ্রেসে তাঁদের প্রভাব নষ্ট হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক বিরাট প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, যার স্বার্থ তাঁদের চেয়ে ভিন্ন, দূরবর্তী অংশে পরিণত হবে। এই আশংকার সংগত কারণও ছিল। ১৮২০ সালে দেখা গেল সেনেটের ৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন সদস্য হলেন অ্যালিঘেনি পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্তস্থিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি। ১৮০৩ সালে ওহায়োর জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার ১৮২০ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ। আর ইণ্ডিয়ানার জনসংখ্যা হয়েছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার।

পশ্চিমাঞ্চলের এই সমৃদ্ধি রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল হলেও এর ফলে দাস প্রথার জটিল প্রশ্নটি জনমনে প্রাধান্য লাভ করে। আর এই প্রশ্নটি নিয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল আমেরিকান-ই বিশেষ বিব্রত বোধ করতেন। প্রশ্ন উঠল এই অগণতান্ত্রিক প্রথাটি কি নূতন অংগরাষ্ট্র এবং অঞ্চলগুলিতে বিস্তার লাভ করবে? মিস্যুরি, আরকনমাস এবং দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে অগ্রবর্তী বসতিকারী হিসাবে যে সব দক্ষিণাঞ্চল বাসী গিয়েছিলেন তারা মনে করলেন যে নিগ্রো ক্রীতদাসদের সংগে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাসপ্রথা সম্বলিত রাষ্ট্র গড়ে তুলবার অধিকার তাঁদের আছে। সংবিধানে এটা নিষিদ্ধ নয়। কার্যতঃ কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কেনটাকি টেনেসি, মিসিসিপি এবং লুইসিয়ানা-কে ঐভাবেই ইউনিয়নে প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

অপরদিকে তখন উত্তরাঞ্চলে দাসপ্রথা বিরোধী মনোভাব বেড়ে উঠছে। শুধু নীতিগত ব্যাপারেই নয়, রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক স্বার্থও এই মনোভাব বৃদ্ধি করছিল। তাদের আশংকা হোল দাসযুক্ত রাজ্যগুলির সংখ্যা যদি দাসমুক্ত রাজ্যগুলির চেয়ে বেশি হয় তাহলে দক্ষিণাঞ্চলের স্বার্থ রক্ষিত হবে। বাণিজ্য শুল্কের হার হ্রাস পাবে এবং কৃষি শিল্পের স্বার্থ অধিক রক্ষিত হবে। এর ফলে স্বার্থহানি ঘটবে উত্তরাঞ্চলের ব্যবসায় বাণিজ্যের।

প্রেসিডেণ্ট মনরোর আমলেই এবিষয়ে প্রথম সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল।

তখন প্রশ্নটির আপোষ মীমাংসা সম্ভব হলেও উভয় পক্ষ এবিষয়ে বিশেষ সচকিত হয়ে ওঠে। ১৮১৯ সালে ইউনিয়নে যখন দাসমুক্ত রাজ্য ছিল এগারটি এবং দাসযুক্ত রাজ্য ছিল সমসংখ্যক সেই সময়ে মিস্যুরি দাসপ্রথা সম্বলিত হয়ে ইউনিয়নে প্রবেশাধিকার লাভের আবেদন করে। উত্তরাঞ্চল আপত্তি জানিয়ে বলে যে এর ফলে দাসযুক্ত ও দাসমুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যাসাম্য নষ্ট হবে এবং মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে দাসত্ব প্রথা বিস্তারের নজীরেরও সৃষ্টি হবে। দক্ষিণাঞ্চল তখন সাংবিধান অধিকারের প্রশ্ন তুলে ঘোষণা করে যে কংগ্রেসের অধিকার হোল শুধুমাত্র রাষ্ট্রকে ইউনিয়নে প্রবেশাধিকার দেওয়া, কিন্তু সেই প্রবেশাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপের এক্তিয়ার কংগ্রেসের নেই। দক্ষিণাঞ্চল মন্তব্য করল যে কি হবে বা না হবে তা নির্ধারণ করবার অধিকার একমাত্র সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনসাধারণের।

১৮২০ সালে হেনরী ক্লে (দি গ্রেট কম্প্রোমাইজার) এই সমস্যার এক সমাধান বার করলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে তার ফলাফল হোল সুদূরপ্রসারী। মেইন তখনও ম্যাসাচুসেট্সের অংগ। ম্যাসাচুসেট্সের সম্মতি নিয়ে মেইনকে দাসমুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে ইউনিয়নে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এদিকে মিস্যুরি দাসযুক্ত রাজ্য হিসাবে প্রবেশাধিকার লাভ করে, ফলে সংখ্যাসাম্য বজায় থাকে। এই সময়ে মিস্যুরির দক্ষিণ সীমান্ত থেকে শুরু করে লুইসিয়ানার মধ্য দিয়ে ৩৬—৩০ অক্ষরেখা বরাবর এক কাল্পনিক রেখা টানা হয় এবং সেই রেখার উত্তরস্থ বিরাট অঞ্চলে দাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়। এই আপোষে উভয় পক্ষই সন্তোষ লাভ করে।

জ্যাকসনের কার্যকালের পূর্বে এই ধরণের সংখ্যাসাম্য রক্ষা করবার প্রয়োজন আর দেখা দেয় নি। ১৮৩৬ সালে আরকানসাস দাসযুক্ত অঞ্চল হিসাবে ইউনিয়নে প্রবেশ করে; এবং মিসিগান আসে দাসমুক্ত অঞ্চল হিসাবে। অনুরূপভাবে ১৮৪৫-৪৬ সালে ফ্লোরিডা এবং আইওয়া ভিন্ন নীতি নিয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করায় সংখ্যাসাম্য বজায় ছিল। দাসপ্রথার এই প্রশ্নটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম যুগে চাপা থাকলেও ধীরে ধীরে তা জোরদার হয়ে দেখা দিতে লাগল এবং সংকটের সৃষ্টি হয়ে থাকে। পশ্চিম দিকে বসতির জন্যে লোকে যতই এগোতে থাকল ততই প্রশ্নের তীব্রতা ও তিক্ততা বৃদ্ধি পেল। উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলিতে পর্যন্ত জনসাধারণ এই প্রসংগের

বিতর্কে মেতে উঠল এবং পাদ্রীরা পর্যন্ত তাদের মতামত প্রকাশ করতে থাকলেন। অপরদিকে উগ্রপন্থীরা ছড়াতে থাকল আঞ্চলিক বিদ্বেষ। ১৮৪০ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিল দাসপ্রথা। শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয় এক বিরাট গৃহ যুদ্ধের মাধ্যমে। কিন্তু ততদিনে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার সম্পূর্ণ হয়েছে।
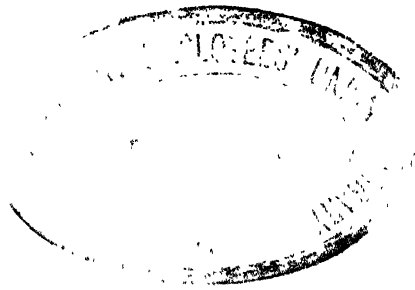
ষষ্ঠ অধ্যায়

গৃহযুদ্ধের কাল

শতাধিক বৎসর পূর্বে আমেরিকার জনসাধারণ দুটি রণহুংকারের সংগে সবিশেষ পরিচিত ছিল। প্রথমটি অর্থাৎ "রিমেম্‌বার দি অ্যালামো" উল্লেখ হোত ১৮৩৬ সালে সান অ্যান্টোনিও-তে মেক্সিকান সৈন্যদল কর্তৃক টেক্সাসদের হত্যালীলা প্রসংগে, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ "ফিফটি—ফোর ফরটি অর ফাইট" উল্লিখিত হোত ওরিগন অঞ্চলের উত্তর সীমানা প্রসংগে বিরোধ সম্পর্কে। ১৮৪০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের মধ্যে এই সীমানা বিরোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৪০ সালের জাতীয় নির্বাচনে হুইগদল যখন ডেমোক্রাটদের পরাজিত করে প্রায় সেই সময়েই আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে টেক্সাস এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অরিগন পাশ্চাত্য শক্তির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। মেক্সিকানরা স্পেনের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভের পর টেক্সাস ছিল মেক্সিকোর অন্তর্গত একটি রাজ্য। অপর দিকে আবিষ্কার এবং বসতির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড উভয়েই অরিগণের উপর আপন আপন অধিকার দাবী করে। হুইগ দল

আমেরিকানদের এই দাবী দুইটি সার্থক করে তুলতে না পারায় ১৮৪৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়।

এই শতকের তৃতীয় দশকে টেক্সাসের জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল আমেরিকান। মেক্সিকো সরকার তাদের সেখানে গিয়ে বসতি করতে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু কিছুকাল পর মেক্সিকো দেখতে পেলো যে ওই রাজ্যে তাদের প্রভাব নষ্ট হতে বসেছে তখন তারা অকস্মাৎ নীতির পরিবর্তন করে। টেক্সাসে নূতন বসতিকারীর আগমন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কঠোর শাসন ব্যবস্থা চালু করে। ফলে টেক্সাস স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং যুদ্ধ শুরু করে।

এই স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট সাণ্টাঅ্যানা স্বয়ং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সাণ্ট অ্যাণ্টেনিয়স্থ অ্যালামো ভবনে একদল আমেরিকান সৈনিককে বিধ্বস্ত করেন। শীঘ্রই তিনি এর প্রতিফল পেয়েছিলেন। ১৮১২ সালের যুদ্ধে জেনারেল স্যাম হিউজটনের নেতৃত্বে একদল টেক্সাস সৈন্য সান জ্যাসিন্‌টো-তে **মেক্সিকানদের** বিধ্বস্ত করে। সাণ্টা অ্যানা গ্রেপ্তার হন এবং যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। টেক্সাস তখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়, প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হল স্যাম হিউজটন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হবার দরুণ টেক্সাসদের মনে ছিল একটা গর্বের ভাব। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সংগে ছিল তাদের নাড়ীর টান। একারণেই তারা ইউনিয়নে যোগ দিতে চায়। কিন্তু সেখানে দাসপ্রথা চালু থাকায় উত্তর অঞ্চল টেক্সাসের প্রবেশাধিকারে বাধা দিল। এছাড়া ইতিমধ্যেই মেক্সিকো ঘোষণা করে যে টেক্সাসকে ইউনিয়নে নেওয়া হবে যুদ্ধেরই সামিল। এটিও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৮৪৪ সালের নির্বাচনের সময় অবস্থা ছিল এরকম। ডেমোক্র্যাট দল টেনেসির জেমস্ কে পোল্‌ক্-কে প্রার্থী নির্বাচন করে। তারা টেক্সাস এবং অরিগনের যুক্তরাষ্ট্র ভুক্তির সমর্থনে এগিয়ে আসে। উত্তর এবং দক্ষিণের সর্বত্রই এই নীতি বিশেষ সাড়া জাগায়। কারণ অরিগনের বসতিকারীরা ছিল উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী অতএব স্বভাবতই সেটি ইউনিয়নে আসবে দাসমুক্ত অঞ্চল হিসাবে এবং দাসযুক্ত টেক্সাসের প্রবেশলাভের দরুন যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত সেখানে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে। হুইগ

দলের প্রার্থী ছিলেন আপোষপন্থী হেনরী ক্লে। তিনি অঞ্চল দুটির যুক্তরাষ্ট্র-ভুক্তির স্বপক্ষে নীতি ঘোষণা করতে না পারায় পোল্‌ক্‌ নির্বাচিত হন।

পোল্‌ক্‌ কার্যভার গ্রহণের পূর্বেই টেক্সাস ইউনিয়নে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। অতঃপর নূতন প্রেসিডেন্ট ব্রিটেনের সংগে অরিগন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করে নেন। যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ কানাডার ভেতর দিয়ে ৫৪-৫০ অক্ষরেখা পর্যন্ত অর্থাৎ রুশ অধিকৃত আলাস্কার সীমান্ত পর্যন্ত পুরো উত্তর পশ্চিম অঞ্চলটি আপন অধিকারে আনবার জন্য ব্রিটেনের নিকট দাবী জানায়। ব্রিটেন অস্বীকৃত হয়। ৫৪-৪০ অক্ষরেখা পর্যন্ত না হলে যুদ্ধ হবে এই নির্বাচনী ঘোষণার অন্যথা করে পোল্‌ক্‌ ব্রিটেনের সংগে একটি মাঝামাঝি রফা করে ফেললেন। স্থির হোল ৪৯° অক্ষরেখা পর্যন্ত এলাকা আমেরিকার অধিকারে থাকবে।

এর কিছুকাল পর টেক্সাসের দক্ষিণ সীমান্ত নিয়ে এক বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং ফলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় মেক্সিকোর সংগে। এই অঞ্চলে যুদ্ধ হবে বলে বহুদিন থেকেই লোকে আশা করছিল। অনেকে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র ওখানে একটা গোলমালের সূত্রপাত করে দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে হারিয়ে দিয়ে আরো অনেকটা জমি অধিকার করে নেবার মতলবে ছিল; অপরদিকে মেক্সিকো এবিষয়ে কোনরূপ আপোষ আলোচনা করতে অস্বীকৃত হয় এবং রি-ও-গ্র্যাণ্ড নদীর অপর তীরে তারাই প্রথম যুদ্ধ শুরু করে। যাই হোক, জেনারেল জ্যকারি টেলর এবং জেনারেল উইনফিল্ড স্কটের নেতৃত্বে আমেরিকান সৈন্যরা অল্পকালের মধ্যেই মেক্সিকোর ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে যায় অপরদিকে মার্কিন নৌবাহিনীর সহায়তায় বসতিকারীরা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী ক্যালিফোর্ণিয়াকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে থাকে।

১৮৪৮ সালের মধ্যে মেক্সিকোর রাজধানীটিও যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে এবং আমেরিকানরা সর্বত্রই বিজয়ী হয়। মেক্সিকো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এক বিরাট অংশ আমেরিকাকে ছেড়ে দেয়। ক্যালিফোর্ণিয়া, নিউ মেক্সিকো এবং অ্যারিজোনা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই হস্তান্তরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোকে নগদ এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার মূল্য দিতে স্বীকৃত হয়। আমেরিকানদের মধ্যে অনেকের কাছেই সন্ধির এই সর্তগুলি অত্যন্ত উদার মনে হয়েছিল এবং তাদের মতে সমগ্র মেক্সিকো অধিকার করে ইউনিয়নে জুড়ে দেওয়াই ছিল সঠিক পন্থা।

মেক্সিকোর কাছ থেকে পাওয়া এই নূতন অঞ্চল ইউনিয়নভুক্ত হওয়ায় কার্যতঃ যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এই বিরাট দেশ, যদিও মরুভূমি ও তুন্দ্রাঞ্চল এবং জঙ্গলাকীর্ণ এক বিরাট অংশ দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

*   *   *

১৮৪৯ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্বর্ণ প্রাপ্তির যুগ শুরু হয়। এবং তখন হিড়িক পড়ে যায় সমগ্র দেশ পেরিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়া যাবার। খবর রটে গেল যে ক্যালিফোর্ণিয়ার গিরিখাতে এবং নদীতে সোনা পাওয়া যাচ্ছে। ফলে ভাগ্যান্বেষীরা হাজারে হাজারে এগিয়ে চললেন ঐ নূতন অঞ্চল অভিমুখে। প্রাচীন বসটন নগরী থেকে, কর্মমুখর নিউইয়র্ক থেকে এবং পূর্ব অঞ্চলের গ্রাম থেকে ও খামার থেকে কাতারে কাতারে লোক ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে করে গিয়েছিল ক্যালিফোর্ণিয়ায়। রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ, প্রচণ্ড গরম ও হাড় জমানো শীত কিছুই তাদের রুখতে পারেনি। নূতন দেশে তারা গিয়েছিল ভাগ্যের সন্ধানে।

এই স্বর্ণযুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত ক্যালিফোর্ণিয়া ছিল একটি শান্ত এলাকা। সেখানে ছিল স্প্যানিশদের কিছু সংখ্যক খামার (র‍্যাঞ্চ) ও মিশন এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে কিছু সংখ্যক আমেরিকান বসতিকারী। ১৮৪৯ সালে এর জনসংখ্যা ৬ হাজার থেকে বেড়ে ৮৫ হাজারে দাঁড়ায় এবং এর কর্মব্যস্ত নাগরিকরা, তাদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তরাঞ্চলের লোক, দাসমুক্ত রাষ্ট্র হিসাব ক্যালিফোর্ণিয়ার ইউনিয়নে প্রবেশের জন্য দাবী তোলে।

এই দাবী ওঠায় দেশের পক্ষে ভালোই হয়েছিল। কারণ মেক্সিকোর কাছ থেকে পাওয়া অঞ্চলগুলি কিভাবে ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত করা হবে তাই নিয়ে কংগ্রেসে তখন মহাবিতণ্ডা চলেছে। এই গোলমালে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অঞ্চলই মিস্যুরি আপোষে নির্ধারিত দাস প্রথার সীমান্ত অঞ্চল মুছে ফেলে দিল। উত্তরাঞ্চল বলল সমগ্র পশ্চিম এলাকাই দাসমুক্ত অঞ্চল হবে। অপরদিকে দক্ষিণও জোর গলায় বললে সমগ্র পশ্চিম এলাকা হবে দাসযুক্ত অঞ্চল। এই দুই উগ্রপন্থী দলের মাঝখানে ছিলেন একদল নরমপন্থী। তারা বললেন যে এই নূতন অঞ্চলের লোকদের উপরই ভার দেওয়া হোক দাসপ্রথা থাকবে বা না থাকবে সেটা নির্ধারণ করার।

এবারেও সংকট-ত্রাণে এগিয়ে এলেন মহান আপোষবাদী হেনরী ক্লে। ক্লে প্রস্তাব করলেন যে ক্যালিফোর্ণিয়াকে দাসমুক্ত অঞ্চল হিসাবে ইউনিয়নে নেওয়া হোক এবং মেক্সিকোর কাছ থেকে পাওয়া অবশিষ্ট অঞ্চলকে ভাগ করে ইউটা এবং নিউমেক্সিকো গঠিত হোক। এই শেষোক্ত দুটি রাষ্ট্র দাসমুক্ত অথবা দাসযুক্ত হবে কিনা সে প্রশ্ন বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া হোক তাদেরই হাতে। ক্লে-র প্রস্তাবের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সেটা হোল পলাতক ক্রীতদাস আইন। দক্ষিণাঞ্চলকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই এটি করা হয়েছিল। এই আইনে বলা হোল যে কোন ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলে পালিয়ে গেলে তাকে ধরে অবিলম্বে তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এই আপোষ সম্পর্কে ১৮৫০ সালে এক অবিস্মরণীয় বিতর্কের অবতারণা হয়। দক্ষিণের স্বপক্ষে বলতে দাঁড়িয়ে বর্ষীয়ান ক্যালহুন নূতন অঞ্চলগুলিতে বিনা সর্তে দাসপ্রথা চালুর ব্যবস্থা হয়নি বলে ক্লে-র বিধানের বিরোধীতা করলেন। ক্যালহুন যুক্তি দেখালেন যে ক্রীতদাসরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অতএব এই বিষয়টি রাজ্য অথবা আঞ্চলিক আইনের আওতায় পড়ে, কেন্দ্রীয় আইনের নয়। একারণ এই সমস্ত অঞ্চলে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করবার কোন অধিকার কংগ্রেসের নাই।

এই আপোষের ব্যাপারে উত্তরাঞ্চলও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তাদের আপত্তির কারণ ঘটেছিল পলাতক ক্রীতদাস আইন সম্পর্কে। কিন্তু দেখা গেল তাদের পক্ষের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টার ইউনিয়নকে রক্ষা করবার এক হৃদয়গ্রাহী আবেদন নিয়ে হেনরী ক্লে-কে সমর্থন করলেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে ক্লে-র আপোষমূলক ব্যবস্থাটি গৃহীত হয় এবং লোকে মনে করে যে চিরতরে প্রসংগটির মীমাংসা হয়ে গেল।

* * *

আমেরিকা তখন সমৃদ্ধির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দেশে মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত হয়ে পড়েছে রেলপথ, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কারখানাগুলিতে প্রবলভাবে কাজ চলছে, মধ্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর খাদ্যশস্য— এবং কালিফোর্ণিয়ায় তখনও চলেছে 'স্বর্ণযুগ' অপরদিকে দক্ষিণের সমৃদ্ধির মূলসূত্র রয়েছে কার্পাসের ব্যবসায়ে।

১৮৫০ সালে দক্ষিণ অঞ্চলের মোট প্রায় ৯০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৩০

লক্ষের কিছু বেশি ছিল ক্রীতদাস। আবার এই ক্রীতদাসদের মালিক ছিল অল্পসংখ্যক শ্বেতাংগ। যাই হোক্‌, অধিকাংশ নিগ্রোই কয়েক হাজার সম্পন্ন ও বনেদী পরিবারের বিরাট আবাদগুলিতেই কাজ করত। সংবিধানে ১৮০৮ সালের পর বাইরে থেকে আর ক্রীতদাস আমদানী করা রহিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখন এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে ক্রীতদাসের কমতি হবার কোন আশংকাই আর ছিল না।

ক্রীতদাসদের অবস্থারও হেরফের ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কঠোরভাবে শাসন করা হোত তবে নিষ্ঠুরতা ছিল না তাতে। আবার কিছু কিছু বাগিচায় তারা আরো ভাল ব্যবহার পেত, তাদের অল্প-শিক্ষা দেওয়া হোত এবং তাদের গীর্জায়ও যেতে দেওয়া হোত, আর নিয়মিত কর্তব্য সম্পাদন আপোষে তাদের যত্রতত্র যাওয়া আসার অধিকারও ছিল। এদের মধ্যে অনেককে আবার কাজের জন্য সামান্য মজুরীও দেওয়া হোত এবং তাই জমিয়ে কয়েক বছর পর তারা নিজেদের স্বাধীনতা ক্রয় করিতে সমর্থ হোত।

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ক্রীতদাসদের খাটান হোত অমানুষিকভাবে। তাদের মারধোর করা হোত এবং নীলামে বেচে দিয়ে ক্রীতদাস পরিবারকে ভেঙে দিত মালিকরা। এই দুঃসহ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে অনেক ক্রীতদাস উত্তর অঞ্চলে অথবা কানাডায় পালিয়ে গিয়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করত। অনেক সময় তারা এই ব্যাপারে সহৃদয় উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্য পেতো। এরা ক্রীতদাস আইন অমান্য করে তাদের মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিত না।

উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথার সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট ছিল বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই তারা তা রহিত করে দেয়। ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনে অথবা পলাতক নিগ্রোদের মুখ থেকেই নিগ্রহের সম্পর্কে অবহিত হয়ে উত্তরের লোকেরা দাসপ্রথা প্রসংগ সম্পর্কে নৈতিক বিচারে অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। দাসপ্রথা রহিত করবার স্বপক্ষে ছোটো একটি দল এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আন্দোলন করতে থাকে। ১৮৫২ সালে হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো বাগিচার জীবনযাত্রা সম্পর্কে 'আংকল টমস্‌ কেবিন' নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসখানির উত্তর অঞ্চলে প্রবল কাটতি হয় এবং জনমত তাতে আরো সচকিত হয়ে ওঠে।

'আংকল টমস্ কেবিন' বা অন্য কিছুর ফলে উত্তরাঞ্চলের জনমত যত সচকিত হয়ে উঠেছিল তার চেয়েও বেশি হয়ে উঠল ১৮৫৪ সালে কানসাস নেব্রাস্কা আইন নিয়ে। ইলিনয়-এর ডেমোক্র্যাট দলের সেনেটের স্টিফেন ডগলাস এই আইনটির রচয়িতা। এর ফলে মিস্যুরী সম্পর্কিত আপোষ রফা বাতিল হয়ে যায় ফলে লুইসিয়ানার উত্তর অঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকায় আপন পছন্দ অনুযায়ী দাসপ্রথা সম্পর্কে নীতি স্থির করার অধিকার চালু হয়। মিস্যুরী সংক্রান্ত আপোষ রফায় লুইসিয়ানার উত্তর অঞ্চলে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ছিল। এই নূতন আইনের বলে দক্ষিণাঞ্চল আর একবার দাস প্রথাকে বিস্তৃত করবার সুযোগ পেয়ে গেল।

ডগলাস যে ঠিক কেন এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা এখনও রহস্যাবৃত। হয়তো বা তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের সমর্থন চাইছিলেন। অপরদিকে তার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল এবং হয়তো তিনি এই অঞ্চলটিকে আরো উন্নত করবার সুযোগ চাইছিলেন এর মধ্য দিয়ে। আবার ডগলাসের স্ত্রী ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের মেয়ে এবং তিনিও হয়তো তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেন। যাই হোক অঞ্চলটিকে কানসাস এবং নেব্রাস্কায় বিভক্ত করা হোল এবং সেখানে বসতি শুরু হয়ে গেল। প্রায় সংগে সংগেই কানসাসে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য উত্তর এবং দক্ষিণে প্রবল রেষারেষি শুরু হয় এবং উভয় পক্ষের গুণ্ডা প্রকৃতির ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা পরস্পরের উপর আপন মতামত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আপন ভবিষ্যত স্থির করার এই নীতি কাগজে কলমে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন কানসাসে কিন্তু এর ফলে শুধু রক্তপাতই ঘটেছিল।

তিন বছর পর ড্রেড স্কট মামলায় সুপ্রীমকোর্ট যে রায় দেয় তার ফলে দাসপ্রথা আরো সমর্থন লাভ করে। স্কট ছিল একজন ক্রীতদাস। সে এই বলে মামলা দায়ের করে যে তার মালিক একদা তাকে দাসমুক্ত অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং একারণ সে মুক্তি পেতে পারে। প্রধান বিচারপতি ট্যানি স্কটের আবেদন বাতিল করে দিয়ে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে কোন দাসমুক্ত অঞ্চল নেই। সংবিধান অনুসারে ক্রীতদাস হল সম্পত্তি-বিশেষ, একারণে কোন অঞ্চলকে দাসমুক্ত করার অধিকার কংগ্রেসের নাই। অতএব প্রত্যেক নূতন রাষ্ট্রেই অতঃপর দাসপ্রথা চালু করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চলে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠছিল। এই দলের লোকেরা তাদের নামকরণ করেছিল রিপাব্লিকান। তারা সরাসরি দাবী করল যে নূতন অঞ্চলগুলিতে দাসপ্রথার বিস্তার বন্ধ করতে হবে। এই নূতন দলের অন্যতম নেতা হলেন ইলিনয়স্থ স্প্রিংফিল্ডের রাজনীতিক এব্রাহাম লিংকন। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবি। এই রিপাব্লিকান পার্টি থেকেই চলে আসছে বর্তমান রিপাব্লিকান পার্টির ধারা।

কেনটাকির সীমান্তে এক সামান্য কুড়েঘরে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লিংকনের জন্ম। সৎ এবলিংকন পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর তার কার্যকালের সময় যে সংকট উপস্থিত হয়েছিল একমাত্র বিপ্লবের সময় ছাড়া অতবড়ো সংকট আমেরিকার ইতিহাসে আর দেখা দেয়নি। লিংকন ছিলেন অত্যন্ত ঢ্যাঙা এবং গেঁয়ো ধরনের লোক, জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি। তার শিক্ষালাভ হয়েছিল সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এবং তিনি অত্যন্ত উচ্চাকাংক্ষী ছিলেন। যৌবনে তিনি ইলিনয়ে চলে আসন এবং মফঃস্বলে ওকালতি করে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেন। এই সময় তিনি একবার কংগ্রেসে নির্বাচিত হন। লিংকনকে ইলিনয়ের লোকেরা মোটামুটি চিনলেও ১৮৫৮ সালে "ক্ষুদে দৈত্য" ষ্টিফেন এ, ডগলাস-এর সংগে বিতর্কে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত দেশের অন্যান্য প্রান্তের লোক তার নাম জানত খুবই সামান্য। এরা দুজনেই তখন ইলিনয় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন।—লিংকন প্রার্থী হয়েছেন রিপাব্লিকান দলের এবং ডগলাস ডেমোক্র্যাট দলের।

বিতর্ক সভায় লিংকন ডগলাসকে প্রশ্ন করলেন যে ড্রেড স্কট মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে কোন অঞ্চলের জনসাধারণ সেই অঞ্চলটি অংগরাষ্ট্রে পরিণত হবার পর আইনতঃ কি সেখান থেকে দাসপ্রথা দূর করতে পারে? ডগলাস জবাব দিলেন যে তা সম্ভব। কারণ আইন সম্মত হলেও সরকার অনিচ্ছুক জনসাধারণের উপর জোর করে দাসপ্রথা চাপিয়ে দিতে পারে না। ডগলাস চাতুর্যের সংগে দক্ষিণের সমর্থন লাভের যে পরিকল্পনা করেছিলেন এই জবাবের ফলে তা নষ্ট হয়ে গেল কারণ দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা ঘোষণা করলেন যে দাসপ্রথা যদি আইনসম্মত হয় তাহলে নূতন অঞ্চলগুলির দাসমালিকদের তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করবার অধিকার আছে এবং এজন্য প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগও বিধেয়।

ই ডগলাস সামান্য ভোটাধিক্যে সেনেটে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু উত্তরকালে তাঁদের এর চেয়েও বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। লিংকন ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন "আমি বিশ্বাস করি যে অর্ধেক অঞ্চল দাসযুক্ত এবং বাকি অর্ধেক দাসমুক্ত থাকবে এটা সরকার চিরকাল বরদাস্ত করতে পারেন না।……ব্যবস্থা হয় এপক্ষে হবে, না হয় অন্যপক্ষে হবে"। এই উক্তির ফলে তিনি সমগ্র উত্তরের অধিবাসীদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন অর্জন করেন।

১৮৫৯ সালে জন ব্রাউন নামে দাসপ্রথা অবলুপ্তির একজন উগ্র সমর্থক ভার্জিনিয়ার হারপার্স ফেরিতে সরকারী অস্ত্রাগারের উপর হানা দেয়। সমগ্র দেশে এই ঘটনার ফলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাউন এবং তার ১৯ জন সহচরের মতলব ছিল অস্ত্রাগারটির অস্ত্রশস্ত্র দখল করে দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস মুক্তির অভিযান চালাবে। রবার্ট ই, লী-র নেতৃত্বাধীনে মার্কিন সৈন্যরা ব্রাউনকে গ্রেপ্তার করে এবং তার ফাঁসী হয়ে যায়। উত্তর এবং দক্ষিণের সমস্ত অধিবাসী ব্রাউনের এই হঠকারিতার তীব্র নিন্দা করে। কিন্তু নিউ-ইংলণ্ডের দাসমুক্তির সমর্থক কয়েকজন বুদ্ধিজীবি বিশেষ করে কবি ও দার্শনিক রাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো এমার্সন ব্রাউনকে শহীদ মনে করতে থাকেন এবং তার এই আত্মদানকে যিশুখ্রীষ্টের আত্মদানের সমতুল জ্ঞান করেন। দক্ষিণ সব সময়ই বিদ্রোহের ভয়ে শংকিত ছিল। এই ঘটনার ফলে সেখানে আরো ক্রোধের সঞ্চার হয়।

১৮৬০ সালের নির্বাচনী অভিযান শুরু হয়ে যায়। উভয় পক্ষের চাপা উত্তেজনা তীব্ররূপ ধারণ করে। ডেমোক্র্যাট পন্থীর প্রেসিডেণ্ট বুকানন ক্রীতদাস প্রথা প্রসংগে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তৎবিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ফলে পার্টি তাঁকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে না। সাউথ ক্যারোলাইনার চার্লসটনে ডেমোক্র্যাট দলের সম্মেলন শুরু হয়। তারা মনে করেছিল ষ্টীফেন এ ডগলাস-কে প্রার্থী মনোনীত করলে হয়তো-বা দলের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকবে। কিন্তু ক্ষুদে দৈত্য ডগলাস দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা সংরক্ষণ এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে সম্প্রসারণের যে দাবী তুলেছিল তাতে সম্মত হতে পারল না। ফলে দলের উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় উপদল দুটি বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণাঞ্চলীয় ডেমোক্র্যাটরা প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে কেনটাকির জন সি ব্রেকিনরিজ-কে এবং পরে উত্তরাঞ্চলীয়রা অপর এক সম্মেলনে প্রার্থী মনোনীত করেন ডগলাসকে।

রিপাব্লিকানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শিকাগোতে। আশা ছিল প্রেসিডেন্ট-পদে প্রার্থী মনোনীত হবেন নিউ-ইয়র্কের সেনেটর উইলিয়ম এইচ সিউয়ার্ড। কিন্তু সম্মেলনে লিংকনপন্থী মনোভাবের বিশেষ প্রসার দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ব্যালটে এব্রাহাম লিংকন প্রার্থী মনোনীত হন। পার্টির নির্বাচনী ঘোষণায় দাস প্রথার সম্প্রসারণ রোধ করবার আহ্বান জানান হয় এবং কাঞ্জাসকে দাসমুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে ইউনিয়নে প্রবেশাধিকার দেবার দাবী জানান হয়। শুধু তাই নয় দেশের শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এরা উচ্চহারে রক্ষণমূলক শুল্ক স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে আভ্যন্তরীণ উন্নতি অর্থাৎ জনসেবামূলক কার্যাদির দাবী তোলেন। এর ফলে দক্ষিণে আরো ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল।

চতুর্থ আর একটি দল সংবিধানিক একতাবাদী টেনেসির জন বেলকে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে। এরা আশা করেছিল সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলিতে ভোট পাবে এবং সেকারণে ক্রীতদাস প্রসংগটিকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের কথাই নির্বাচনী-ইস্তাহারে ঘোষণা করে।

১৮৬০ সালের নভেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ী হয় রিপাব্লিকান দল। মোট ভোটের মাত্র ৪০ শতাংশ পেয়ে লিংকন নির্বাচিত হন। সীমান্তবর্তী কোন রাজ্যের ভোটই তিনি পাননি। যাই হোক প্রার্থী চার জনের মধ্যে তিনিই সাধারণ সংখ্যক ভোট পেয়েছিলেন এবং ইলেকটোরাল কলেজের নির্বাচনে তিনি গরিষ্ঠ সংখ্যক ভোটলাভে সমর্থ হন। লিংকনের পরেই ভোট পেয়েছিলেন ডগলাস, আর ব্রেকিনরিজ এবং বেল সমর্থিত হয়েছিলেন শুধুমাত্র সীমান্তবর্ত্তী ও দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক।

লিংকনের নির্বাচনের সংবাদে দক্ষিণে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ডিসেম্বর মাসে সাউথ ক্যারালাইনা ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করে এবং তার পদাংক অনুসরণ করে সুদূর দক্ষিণের আরো কয়েকটি রাষ্ট্র। ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এ্যালাবামার মণ্টগোমারিতে এদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে কন্‌ফেডারেট ষ্টেটস্‌ অব আমেরিকা গঠন করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জেফারসন্‌ ডেভিস। ওয়েষ্ট পয়েণ্টের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডেভিস মেক্সিকান যুদ্ধে প্রচুর শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সেনেটের সদস্য এবং একসময় সমর-সচিব পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইউনিয়নের এই সংকটের সময় কংগ্রেস নানাভাবে আপোষ করে দক্ষিণকে ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টা পায়, চেষ্টা করে অবশিষ্ট দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিকে ইউনিয়নে ধরে রাখবার কিন্তু তাদের সে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। লিংকন তথা রিপাব্লিকান পার্টি শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় দক্ষিণের আশংকা হল যে তারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে। তাদের আশংকা হোল ক্রীতদাস প্রথাকে সম্প্রসারিত করতে না পারলে সমৃদ্ধিমুখী উত্তরাঞ্চল দেশকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে দক্ষিণের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হবে। বৈরী-ভাবাপন্ন সংখ্যাগুরুর ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অংগরাষ্ট্রের অধিকারের পোষক দক্ষিণাঞ্চলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এটা তাদের সহ্য হোল না। দক্ষিণীরা মনে করল যে কৃষি এবং শিল্প প্রধান এই দুইটি অঞ্চলের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, তা কোন মতেই এক হতে পারে না।

১৮৬১ সালের মার্চ মাসে লিংকন যে অভিষেক বাণী দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল এক আপোষের সুর, দক্ষিণের নিকট কার্যতঃ আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। তিনি বললেন যে শুধুমাত্র ক্রীতদাস প্রথা সম্প্রসারণের বিরোধী-ই তিনি, কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে এই প্রথা বর্তমান সেখানে তিনি এর বিরোধী নন। জাতির উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দক্ষিণীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যে নৈতিক, বাহ্যিক এবং রাজনৈতিক বিচারে দেশের এই দুইটি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তিনি আরো প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না করা হলে সরকার আগ বাড়িয়ে কারো উপর জবরদস্তি করবে না।

একমাস পর চার্লসটন বন্দরে দক্ষিণের জবাব মিলল। সেখানকার ছোট্ট দ্বীপের সামটার দুর্গে কিছু সংখ্যক যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য অবস্থিত ছিল। দুর্গের রসদ ফুরিয়ে আসছিল। লিংকনের সম্মুখে তখন দুটি পন্থা খোলা রয়েছে। একটি হোল সমুদ্রপথে আরো রসদ পাঠান, আর অপরটি হোল কনফেডারেট সরকারের হাতে দুর্গটি তুলে দেওয়া। লিংকন প্রথম পন্থা অবলম্বন করলেন এবং সেই সংগে ঘোষণা করলেন যে রসদের সংগে কোন অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হচ্ছে না। এদিকে কনফেডারেট-রা এই ব্যবস্থাকে শত্রুতামূলক আচরণ বলে মনে করল এবং ১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারা দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করে। দুই দিন পর দুর্গের সৈন্যরা আক্রমণ করে। দুর্গ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা

নামিয়ে দিয়ে সেখানে উত্তোলিত হয় কনফেডারেটের পতাকা। এইভাবেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ।

সামটার দুর্গের ঘটনা প্রচার হয়ে গেলে দক্ষিণে দেখা দেয় প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাস আর উত্তরে হয় ক্রোধের সঞ্চার। প্রেসিডেণ্ট লিংকন সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ৭৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের আবেদন জানান। ইতিমধ্যে নর্থ ক্যারোলাইনা, ভার্জিনিয়া, আরাকানসাস এবং টেনেসি এই চারটি রাজ্য ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করে। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি দক্ষিণের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও কেনটাকির মিস্যুরী এবং মেরীল্যাণ্ডকে বলপূর্বক ইউনিয়নে যুক্ত করে রাখা হয়। ভার্জিনিয়ার এক অংশ ইউনিয়নের প্রতি অনুগত থেকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া নামে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জনসংখ্যা এবং শিল্পগত বিচারে দক্ষিণের চেয়ে উত্তরের সুবিধা ছিল অনেক বেশী। ইউনিয়নের অনুগত ছিল ২৩টি অংগ রাষ্ট্র, মোট জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি; অপরদিকে ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ১১টি অংগরাষ্ট্র, মোট জনসংখ্যা কমবেশি এক কোটি। দক্ষিণের এই এককোটি জনসংখ্যার মধ্যে আবার ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল কমবেশী ৩৫ লক্ষ। এইভাবেই দেখা যায় শ্বেতাংশ জনসংখ্যার হিসাবে তিন-এক আনুপাতিক হারে দক্ষিণের উপর উত্তরের প্রাধান্য ছিল। এছাড়া উত্তর ইউরোপ থেকে নিয়মিতভাবে উত্তর অঞ্চলে বসতিকারীরা আসছিল।

শিল্পগত বিচারে উত্তরাঞ্চলের অনুগত ছিল মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল। সেখানে ছিল অনেক কল কারখানা। ফলে যুদ্ধের রসদ উৎপাদনে সুবিধা ছিল প্রচুর। আর ছিল সেই অস্ত্রশস্ত্র বয়ে আনবার জন্য সুবিস্তৃত রেলপথ। দক্ষিণে এসবের কিছুই ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্য তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল এবং তারা ইউরোপ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাচার করে আনত।

যাই হোক, কতকগুলি বিষয় কিন্তু দক্ষিণের অনুকূল ছিল। প্রথমতঃ তাদের সংগ্রাম ছিল আত্মরক্ষামূলক, নিজেদের ঘরবাড়ী ও জনবলকে রক্ষা করাই ছিল তাদের মূল কাজ এবং রসদ সরবরাহের জন্য বিরাট কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না তাদের। সেখানকার জনসাধারণ শিকার প্রভৃতিতে সুদক্ষ থাকায় উত্তরের দোকানদার ও শ্রমিকশ্রেণী অপেক্ষা সৈন্য হিসেবে তারা ছিল উচ্চস্তরের।

তদুপরি দক্ষিণের অনেক অভিজাত ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্যে না গিয়ে সামরিক জীবন বরণ করে নেওয়ার সুবিধা হয়েছিল। ওয়েষ্ট পয়েণ্টের সামরিক বিদ্যালয় থেকে যে সব কৃতি সেনাপতি বেরিয়েছেন তাদের মধ্যে রবার্ট ই লী, টি. জে. (ষ্টোনওয়াল) জ্যাকসন প্রমুখ বরেণ্যরা ছিলেন দক্ষিণের লোক। এরা দক্ষিণের সৈন্যদল পরিচালনায় প্রচুর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আর সর্বোপরি জনসংখ্যা কম হলেও দক্ষিণীদের ছিল ক্রীতদাসের দল। প্রয়োজন-বোধে এদের অন্য কাজে লাগিয়ে সেখানকার শ্বেতাংগরা যুদ্ধে যোগ দিতে পারত।

গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্যায় অনুষ্ঠিত হয় দুটি প্রধান রণাংগণে—পূর্বাঞ্চলে ভার্জিনিয়ায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে মিসিসিপি নদী বরাবর। ভার্জিনিয়া ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবার পর ওয়াশিংটন থেকে মাত্র একশ মাইল দূরে রিচমণ্ডে কনরেডারেট রাষ্ট্রগুলির স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয়। "রিচমণ্ড চল" এই ধ্বনি তুলে উত্তরের তিরিশ হাজার সৈন্যের একটি দল ভার্জিনিয়ায় অভিযান শুরু করে দেয়। ১৮৬১ সালের ২১শে জুলাই বুলরানের রণাংগণে যে বিরাট যুদ্ধ হয় তাতে প্রায় সমসংখ্যক বিদ্রোহীরা ইউনিয়ন সৈন্যদের বাধা দিয়েছিল।

যুদ্ধের সূচনাতে দক্ষিণে এই অভিযানকে ইউনিয়ন পক্ষভুক্তরা যুদ্ধ হিসাবে আমলই দেন নি। কংগ্রেস সদস্যরা সপরিবারে চড়ুইভাতির মেজাজে খাবার দাবার নিয়ে সৈন্যদলের পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রবল সংগ্রামের ফলে এই চড়ুইভাতির আমেজ বিষম সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে, উত্তরাঞ্চলের সমূহ পরাজয় ঘটেছিল সে যুদ্ধে। যারা কোনরকমে নিস্তার পেয়েছিল পলায়মান কংগ্রেস সদস্যদের পিছু পিছু তারা হীনমনোবল হয়ে ফিরে এলো ওয়াশিংটনে।

দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে উত্তরাঞ্চল আরো সৈন্যের জন্য আহ্বান জানায়। প্রেসিডেণ্ট লিংকন তখন ওয়েষ্ট পয়েণ্টের অপর সৈনিক জর্জ বি ম্যাকক্লেকান-কে রিচমণ্ডে পুনরায় অভিযান চালাবার জন্য পটোম্যাক বাহিনীর সেনাপতি মনোনীত করেন। ম্যাকক্লেলানের সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল এবং সৈন্যরা তাঁকে শ্রদ্ধাও করত। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সাবধানী। ১৮৬২ সালের বসন্তকালে ম্যাকক্লেলান রিচমণ্ডের দক্ষিণ পূর্বে সমুদ্রপথে একলক্ষ সৈন্য নিয়ে অবতরণ করেন। কনফেডারেট রাজধানীর বাইরে লী এবং জ্যাকসন প্রায় অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ম্যাকক্লেলানকে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু

যুদ্ধে জয় যখন হাতের মুঠোয় এসে যায় সেই সময় ম্যাকক্লেলান ভয় পেয়ে ওয়াশিংটনে ফিরে চলে যান, ঘোষণা করেন যে বিদ্রোহীদলের সৈন্যসংখ্যা ছিল তাঁর দলের চেয়ে অনেক বেশি।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট লিংকন প্রধান সেনাপতির এই আচরণে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন। অপরদিকে ম্যাকক্লেলান অত্যন্ত উদ্ধত আচরণ করেন এবং প্রেসিডেন্টের সংগে খারাপ ব্যবহার করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন প্রবল ডেমোক্র্যাট মতাবলম্বী এবং সন্দেহ ছিল যে তিনি দক্ষিণাঞ্চলকে তুষ্ট রাখতে চান। লিংকন তখন সুযোগ্য লোক পাওয়ামাত্রই ম্যাকক্লেলান-কে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করলেন।

এর পর আবার লিংকন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিভিন্ন কূটনৈতিক জটিলতার ফলে। ব্রিটিশ সরকারের এবং সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ছিল দক্ষিণের প্রতি। তাদের সংগে দক্ষিণের ব্যবসাবাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনও ছিল। ইউনিয়ন যখন দক্ষিণের বন্দরগুলিকে অবরোধ করে তার ফলে ইংলণ্ডে তুলার চালান বন্ধ হয়ে যায়। একারণ ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আরো ক্রুদ্ধ হয়। এর পর একটি ব্রিটিশ ষ্টীমারের যাত্রী হয়ে দুজন কনফেডারেট প্রতিনিধি যখন ইংলণ্ড চলেছিলেন সেই সময় ইউনিয়নের একখানি যুদ্ধ জাহাজ ষ্টীমারটিকে আটকে প্রতিনিধি দুজনকে গ্রেপ্তার করে এবং বেষ্টনের কারাগারে নিক্ষেপ করে। এর ফলে এক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। ইংলণ্ড গভীর সমুদ্রে তাদের নৌচলাচলের অধিকারের উপর এই হস্তক্ষেপের' তীব্র প্রতিবাদ করে এবং যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার তখন বুঝতে পেরেছে যে কোন শক্তিশালী বৈদেশিক রাষ্ট্র শত্রুপক্ষর সংগে যোগ দিলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। লিংকন কনফেডারেট প্রতিনিধি দুজনকে মুক্তি দিয়ে ব্রিটেনের কাছে ত্রুটি স্বীকার করেন। তবুও এতে হয়তো ব্রিটেনের মনস্তুষ্টি হতো না। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে ব্রিটেনের শ্রমজীবী মানুষরা উত্তরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়েছিল।

সমুদ্রে উত্তরের আধিপত্য বজায় রইল। তবে একসময়ে পৃথিবীর প্রথম লোহারপাতে মোড়া জাহাজ মেরিম্যাক-কে চালু করে দক্ষিণাঞ্চল তাদের আধিপত্য প্রায় নষ্ট করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তখন মনিটর নামে অনুরূপ

একখানি জাহাজ সমুদ্রে পাঠান। এই জাহাজে চারদিকে ঘোরান যায় এমন কামান বসান ছিল। ইউনিয়নের আধিপত্য পুনরায় সমুদ্রে বিস্তৃত হয়। অতঃপর ইউনিয়ন এক নৌবহর পাঠিয়ে নিউ-অর্লিয়ন্স বন্দরটি দখল করে।

ইতিমধ্যে পশ্চিম রণাংগনে জেনারেল ইউলিমিস্ এম. গ্র্যাণ্ট ইউনিয়নের গান-বোটগুলির সহায়তায় মিসিসিপি নদী বরাবর কনফেডারেট অঞ্চলে ঢুকে পড়তে থাকেন। শিলো-তে প্রবল যুদ্ধের পর তিনি জয়ী হন। এর পর গ্র্যাণ্ট ডিক্সবার্গ দখল করে নেন। এরি ফলে মিনিসিপি নদীর পুরোটাই প্রায় ইউনিয়নের কর্তৃত্বে এসে পড়ে। ওয়েষ্ট পয়েণ্টে শিক্ষার পর গ্র্যাণ্টের সামরিক জীবন অত্যধিক মদ্যপানের জন্য প্রায় নষ্ট হতে বসেছিল। এইভাবেই তিনি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরে পরিণত হন।

পশ্চিম রণাংগনে গ্র্যাণ্ট যেমন সাফল্য লাভ করছিলেন তেমনি পূর্ব রণাংগনে ইউনিয়ন সৈন্যদল উপর্যুপরি ব্যর্থতা বরণ করতে থাকে। লিংকন তখন চাইছেন যে একটা বড়গোছের কোন জয়লাভ হোক। তাহলে তিনি একটি ইপ্সিত ঘোষণা প্রচার করতে পারেন। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। কারণ এই ঘোষণায় ইউনিয়নের মনোবল আরো বৃদ্ধি পাবে।

উত্তরের দাস প্রথা অবলুপ্তির সমর্থকরা আবেদন তুলেছিল যে এই গৃহযুদ্ধকে শুধুমাত্র ইউনিয়ন রক্ষার সংগ্রাম হিসাবে গণ্য না করে দক্ষিণের ক্রীতদাসদের মুক্তির সংগ্রাম হিসাবে গণ্য করা হোক। তাদের এই দাবী মেনে নেবার সময় সমুপস্থিত। ইতিপূর্বে লিংকনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইউনিয়নকে রক্ষা করব। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "একটি ক্রীতদাসকেও মুক্তি না দিয়ে আমি যদি ইউনিয়নকে রক্ষা করতে পারি তাহলে তাই করব; আর সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করে যদি ইউনিয়নকে রক্ষা করা সম্ভব হয় তাহলে আমি তাও করব।" কিন্তু ১৮৬২ সালে দেখা গেল যে সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করাই হবে ইউনিয়নের স্বার্থের অধিকতর অনুকূল। কারণ তাতে উত্তরের ঐক্য আরো বৃদ্ধি পাবে, বিশ্ববাসীর সহানুভূতি পাওয়া যাবে তাতে এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিদেশীরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশাও চিরতরে লুপ্ত হবে।

কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের সৈন্যরা যখন একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করছে

তখন এধরণের ঘোষণা করা বাতুলতামাত্র। একারণই লিংকন অ্যান্টিয়েটাম-এর যুদ্ধে জেনারেল ম্যাকক্লেলান দক্ষিণের এক বিরাট অভিযানকে প্রতিরোধ করা পর্যন্ত দাস মুক্তির ঘোষণা আর করতে পারেন নি। ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট মুক্তিঘোষণা প্রচার করলেন, ঘোষণা করলেন যে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলিতে অবস্থিত সমস্ত ক্রীতদাস "অতঃপর মুক্ত।"

কার্যতঃ এই মুক্তি ঘোষণা দিল ভবিষ্যত কার্যধারার এক প্রতিশ্রুতি মাত্র। কারণ দক্ষিণ তখনও পরাভূত হয় নি। তদুপরি এই ঘোষণা সংবিধান সম্মত ও নয়। যুদ্ধে জয়লাভের পর বিভিন্ন অংগরাষ্ট্র কর্তৃক ক্রীতদাস প্রথার অবসান সংক্রান্ত সাংবিধানিক সংশোধন পাশ করতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণার যে মহান উদ্দেশ্য যারফলে ৩৫ লক্ষ আমেরিকান দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে; সেটি লিংকনের প্রার্থিত উদ্দেশ্যকে সফল করল। এইভাবেই ইউনিয়ন অবতীর্ণ হয় এক মহান যুদ্ধে।

এই সমস্ত আনন্দ অনতিবিলম্বেই নষ্ট হয়ে যায় কারণ অ্যান্টিয়েটামের যুদ্ধের পর ম্যাকক্লেলান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে অসমর্থ হন। এরি ফলে প্রেসিডেন্ট লিংকন বিরক্ত হয়ে তাকে সেনাপতি পদ থেকে অপসারিত করেন এবং অধিকতর আক্রমণাত্মক মনোভাবসম্পন্ন সেনাপতির সন্ধানে লিপ্ত হন। ইউনিয়ন সৈন্যরা পুনরায় ভার্জিনিয়ায় অভিযান চালায়, কিন্তু ফ্রেডারিক্স বার্গ ও চ্যান্সেলারস্‌ ভিলে তারা পরাজিত হয়। দক্ষিণের জেনারেল লী সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন সৈন্যরা পেনসিলভ্যানিয়ার গ্যেটিসবার্গে এসে ঘাঁটি স্থাপন করে দাঁড়ায়।

উত্তরের তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, সমন এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে। আর একটিমাত্র ক্ষেত্রেই পরাজিত হলে যুদ্ধের অবসান ঘটবে, সুপ্রতিষ্ঠিত হবে দক্ষিণের স্বাধীনতা।

গ্যেটিসবার্গে লী-র নেতৃত্বে ৭৫ হাজার প্রবীণ সৈনিক জেনারেল জর্জ-মীড-এর নেতৃত্বাধীন ইউনিয়ন সৈন্যদলের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৩ সালের ১লা ও ২রা জুলাই ৯০ হাজার ইউনিয়ন সৈন্যের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে জেনারেল লী জয়ী হন এবং ইউনিয়ন সৈন্যরা আরো পশ্চাদ্‌ অপসরণে বাধ্য হয়। জেনারেল লী তখন যুদ্ধের নিষ্পত্তি করে ফেলতে চাইছেন।

তিনি ৩রা জুলাই ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে প্রচণ্ড হামলা চালাবার নির্দেশ দিলেন।

১৫ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে জেনারেল জর্জ পিকেট অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইউনিয়ন সৈন্যদের উপর। এই পদাতিকরাই ছিল দক্ষিণী-সৈন্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অপর পিকেট-এর এই অভিযান ইতিহাসে অতুলনীয়। সিমেট্রিরিজ-এ এই অভিযান চালাবার সময় কনফেডারেট সৈন্যরা ঝটিকা আক্রমণে নাস্তানাবুদ করে দিল প্রতিপক্ষকে। প্রতিপক্ষের গুলিগোলাকে অগ্রাহ্য করে তারা সেখানে আপন পতাকা উত্তোলন করতে সমর্থ হয়। এর পরই শুরু হয়ে যায় দুইদলের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ। নূতন সৈন্যের আগমনে ইউনিয়নপক্ষ তখন নিয়তই পুষ্ট হতে থাকছে। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণীরা প্রবল ক্ষতি স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ শুরু করে দেয়। ধীরে ধীরে তারা পাহাড থেকে নেমে যেতে থাকে। এই ভাবেই শেষ হয় গ্যেটিসবার্গ-এর যুদ্ধ এবং সংগে সংগে অবসান হয় দক্ষিণের আক্রমণের এক প্রবল আশংকার।

উত্তরাঞ্চল-এ প্রবল আনন্দোচ্ছাসের মধ্যে ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়, কারণ গ্যেটিসবার্গ-এ সাফল্য ছাড়াও পশ্চিম রণাংগনে আর এক বিরাট সাফল্যের সংবাদ এসেছে তাদের কাছে। জেনারেল গ্র্যাণ্ট-এর অবরোধের ফলে খাদ্যাভাবগ্রস্ত ভিক্সবার্গ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে, আর তারই ফলে সমগ্র মিসিসিপি এসেছে ইউনিয়নের দখলে। ওই নদীর পশ্চিমে অবস্থিত দক্ষিণের রাজ্যগুলির যোগাযোগ নষ্ট হয়েছে এবং গ্র্যাণ্টের পক্ষে এমন বিরাট সৈন্যদল পূর্বমুখে নিয়ে এসে সেখানকার রণাংগনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

যুদ্ধ আরো দু'বছর চলেছিল। কিন্তু গ্যেটিসবার্গের যুদ্ধেই গৃহযুদ্ধের মোড় ফিরে যায়। ১৮৬৩ সালের শরৎকালে এই যুদ্ধক্ষেত্রকে জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়। প্রেসিডেণ্ট লিংকন সেই উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। সমাধিক্ষেত্রটি উৎসর্গ করতে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট তার অবিস্মরণীয় বক্তৃতায় উত্তরাঞ্চলের পক্ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শহীদের আত্মত্যাগকে স্বার্থক করে তুলবেন। ঘোষণা করেছিলেন—"আমরা এখানে এই দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছি যে এদের মৃত্যু ব্যর্থ হবে না—ঈশ্বরের অনুগ্রহপুষ্ট এই জাতি এক নূতন স্বাধীনতা লাভ করবে—এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত জনগণের সেবাপরায়ণ, জনগণের এই সরকার বিশ্বে চিরস্থায়ী হবে।"

গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনী অত্যন্ত সহজ ও সরল। এই অংকে ইউনিয়ন সেনাদল অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে পরাজয় স্বীকারে অনিচ্ছুক শত্রুপক্ষকে পরাজয় বরণে বাধ্য করবার প্রয়াস পায়। যুক্তরাষ্ট্রপক্ষের সামরিক পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত সহজ। তারা ঠিক করেছিল পটোম্যাক বাহিনী ভার্জিনিয়ার মধ্য দিয়ে দক্ষিণদিকে রিচমণ্ড অবধি এগিয়ে যাবে আর একই সময়ে গ্র্যাণ্ট পশ্চিমদিক থেকে কনফেডারেট বাহিনীকে ঘিরে ফেলে পূর্ব টেনেসি ও জর্জিয়ায় তাদের উপর চরম আঘাত হানবেন।

লিংকন ঠিক যে ধরণের সেনাপতির সন্ধান করছিলেন গ্র্যাণ্ট ছিলেন ঠিক সেই ধরণেরই মারমুখো এবং দৃঢ়চেতা লোক। জনসংখ্যা এবং সাজসরঞ্জামের দিক দিয়ে উত্তরাঞ্চলের যে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ছিল গ্র্যাণ্ট তাকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। চ্যাট্টানুগাতে গ্র্যাণ্ট এক বিপুল জয়লাভ করবার পর লিংকন তাকে ইউনিয়ন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং এবার তিনি গ্র্যাণ্টকে পাঠালেন ভার্জিনিয়ায় অসম সাহসী লী-র সংগে শক্তি পরীক্ষা করতে। উইলিয়ম টি. সারম্যান এই যুদ্ধে ছিলেন গ্র্যাণ্টের সহযোগী। তিনি টেনেসিস্থ বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে জর্জিয়ার অ্যাটালাণ্টা অভিমুখে অগ্রসর হন।

১৮৬৪ সালে জেনারেল গ্র্যাণ্ট রিচমণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি বেশীদূর এগোতে পারেন নি এবং এই সময় তাঁর পক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হয়। লী উইল্ডারনেস, স্পটসিলভেনিয়া এবং কোল্ডহারবারে সাফল্যের সংগে গ্র্যাণ্টকে প্রতিরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ট দক্ষিণদিক দিয়ে ঘুরে রিচমণ্ডে উপনীত হবার চেষ্টা করলে লী তাঁকে পিটার্সবার্গে একেবারে আটকে ফেলেন। গ্র্যাণ্ট এতেও দমে যাননি এবং পশ্চাদপসরণও করেন নি। অপরদিকে বারংবার আঘাত খেয়ে লী-র সৈন্যদলও সংখ্যায় কমে আসতে থাকল।

ইতিমধ্যে উত্তরে ১৮৬৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রিপাব্লিকানরা পুনরায় লিংকনকে মনোনীত করেন এবং ডেমোক্র্যাটরা মনোনীত করেন প্রেসিডেন্টের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ও পূর্বতন প্রধান সেনাপতি জেনারেল জর্জ ম্যাকক্লেলানকে। এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোল যুদ্ধের প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্ন দাঁড়াল লিংকনের নীতি অনুযায়ী সবকিছু পণ করে এগিয়ে যাওয়া উচিত

অথবা ডেমোক্র্যাটদের মতানুযায়ী আপোষ আলোচনার মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটান উচিত কিনা। গ্র্যাণ্ট লী-কে পরাস্ত করতে না পারায় ফলাফল সম্পর্কে লিংকন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তিনি অনায়াসে পুনর্নিবাচিত হন।

এদিকে গৃহযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে এসেছে। জেনারেল সারম্যান একদা বলেছিলেন "যুদ্ধ হলো নারকীয় ঘটনা।" এবার তিনি সমগ্র জর্জিয়াকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তার সেই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে দিলেন। সারম্যান প্রচণ্ড প্রতাপে অ্যাটলাণ্টা পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর এগিয়ে চললেন ৩ শত মাইল দূরবর্তী স্যাভানা অভিমুখে। পথে কোন বাধা তিনি পান নি। সারম্যান যাবার পথে যা কিছু পড়ল সবই পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন, বিধ্বস্ত হল সমগ্র এলাকা। স্যাভানা থেকে উত্তর দিকে তিনি অগ্রসর হলেন নর্থ ও সাউথ ক্যারোলাইনার মধ্যদিয়ে। এবারও চলল তার সেই নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা। ক্যারোলাইনার মধ্যদিয়ে তিনি চললেন ভার্জিনিয়ায় গ্র্যাণ্টের সংগে যোগ দিতে। এই সময়ে রিচমণ্ডের চূড়ান্ত পতন ঘটে। জেনারেল লী যখন দেখতে পেলেন যে আর যুদ্ধ করা নিষ্ফল তখন তিনি ১৮৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল তার উত্তর ভার্জিনিয়া বাহিনীকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এই ভাবেই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটল।

চার বছরের এই দুর্যোগের ফলে আমেরিকায় প্রচুর তরুণের মৃত্যু ঘটে। সম্পত্তির বিনাশও হয় প্রচুর। ইউনিয়ন পক্ষে তিন লক্ষ ষাট হাজার জনের মৃত্যু হয় (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের লোকক্ষয়ের পরিমাণের প্রায় সমান)। দক্ষিণে শুধু লোকক্ষয়ই হয়নি সেখানে বাড়ীঘর গরু, ঘোড়াও যথেষ্ট নষ্ট হয়েছে এবং আরো নষ্ট হয়েছে সেখানকার পরিবহন ব্যবস্থা। দক্ষিণে যত ক্রীতদাস ছিল তাদের সর্বমোট মূল্য ছিল প্রায় ২০ কোটি ডলার। এদেরও বিনাক্ষতি-পূরণে মুক্তি দেওয়া হয়। কনফেডারেট পক্ষ থেকে যে টাকাপয়সা ও ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হয়েছিল, সেগুলিও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যতের সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হয়ে প্রেসিডেণ্ট লিংকন তাঁর দ্বিতীয় অভিষেক-বাণীতে ঘোষণা করলেন "কারো প্রতি বিদ্বেষ না নিয়ে, সকলের প্রতি সমান অনুকম্পার মনোভাব নিয়ে—আমাদের চেষ্টা করতে হবে অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার; জাতির সমস্ত ক্ষতকে নিরাময় করতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট পুনর্গঠনের সহজতম পন্থা অবলম্বনের পক্ষে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

উত্তরের বহু রিপাব্লিকান অবশ্য মনে করতেন যে বিজিত-পক্ষ হিসাবে দক্ষিণকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তারা আরো মনে করলেন যে ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাষ্ট্রগুলির অধিকার হারিয়েছে। লিংকন এতে সম্মত হন নি। প্রথম অভিষেক বাণীতে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন যে কোন অংগরাষ্ট্রের পক্ষে ইউনিয়ন ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেনি, অস্বীকার করেছে সেখানকার কিছু সংখ্যক লোক। যখনই এই সমস্ত রাজ্য পুনরায় এমন সমস্ত লোকের কর্তৃত্বে আসবে যারা সহযোগী হিসাবে ইউনিয়নে আবার আসতে চান তখনই তাদের সাদরে গ্রহণ করা হবে।

এই নীতি অনুসারে প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের সময়ই তার দশ শতাংশ পরিকল্পনা গঠন করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে যদি কোন দক্ষিণী রাজ্যের দশ শতাংশ ভোটার ইউনিয়নের প্রতি অনুগত সরকার গঠন করতে চান তাহলে তাদের ইউনিয়নে পুনরায় গ্রহণ করা হবে এবং কংগ্রেসেও প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হবে। এইভাবেই চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বেই টেনেসি, আরকানসাস, এবং লুইসিয়ানাকে ইউনিয়নে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। লিংকন আরো সুষ্ঠু মনোভাবের পরিচয় দিলেন যখন তিনি ১৮৬৪ সালের নির্বাচনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করলেন টেনেসির প্রাক্তন গভর্ণর এবং সেনেটর অ্যাণ্ড্রু জনসন-কে।

রিপাব্লিকান অধ্যুষিত কংগ্রেস এই ১০ শতাংশমূলক পরিকল্পনার বিরোধী ছিল। তাঁরা বললেন এইভাবে দক্ষিণকে পুনরায় ইউনিয়নে গ্রহণ করলে সেখানকার ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিরা উত্তরের সমধর্মীদের সংগে একযোগে চেষ্টা করে কি রিপাব্লিকানদের ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে পারবে না? তারা বললেন দক্ষিণকে পদানত রাখতে হবে এবং সেখানকার পুনর্গঠনের কাজ পরিচালনা করবে কংগ্রেস, প্রেসিডেন্ট নন। অতএব যে সব রাষ্ট্র কনফেডারেসি গঠন করেছিল তাদের শত্রু-অঞ্চল বলে কংগ্রেস গণ্য করান, পূর্ণাংগ সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে নয়। আর প্রেসিডেন্টও তাদের অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারবেন না।

প্রশাসনিক এবং সংবিধানিক শাখার এই নীতিগত সংগ্রামে লিংকন জয়ী হতে পারতেন কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব নয়। কারণ গৃহযুদ্ধের অবসানের মাত্র ৫ দিন পরে প্রেসিডেণ্ট সস্ত্রীক ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে অভিনয় দেখবার সময় জন উইল্কস বুথ নামক একজন অভিনেতা লিংকনের মাথায় গুলি করে এবং "অত্যাচারীর পতন হোক" চীৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়। বুথ-কে পরে একটি গোলাবাড়ীতে ঘেরাও করা হয়েছিল। সে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত হলে শেষ পর্যন্ত গুলী করে তাকে হত্যা করা হয়।

এই আঘাতের ফলে পরদিন সকালে প্রেসিডেণ্ট পরলোক গমন করেন এবং সমগ্র উত্তর বিষাদে মগ্ন হয়। তাদের বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও মহান নেতার তিরোধান ঘটেছে। দক্ষিণের লোকেরাও বুঝেছিল এই দুঃসময়ে লিংকন-ই ছিলেন তাঁদের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। তিনি তাঁদের সাহায্য করবার জন্য সবকিছুই করতেন। অতএব তারাও অত্যন্ত দুঃখিত হয়।

নূতন প্রেসিডেণ্ট অ্যাণ্ড্রু জনসনের নেতৃত্বে জাতি তখন কোনক্রমে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশ তখন এগিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিকা

গৃহযুদ্ধের অবসানের সংগে সংগেই আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম অংকের যবনিকাপাত ঘটে। এই সময়ে জাতির গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং গণতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও গড়ে ওঠে এই সময়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মধ্যভাগে আমেরিকার অর্থনীতিক ব্যবস্থা তখনও প্রধানতঃ ছিল কৃষিভিত্তিক এবং ব্যবসায় বাণিজ্য চলতো আঞ্চলিক ভিত্তিতে। এমন কি শিল্পমুখীন উত্তরাঞ্চলেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পশ্চিমের সুবিস্তৃত অঞ্চলে তখনও রয়েছে রেড ইণ্ডিয়ানদের বসবাস এবং ভাগ্যান্বেষীদের কাছে এই অঞ্চলের আকর্ষণ অপরিসীম হয়ে রইল।

১৮৬৫ সালের পর পটপরিবর্তন ঘটে। সুদূর অঞ্চলের দিকে বসবাস করবার জন্য বহু লোক এগিয়ে যেতে থাকে। পত্তন হয় বড়ো বড়ো শহরের। নূতন নূতন শিল্প গড়ে ওঠে। নূতন নূতন আবিষ্কার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির

ফলে শিল্পগুলির দ্রুত সমৃদ্ধি ও প্রসার হইতে থাকে। তৈলখনি থেকে লক্ষ লক্ষ পিপা তেল উৎপাদিত হতে থাকে এবং সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে মাকড়সার জালের মতো রেলপথ, দুই উপকূল সংযুক্ত হয় এভাবে। বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয় আলো জ্বালবার জন্য কলকারখানা চালাবার ব্যাপারে এবং বার্তা প্রেরণের বিষয়ে।

আমেরিকার বিপুল সম্পদ যখন এইভাবে কাজে লাগান হচ্ছিল তখন দেখা গেল একদল কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এবং ব্যবসায়ী সমাজে প্রচুর অর্থ রোজগার করে চলেছে। ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে। মালিকপক্ষ বলে যে আপন সম্পত্তি নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার তাদের আছে, অপরদিকে শ্রমিকপক্ষ দাবী করতে থাকল উন্নততর চাকরীর শর্ত এবং অধিকতর মজুরী। এই সময়ে ছোটখাট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা অত্যন্ত মুশকিলে পড়ে যায়। অবাধ স্বাধীন ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিপুল আকারের সংস্থাগুলির সংগে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তারা হিমশিম খায়।

১৯০০ সাল নাগাদ আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত আমেরিকার জনসংখ্যা হোল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ, ১৮৬৫ সালের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী। এক সময়ে মনে হোল এই বিরাট মহাদেশেও বুঝি তাদের স্থানাভাব ঘটবে ; এবং সাময়িকভাবে তার মনে অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তির ন্যায় সমুদ্র পেরিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্পৃহা জাগে।

* * * *

গৃহযুদ্ধে প্রচুর লোক ও সম্পত্তিক্ষয় হলেও আমেরিকার ধ্বংস হয়নি। অপরদিকে এই গৃহযুদ্ধের মধ্যেই আমেরিকা খুজে পেলো এক নূতন প্রাণশক্তি, উপলব্ধি করল তারা এক মহান জাতি। ফলে সার্থকতার দিকে এগিয়ে গেল দেশ।

সূত্রপাত হল আধুনিক যুগের।

সপ্তম অধ্যায়

॥ পুনর্গঠন এবং অবাধ উদ্‌যোগ ॥

১৮৬৫ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় যে দ্রুত পুনর্গঠন কার্য চলতে থাকে সেই সময়ে সেখানে বস্তুতান্ত্রিকতা, আদর্শবাদ এবং অশিষ্টতার এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল।

গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণের অ্যাণ্ড্রু জনসনের আকস্মিকভাবে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রাপ্তির ফলে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইউনিয়নের প্রতি অনুগত টেনেসির এই ভদ্রলোককে ভাগ্যের পরিহাসে উত্তর বা দক্ষিণ কোন পক্ষই ভালো চোখে দেখেনি। জনসন লেখাপড়া শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়, তিনি ছিলেন সৎ, কিন্তু কূটবুদ্ধি ছিল না। আর দেশের নেতৃত্বেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। দক্ষিণের দরিদ্র শ্বেতাংগ পরিবারের সন্তান তিনি।

জনসনের কার্যকালে দুটি গুরুতর ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তার সম্পর্কে যে সমস্ত তিক্ত সমালোচনা হয় এ ঘটনা দুটিকে তার কারণ বলা চলে না। প্রথমতঃ পররাষ্ট্র সচিব সিউয়ার্ড কিঞ্চিদধিক ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যে রাশিয়ার জারের কাছ থেকে অ্যালাস্কা ক্রয় করেন। এই কাজের জন্য অবশ্য বর্তমান কালের আমেরিকানদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার

মেক্সিকো থেকে ফরাসীদের চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে মনরো নীতি প্রয়োগ করে। কারণ ফরাসীরা তখন চেষ্টা করছিল হতভাগ্য সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ন-এর নেতৃত্বে একটি তাঁবেদার সাম্রাজ্য গঠন করবার।

লিংকনের পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পনা জনসন কার্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করলে কংগ্রেস থেকে প্রবল বাধা আসে। দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির নবগঠিত সরকারগুলির যে সমস্ত প্রতিনিধি ওয়াশিংটনে এসেছিলেন কংগ্রেস তাদের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃত হলো, কারণ তারা কনফেডারেসিতে বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ কারণ কংগ্রেস তাদের "দেশদ্রোহী" আখ্যা দিল। এ ছাড়া এই সমস্ত নবগঠিত সরকার নিগ্রোদের পূর্ণ স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বিভিন্ন আইন পাশ করে। এই আইনগুলিতে "এ্যাপ্রেন্টিস" প্রথার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রথা আবার দেশকে দাসত্বের পথে এগিয়ে নিতে চলেছিল। জনসনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলে এই সমস্ত ব্যবস্থা অনুধাবন করবার জন্য কংগ্রেস পনর জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। স্থির হলো কমিটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে সেই সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে।

১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনটি অনুমোদিত হয়ে যায়। কয়েকটি দক্ষিণী রাষ্ট্রও এই অনুমোদন দিয়েছিল। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র ও অধিকৃত অঞ্চলসমূহে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ করা। সরকারীভাবে নিগ্রোরা দাসত্বপ্রথা থেকে মুক্তি পেলেও তারা কিন্তু তখনও পূর্ণাংগ প্রজাধিকার পেলো না, কিংবা ভোটের অধিকারও তখন তাদের নেই।

সংবিধানের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীতে এই সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়। এই সংশোধন দুটির মাধ্যমে পূর্বতন ক্রীতদাসরা অন্যান্যদের সংগে সমান অধিকার পেলো। আবার সেই সংগেই এই সংশোধনীগুলির মাধ্যমে "বিদ্রোহে লিপ্ত" কনফেডারেসির বহুসংখ্যক নেতার ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। চতুর্দশ সংশোধনীটি অনুমোদনের জন্য দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির কাছে পাঠানো হলে একমাত্র টেনেসি-ই সেটি অনুমোদন করে, অপর সকলেই সেটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতঃপর এই সংশোধনীতে তাদের সম্মত হতে বাধ্য করার জন্য কংগ্রেস ১৮৬৭ সালে পুনর্গঠন আইন

নামক সুকঠোর বিধানটি পাশ করে। এই আইনে টেনেসি ছাড়া অপর কনফেডারেট রাষ্ট্রগুলিকে ৫টি সামরিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি এলাকার কর্তৃত্ব দেওয়া হয় ইউনিয়নের একজন করে মেজর জেনারেলের হাতে। শৃংখলা রক্ষার জন্য এর অধীনে প্রচুর সংখ্যক সৈন্যও রাখা হলো। আইনে আরো বিধান হলো নিগ্রোরাও শ্বেতাংগদের সংগে এক যোগে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সরকার গঠন করবে এবং চতুর্দশ সংশোধনটি অনুমোদন করবার পরই শুধুমাত্র তারা ইউনিয়নে প্রবেশাধিকার পাবে।

এই বিধান অনুযায়ী যে নূতন সরকার গঠিত হলো তাতে বাগিচামালিক এবং বৃত্তিজীবীশ্রেণী বাদ পড়ে যায়। রাষ্ট্রের আইনসভাগুলিতে প্রধানতঃ নিগ্রো এবং জংগলের কাছাকাছি অঞ্চলের কৃষকরা সদস্য হয়ে আসে। এদের কেউ-ই বিশেষ লেখাপড়া জানতো না। এই সমস্ত লোকরা সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করলেও দেখা যেতো প্রায়ই তারা ক্ষমতালাভের পরে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের পরিচয় দিয়েছে। অর্থনীতি সম্পর্কে এদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সামান্য। ফলে দেখা যায় এরা জনউন্নয়ন, বেতন এবং ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে বসেছে।

সরকারী অর্থের এই অপচয়ের ফলে দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকেই কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন, রাজনীতিক ও অর্থগৃধ্নুদের দলের আমদানী হতে লাগল ওই সমস্ত অঞ্চলে। এই সমস্ত লোকেরা দেখতে পেলো যে এই সমস্ত নির্বোধ আইন-প্রণেতাদের অর্থ-বরাদ্দ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে তারা সেখান থেকে বহু পয়সা কামাতে পারবে। উত্তর অঞ্চল থেকে যারা এই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে এলো তাদের বলা হতো "কার্পেট ব্যাগারস" (চটের থলিওয়ালা)। কারণ এরা নাকি তাদের যাবতীয় সামগ্রী একটা চটের থলিতে বোঝাই করে খুব তাড়াতাড়ি এসে হাজির হয়েছিল এই সস্তা অর্থ রোজগার করতে। আবার নীতির বালাই নেই এমন দক্ষিণীরাও এই কাজে লেগে গেলো।

তবে একথা বলা যায় না দক্ষিণে নিগ্রোদের মুক্তির যে আন্দোলন তার সংগে যুক্ত প্রত্যেকটি লোকই ছিল বদ-প্রকৃতির। বহু সংখ্যক শিক্ষক মুক্ত ক্রীতদাসদের শিক্ষিত করে তোলবার ব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

তাদের মার্কিন নাগরিকের মহান দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তৈরী করবার ভার গ্রহণ করেছিলেন তারা। এদিকে কংগ্রেস থেকে ফ্রিডমেনস্ ব্যুরো নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থাটি নিগ্রোদের বাড়ী তৈরী করে দেওয়া, তাদের চাকুরী করে দেওয়া, এক কথায় তাদের স্বাধীন জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে দেবার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করেছিল।

১৮৭০ সালের মধ্যে সব-কটি দক্ষিণীরাষ্ট্রই আবার ইউনিয়নে ফিরে আসে। তবে তখনো সেখানে সৈন্য মোতায়েন ছিল এবং তিক্ততাও ছিল খুব বেশী। ইতিমধ্যে দক্ষিণীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে নিগ্রোদের প্রভাব দূর করবার এবং নির্বাচনের সময় তাদের ভোট না দিতে দেবার এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করে ফেলে। কু ক্লুক্স ক্ল্যান নামে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ছিল সেখানে। শ্বেতাংগদের আধিপত্য রক্ষার জন্য ব্যগ্র দক্ষিণীরা এই সংস্থাটির মাধ্যমে বহু প্রাক্তন ক্রীতদাসকে হত্যা করে এবং অকথ্য অত্যাচার করে তাদের ওপর। এর ফলে নিগ্রোরা সরকারী কাজের ব্যাপারে অংশ গ্রহণে ভীত হয়ে পড়ে। অর্থগৃধ্নু যে সব উত্তরের লোক এসেছিল এবং তাদের সমগোত্রীয় দক্ষিণীদের একইভাবে জব্দ করে দেওয়া হলো। এরপর বেশ কিছুকাল যাবৎ দক্ষিণাঞ্চল একযোগে ডেমোক্রেটিক দলের আনুকূল্য করে এসেছে নির্বাচনে এবং তারই মধ্য দিয়ে উত্তরের পুনর্গঠন নীতিতে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

অপরদিকে কংগ্রেসের "চরমপন্থী" রিপাব্লিকানরা তাদের দক্ষিণী পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় রদ-বদলের চেষ্টা করবার জন্য প্রেসিডেণ্ট জনসনের উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে পড়ে এবং প্রেসিডেণ্টকে অভিযুক্ত করবার প্রয়াস পায়। এর পূর্বে অথবা পরে কখনোই কোন প্রেসিডেণ্টকে "গুরুতর দুর্ব্যবহার ও অনাচারের" অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রেসিডেণ্টকে বেকায়দায় ফেলবার জন্য কংগ্রেস মন্ত্রণাসভার সদস্যদের বরখাস্ত করবার জন্য তার যে ক্ষমতা সেটা বাতিল করে দেয়। কারণ তারা জানতে পেরেছিল যে যুদ্ধসচিব ষ্ট্যান্টনকে প্রেসিডেণ্ট শত্রু মনে করেন এবং তাকে সরিয়ে দিতে চান। যাই হোক জনসন ষ্ট্যান্টনকে বরখাস্ত করেন এবং সেনেটে বিচারের সম্মুখীন হন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চেজ্। প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্ত করবার

জন্য সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন দরকার। কিন্তু একটিমাত্র ভোটের জন্য তা সম্ভব হয়নি। অতএব লিংকনের পরিকল্পনার সূত্র ধরে একটি উদারনীতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসরণে আকাঙ্ক্ষী জনসন শেষ পযন্ত সহযোগীদের ঘৃনার মধ্যে কার্যকাল পূর্ণ করেন।

নিগ্রোদের সম্পর্কে এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে রিপাব্লিকানদের আচরণের পিছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বহুলোক আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে সকলের স্বাধীনতার পীঠস্থান এই জাতিতে দাসত্ব প্রথা এবং বর্ণবৈষম্য থাকা উচিত নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এই সমস্ত লোক এই বিষয় দুটিকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। অতএব এরা প্রাক্তন ক্রীতদাসদের নাগরিকের পূর্ণ অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, তার জন্যে যতই বাধা-বিপত্তি অথবা সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হোক না কেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক। নিগ্রোদের ভোটের অধিকার পাবার অর্থ হলো সেই সব ভোটগুলি পাবে রিপাব্লিকানরা এবং উত্তর ও দক্ষিণে তাদের আধিপত্য বজায় থাকবে। রিপাব্লিকান পার্টি ইতিমধ্যেই উত্তরের শিল্পপতিদেরও প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর দাসপ্রথার বিরোধী সংস্কারবাদীরা দলে তো রয়েছেই। যুদ্ধ চালাবার সময় থেকেই এই দলটির সংগে শিল্প ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয় এবং এই নূতন পুঁজিবাদী ও শিল্পোদ্যোগীরা চাইছিলেন যাতে রিপাব্লিকানরা এই ক্ষমতায় আসীন থাকেন। কারণ ডেমোক্র্যাটরা মূলতঃ ছিলেন কৃষিবাদী।

পরবর্তী ষোল বছর রিপাব্লিকানরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। উত্তরাঞ্চলের পক্ষে গৃহযুদ্ধের সমরনায়ক জেনারেল গ্র্যাণ্ট দুই দফায় এই দলের পক্ষে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং তারপর নির্বাচিত হন রাদারফোর্ড বি. হেজ ও জেমস এ. গারফিল্ড। গারফিল্ড নিহত হলে চেষ্টার এ. আর্থার প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করেন।

* * * *

এই সময়ে শিল্পের বিপুল প্রসার ঘটে। বিশেষ করে প্রসার ঘটে তৈলশিল্প, ইস্পাতশিল্প এবং রেলপথের। কর্পোরেশনগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং ফলে অনেকগুলির অস্তিত্ব লোপ পায়। এই প্রতিযোগিতায় অধিকতর শক্তিশালী সংস্থাগুলি দুর্বল সংস্থাগুলিকে

কুক্ষিগত করে এবং পত্তন হয় ট্রাষ্ট নামক অতিকায় একচেটিয়া ব্যবসার। কর্পোরেশনগুলি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রী করে মূলধন সংগ্রহ করতে এর ফলে জনগণ এই ব্যবসায়ের লাভের একটা সামান্য অংশ পেতো। কিন্তু ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতেন ডিরেক্টররা। এদের মধ্যেও অনেকে সততার সংগে ব্যবসায় চালাতেন এবং জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, আবার অনেকে ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে জেনারেল গ্র্যাণ্ট-এর সার্থকতা শুধুমাত্র সাময়িক বিষয়েই। বৈষয়িক কার্য অথবা রাজনীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিতান্তই অজ্ঞ এবং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সৎ প্রকৃতির লোক। তবুও নিজের অজান্তেই তিনি অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিগণ, অসাধু রাজনীতিকের দল এবং পুঁজিপতিদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পডলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ উল্লিখিত ব্যক্তিরা আপন আপন স্বার্থে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও কংগ্রেস সদস্যদের উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করতো।

পশ্চিমাঞ্চলের রেল রোড কোম্পানীগুলি বিশেষ সুবিধা পেয়ে গেলো। কংগ্রেস তাদের বহু অর্থ সাহায্য দেয় এবং অনেক ভূমিস্বত্বও পেয়ে যায় তারা। একবার তারা এইভাবে রেলপথের সংলগ্ন চার কোটি সত্তর লক্ষ একর জমির স্বত্ব পেয়েছিল। এই কোম্পানীগুলি এখন সেই জমি বসতিকারীদের কাছে বিক্রী করে অথবা লীজ দেয়, সেখানে শহরের পত্তন করে ও বাড়ীঘর তৈরী করে (এর জন্য অবশ্য তারা মূল্য নিয়েছিল)। এইভাবেই মাল ও যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ব্যবসা ফেঁপে ওঠে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো জেম্‌স্ জে. হিল এবং ঈ. এইচ. হ্যারিম্যান প্রমুখ রেল-কোম্পানীর কর্তারা এই সমস্ত জমিতে নিজস্ব খামার স্থাপন করে; খনির কাজ শুরু করে দেয় এবং শিল্প চালু করে। এইভাবেই তারা বিপুল অর্থ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব পশ্চিমী অঞ্চলের রাজ্যগুলির গভর্নরদের চেয়েও বেশী হয়ে পড়ে।

১৮৬৯ সালে সর্বপ্রথম এই মহাদেশ একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে রেলপথে যুক্ত হয়। এই সময় ইউটার অকডেন-এ ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানী ওমাহা থেকে লাইন টেনে আনে এবং সেণ্ট্রাল প্যাসিফিক কোম্পানী

পূর্বপ্রান্তে সাক্রামেণ্টো পর্যন্ত রেলপথ টেনে নিয়ে যায়। এই যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার ফলে রেলপথে নিউ-ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিস্কো পর্যন্ত মাল ও যাত্রী চলাচল সম্ভব হয়েছিল। মহাদেশের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত রেলপথের এই বিস্তৃতি এক বিরাট সাফল্য। কারণ মরুভূমি, পাহাড় পর্বত, শত্রুভাবাপন্ন রেডইণ্ডিয়ান অঞ্চল, এমন কি শত শত মাইলের মধ্যে বসতি নেই এইরকম এলাকার ভিতর দিয়ে তাদের লাইন পাততে হয়।

এই বিরাট কার্য সম্পাদিত হলেও এর ফলে এক কুৎসার সৃষ্টি হয়। এই রেলপথ যাঁরা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা ক্রেডিট মোবাইলার নামক একটি কোম্পানী স্থাপন করে এবং সাধারণ অংশীদারদের ফাঁকি দিয়ে নিজেরা অস্বাভাবিক রকমের মুনাফা পকেটস্থ করেছিল। কংগ্রেস এ বিষয়ে তদন্ত করবে এরূপ আশংকা করে তারা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট স্কুইলার কোলফ্যাক্স এবং নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস সদস্যদের কোম্পানীর শেয়ার দিয়ে হাত করে। এই ঘুষ দেওয়ার কথা প্রচার হয়ে পড়লে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের সুনাম নষ্ট হয়ে যায় এবং সাধু ব্যক্তিরা সরকারের মধ্যে দুর্নীতির সন্ধান পেয়ে শংকিত হয়ে পড়েন।

গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালের কতিপয় বড়ো বড়ো শিল্পপতির কার্যকলাপের মধ্যে প্রবল কর্মক্ষমতা এবং নিষ্ঠুরতারও প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অসাধু ছিলেন না। স্কটিশ বংশোদ্ভূত অ্যাণ্ড্রু কার্নেগি ব্যাপক হারে ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগিতা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সংগে অর্থলগ্নী করে কার্নেগি মূলধন সঞ্চয় করেছিলেন। এবার তিনি পিট্‌স্‌বার্গে একটি কারখানা খোলেন। এখানে কারখানা খোলবার উদ্দেশ্য হলো যে ওই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ কয়লা উৎপাদিত হতো এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কয়লার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই শিল্পের জন্য কার্নেগির নিজস্ব জাহাজগুলি থেকে সুপিরিয়রের পশ্চিম প্রান্তে মেসাবি হতে খনিজ লৌহ নিয়ে আসত। এইভাবে উৎপাদিত ইস্পাত দেশের খরিদ্দারদের কাছে রেলপথে বাহিত হয়ে পৌঁছাতে থাকে। একদিকে বিপুল পরিমাণ ইস্পাতের সরবরাহ এবং তদুপরি সংশ্লিষ্ট রেলকোম্পানীগুলি হয় কার্নেগির মালিকানাভুক্ত কিংবা তার প্রভাবাধীন। ফলে অন্যান্য শিল্পপতিরা তাঁর কম দামের সংগে এঁটে উঠতে পারলেন না। ১৯০১ সালে কার্নেগি ব্যবসায়ে তার স্বত্ব বিক্রী করে

দেন এবং ইউনাইটেড স্টেটস্ স্টীল কর্পোরেশন নামে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এর মূলধন ছিল প্রায় ১৫০ কোটি ডলার। একশ বছর পূর্বে সমগ্র জাতীয় সম্পত্তির মূল্য এতো ছিল না। কার্ণেগি 'ইস্পাত শিল্পের রাজা' আখ্যা পেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ওহায়োর ক্লীভল্যাণ্ডের জন ডি. রকফেলার নামক অপর এক উৎসাহী ব্যক্তি তৈলের ব্যবসায়ের বিরাট সুযোগ দেখতে পান। ১৮৫৯ সালে পেনসিলভানিয়ায় প্রথম তৈলকূপ খনন হবার সংগে এই ব্যবসায় শুরু হয়েছিল। রকফেলার ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। অল্পকালের মধ্যেই তিনি অন্যান্য প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে আসেন। এইবার তিনি প্রচণ্ড এক আঘাত হানলেন। রেল-কোম্পানীগুলিকে তিনি বললেন যে তাঁর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর তেল বহনের জন্য অপরদের কাছ থেকে যা ভাড়া নেওয়া হয় তার চেয়ে কম ভাড়া নিতে হবে। অন্যথায় তিনি তাদের মারফত মাল পাঠাবেন না। রেল কোম্পানীগুলি তাঁকে নিয়মিত ভাড়ার উপরে রিবেট দিতে স্বীকৃত হল। অন্যান্য তৈলশিল্প মালিকরা প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু ৩৩ বৎসর বয়স্ক রকফেলার তখন তাদের কোণঠাসা করে সমগ্র পরিবহন ব্যবস্থা নিজের মুঠোয় এনে ফেলেছেন। এর ফলে অন্য ব্যবসায়ীরা তার কাছে সবকিছু বেচে দিতে বাধ্য হয়। রকফেলারের ব্যবসা আরও ফেঁপে ওঠে।

অন্যান্য শিল্পতেও শিল্পপতিরা একই ধরণের পন্থা অবলম্বন করে, এবং সর্বত্রই বড়ো বড়ো কম্বাইন (ব্যবসায়িক সমাবেশ) গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। রেলপথে রেফ্রিজারেটর কার-এর উদ্‌ভাবনের ফলে মাংসের ব্যবসায়ে অনেক সুবিধা হয়। গুস্তাভাস্ সুইফট্ এবং পি. ডি. আরমার প্রধানতঃ এই ব্যবসায় নিজেদের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। তামাক, চিনি, হুইস্কি, রবার এবং তামার ব্যবসায়েও বড়ো বড়ো ট্রাষ্ট গঠিত হয়। অর্থলগ্নীর ক্ষেত্রেও নিউইয়র্কে ওয়াল ষ্ট্রীটস্থ জে. পি. মর্গানের ব্যাংকের নেতৃত্বে একটি ট্রাষ্ট গঠিত হয়েছিল। এরা অন্যান্য ট্রাষ্টগুলিকে মূলধন সরবরাহ করত।

এইভাবে ব্যবসায়ীরা প্রচুর অর্থ রোজগার করতে থাকলেন। আবিষ্কারকরা এই সময় অনেক পণ্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন এবং তার ফলে তাদেরও বেশ রোজগার হচ্ছে। বাষ্পীয় পোত, রেল ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফ এবং ফসল কাটা যন্ত্র শতাব্দীর গোড়ার দিকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে আলেকজাণ্ডার

গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। আর ইলেকট্রিক লাইট ও বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র আবিষ্কার করে কার্যে নিযুক্ত করেন টমাস এলভা এডিসন ১৮৮২ সালে। বাতি জ্বালানো, যন্ত্র চালানো, এবং টেলিফোন যোগাযোগ প্রভৃতিতে বিদ্যুৎশক্তির এই নতুন ব্যবহারের ফলে দেশে আরো বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতির জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে উন্নত হয়ে ওঠে।

আমেরিকার জনসাধারণের উপর শিল্পক্ষেত্রের এই বিপ্লবের সুদূর-প্রসারী ফলাফল দেখা দেয়। শিল্পপতিদের অনেকেই অর্থপুষ্ট হলেও তাদের দূরদৃষ্টি ছিল এবং তারা ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন। ফলে বাজার নূতন নূতন পণ্যে ছেয়ে যায়। এখন আর গ্রামের লোকেরাও তাদের নিজেদের জামাকাপড় প্রভৃতি তৈরী করে না। সমস্ত রকমের ব্যবহারিক পণ্য তারা অল্প সময়ের মধ্যেই রেলপথের কল্যাণে পেয়ে যেতে পারে। ব্যাপক হারে উৎপাদনের যুগের শুরু হয় এই সময়।

শিল্পে যেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকল তেমনি-ই দেশে শ্রমিকের যোগান হতে থাকল সমান হারে। ফলে এই সমৃদ্ধি চলতে থাকবে বলেই মনে হলো। কিন্তু জ্যাকসনের আমলে যেমন হয়েছিল দেশে তখন ব্যবসায় প্রসারের জন্য ফাটকা-বাজী শুরু হয়ে গিয়েছে। রেল কোম্পানীগুলি মার্কিন ও বিদেশীদের কাছ থেকে বহু অর্থ ঋণ করেছে, এবং তাদের চমকপ্রদ পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করবার জন্য আরো ঋণের প্রয়োজন। ব্যাংক মালিকরা এই সময় দুর্যোগ আশংকা করে অধিক ঋণ দিতে অস্বীকৃত হলেন এবং ফলে ১৮৭৩ সালে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ে, শুরু হয় মন্দার দুর্বৎসরগুলি। পরবর্তী পাঁচ বৎসর প্রবল মন্দা চলতে থাকে, বেকারত্বও বেড়ে যায় ভীষণভাবে। এর পরবর্তী দশকে আবার দেশের সমৃদ্ধি হলেও বছর দশেক পর পুনরায় বিরাট বৈষয়িক দুর্যোগ দেখা দেয়।

* * *

প্রেসিডেন্ট গ্র্যান্ট দ্বিতীয় দফায় কার্যভার গ্রহণ করবার মুখেই ১৮৭৩ সালের বিরাট অর্থনৈতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছিল। প্রথম বারের কার্যকালে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি রোধ করতে না পারার ফলে তাঁর দলের অনেক সদস্য বিরোধী-পক্ষের সংগে যোগ দেয়। এই লিবারেল রিপাব্লিকানদের সংগে এসে যোগ দিয়েছিল ডেমোক্র্যাটদের বিরাট একটি উপদল। তারা

নিউইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক হোরেস গ্রীলী-কে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী নির্বাচিত করে। সংস্কার সাধনের নীতি ঘোষণা করেছিল এই দলটি। কিন্তু গ্রীলী জনমানসে রেখাপাত করতে পারেননি এবং গ্রাণ্ট অনায়াসেই পুনর্নির্বাচিত হন।

নানারকম কেলেংকারীর সংবাদের সংগে এসে যুক্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক ছুর্যোগ। এর ফলে ১৮৭৬ সালের নির্বাচনে রিপাব্লিকানরা পরাজিত হবার মতো অবস্থায় পড়ে। জনসাধারণ তখন অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির লোককে প্রেসিডেন্ট পদে চাইছে। রিপাব্লিকানরা তখন ওহায়োর গভর্নর জেনারেল রাদার ফোর্ড বি. হেজ-কে প্রার্থী মনোনীত করেন। অপরদিকে ডেমোক্র্যাটরাও অনুরূপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নিউ-ইয়র্কের গভর্নর স্যামুয়েল টিলডেন-কে প্রার্থী মনোনীত করেছিল। সংস্কারক হিসাবে আপন রাজ্যে টিলডেন প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে নির্বাচিত হলে সমস্ত দেশকে ছুর্নীতির জঞ্জাল থেকে মুক্ত করবেন।

এই নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অনুষ্ঠিত হয় ভোট গ্রহণের পর। টিলডেন প্রতিপক্ষ অপেক্ষা আড়াই লক্ষ ভোট বেশী পেয়েছিলেন এবং ইলেক্টোরাল ভোটও তিনি বেশী পান। তবে সাউথ ক্যারোলাইনা, ফ্লোরিডা এবং লুইনিয়ানা এই তিনটি দক্ষিণী রাষ্ট্র থেকে সেখানকার অর্থগৃধ্নুদের দ্বারা গঠিত সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নির্বাচনের তুইরকম ফলাফল প্রেরিত হয়। হেজ দাবী জানালেন যে তিনিই ওই রাজ্য তিনটিতে বেশী ভোট পেয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবী সাব্যস্তও হয়। প্রেসিডেণ্টের অভিষেক দিবসের একদিন পূর্বে মাত্র তিনি জয়ী ঘোষিত হন। এই সময়ে মনে হয়েছিল যে গ্রাণ্টের কার্যকাল শেষ হবার পর দেশে হয়তো আর প্রেসিডেণ্টই থাকবেন না।

ইতিহাসকাররা বলেছেন যে, দেশের ইতিহাসে হেজ-এর শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত সততা ও নিরপেক্ষতার সংগে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাঁর আমলে সে সুখ্যাতি পান নি। প্রথম থেকেই প্রেসিডেণ্ট নিজের দলেই বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন, তার কারণ তিনি দক্ষিণাঞ্চল থেকে অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় সৈন্যদলকে সরিয়ে আনেন এবং ফলে সেই রাজ্যগুলি ডেমোক্র্যাটদের দলে চলে যায়। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরিয়াদের কার্যকলাপকে ছুর্নীতিমুক্ত করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এই সব ছুর্নীতিপরায়ণ

রাজনীতিকরা নির্বাচনের দিন ভোট দিয়ে চাকুরী লাভ করেছিলেন। রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিষয় ছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে। দেখা গেল একদল অত্যন্ত অর্থলোলুপ লোক সেখানে বসে অসহায় রেড-ইণ্ডিয়ানদের ঠকিয়ে তাদের জমি ও সমস্ত সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। প্রেসিডেণ্ট এই দপ্তরটিকে দুর্নীতিমুক্ত করেন। কিন্তু এর ফলে পার্টি তাঁর উপর বিরূপ হয় এবং দ্বিতীয়বার তিনি আর প্রার্থী মনোনীত হন নি।

যাই হোক না কেন, এই সংস্কার আন্দোলন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৮০ সালে রিপাব্লিকানদলের সম্মেলনে দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়। একদল চেয়েছিল গ্রাণ্টের আমলে ফিরে যেতে যাতে তাদের অর্থলোলুপতা সিদ্ধিলাভ করতে পারে। আর অপর দল ছিল সরকারী দপ্তরকে জঞ্জালমুক্ত করার পক্ষে। অবশেষে শেষ পর্যন্ত শেষোক্ত দলটি জয়ী হয় এবং জেনারেল জেমস্ এ গারফিল্ড প্রেসিডেণ্ট পদে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন লাভ করেন। তিনি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী জেনারেল উইনফিল্ড হ্যানকককে পরাজিত করেন।

কার্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই গারফিল্ড নিহত হন। চাকুরীলাভে ব্যর্থ হয়ে হতাশ এক ব্যক্তি প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করে। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট চেষ্টার এ. আর্থার শূন্যস্থান পূরণ করেন। আর্থার প্রথমোক্ত উপদলের সমর্থক হলেও তিনি চমৎকারভাবে দেশ শাসন করেছিলেন, এবং যোগ্যতার বিচারে সরকারী কার্যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতেন। প্রেসিডেণ্ট হেজ-এর মতো তিনিও পার্টির নেতাদের বিরাগভাজন হন এবং দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পান নি।

১৮৮৪ সালের নির্বাচনে রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী হয়েছিলেন জেমস জি, ব্লেইন। তিনি ছিলেন প্রতিনিধি সভার প্রাক্তন স্পীকার এবং পররাষ্ট্র সচিব। ব্লেইন-এর অদ্ভুত কর্মক্ষমতা ছিল, কিন্তু গ্র্যাণ্টের শাসনকালের কয়েকটি বিশ্রী কার্যকলাপের সংগে তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে রিপাব্লিকান দল তাকে প্রার্থী মনোনীত করতে প্রথমে একটু শংকিত ছিল। ব্লেইন-এর বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাট দল প্রার্থী নির্বাচন করেছিল নিউ-ইয়র্কের গভর্নর গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ডকে। ন্যায়নিষ্ঠ এবং অকুতোভয় শাসনকর্তা হিসাবে ক্লীভল্যাণ্ডের যথেষ্ট সুনাম ছিল।

এবারের নির্বাচনেও রিপাব্লিকান পার্টির প্রগতিপন্থীদল দলীয় প্রার্থীর

বিরুদ্ধাচরণ করল এবং ডেমোক্র্যাটদের সংগে মিলামিশা করবার চেষ্টা করতে থাকে। এই দল ক্লীভল্যাণ্ডকে সমর্থন করার ফলে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। গৃহযুদ্ধের পরে এই প্রথম ডেমোক্র্যাটপ্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। সামান্য ভোটের ব্যবধানে ক্লীভল্যাণ্ড জয়ী হয়েছিলেন। এই জয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, ব্লেইন-এর সমর্থক একজন পাদ্রী রিপাব্লিকান দলের সম্পর্কে একটি কুৎসিৎ মন্তব্য করেছিলেন, ফলে ক্যাথলিক সম্প্রদায় উত্তেজিত হয়ে ব্লেইন-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় এবং ব্লেইন তার যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে অসমর্থ হন।

* * *

ক্লীভল্যাণ্ডের শাসনকালে এবং পরবর্তী সময়ে আমেরিকার "বিপুল ব্যবসায়" সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলতে থাকে, বৈষয়িক উন্নতির পথে দেশকে তারা এগিয়ে নিয়ে যায়, বিনিময়ে বিপুল মুনাফা করেছিল তারা। এই সময়ে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা প্রচুর রোজগার করে নেয় এবং দেশ সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করে। এইভাবে আমেরিকা আধুনিক কালের বিরাট শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির ফল হিসাবে পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছিল এক প্রচণ্ড মন্দা। ১৮৭০ এবং ১৮৮০ দশকে আমেরিকার বিপুল ব্যবসায় দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল। তার অগ্রগতি রোধ করবার ক্ষমতা কারো ছিল না, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই সমৃদ্ধির আনুকূল্য করেছিল বটে, কিন্তু তারও তখন ক্ষমতা ছিল না একে রোধ করবার। কিন্তু এর ফলে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল জনসাধারণের মনে তার প্রতি অনুকূল এবং প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হয়।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমেরিকার শ্রমিকরা চাকুরীর সর্ত উন্নত করবার এবং মজুরী বৃদ্ধি করবার জন্য নিজেদের সংগঠিত করবার প্রয়াস পাচ্ছিল। মোটামুটি হিসাবে বলতে গেলে শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হোত, কারখানা ও খনিগুলিতে আলো-বাতাস আসবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না এবং ঠাসাঠাসি হয়ে কাজ করতো তারা। অতএব, কর্মকালীন পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা করা তাদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

'রাইটস্ অব লেবার' নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রথম শ্রমিক সংগঠন হিসাবে সমগ্র দেশে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। সমস্ত রকম শ্রমিকই এর সদস্য হতে পারতো এবং ফলতঃ এটি ছিল একটি শ্রমিক সংস্থা।

এই প্রতিষ্ঠানটি দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা করবার দাবী জানায়, দাবী জানায় শিশু-শ্রম বন্ধ করবার এবং ব্যবহারিক পণ্যের সরকারী মালিকানার পক্ষেও মতামত প্রকাশ করে। ১৮৮০ সালে এই সংস্থার ৭ লক্ষ সদস্য ছিল, কিন্তু তবুও এরা দাবী করবার জন্য ধর্মঘট ডাকতে পারেনি, এদের দাবী-দাওয়া অনেক সময়ই বহু শ্রমিকের নিকট অতিরিক্ত মনে হয়েছে এবং এর সাংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল। এরই ফলে প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

স্যামুয়েল গম্পার্স নামক একজন বিদেশাগত সিগার শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়ন গঠন করেন এবং এই ইউনিয়নগুলি সংগঠিত হয় এক বিরাট ফেডারেশনে। গম্পার্স এইভাবে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ান, আজও আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের মধ্য দিয়ে তার কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে। গম্পার্স-এর সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল অনেক বেশী বাস্তবপন্থী। শ্রমিক সংগঠনের মূল নীতিই ছিল এর একমাত্র লক্ষ্য। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার কোন রকম বৈপ্লবিক প্রস্তাবের ধারে কাছে যায় নি, এরা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির স্বপক্ষে থেকে যায়। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মজুরী বৃদ্ধি করা ও কাজের সময় কমানো এবং মালিকদের সংগে শ্রমিকদের যৌথ চুক্তি করে সুবিধা আদায় করবার অধিকার অর্জন।

মার্কিন সমাজ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র যে শ্রমিকরাই শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তা নয়। পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে জনসাধারণ ব্যবসায়ীদের অসাধুতার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৬২ সালের বাস্তুভিটা আইন অনুযায়ী সরকার পশ্চিম সীমান্তে যে কোন বসবাসকারীকে পাঁচ বৎসর চাষ করার পর ১৬০ একর জমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সুযোগ জনসাধারণের কাছে খুব লোভনীয় মনে হয়েছিল। ইতিমধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হোল রেল কোম্পানীগুলি এবং বিরাট একচেটিয়া কারবারীরা। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা স্থলপথে পণ্য চালান দিতে গিয়ে বিপুল ব্যবসায়ীদের অমন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাজেহাল হয়ে পড়ে। কারণ বিপুল ব্যবসায়ীরা রেলওয়ালাদের বাধ্য করেছিল কম শুল্কে তাদের মাল বহন করতে। এর ফলে পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ী ও চাষীদের অত্যন্ত ক্ষতি হতে লাগলো।

১৮৭০ দশকে গ্রাঞ্জ নামক কৃষকদের একটি প্রতিষ্ঠান রেল কোম্পানীগুলির সংগে এক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। তাদের উদ্দেশ্য অতিরিক্ত ভাড়া কমিয়ে দেওয়া এবং রিবেট ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা। এই সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ লক্ষ। তারা রাজ্য আইন সভাগুলির মারফত এর বিহিত করবার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিধি প্রণয়নে সমর্থ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এতে তাদের লাভ হয়েছিল যৎসামান্য। কারণ অংগ রাষ্ট্রগুলি শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতেই ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। ১৮৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সচেতন হয় এবং আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য আইন প্রণয়ন করে রেল কোম্পানীগুলির অসাধুতা কিছু পরিমাণে বন্ধ করে দেয়।

পশ্চিমাঞ্চলে এই বিরোধিতার অপর কারণ হোলো অর্থের মূল্যহ্রাস। পূর্ব অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসায়ীরা চাইছিলেন স্বর্ণের ভিত্তিতে স্থিতিশীল মুদ্রাব্যবস্থা, যার ফলে জাতির ঋণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব বেশী থাকবে। এরা চাইছিল গৃহযুদ্ধের সময় যে কাগজের নোট ছাড়া হয়েছিল সেগুলিকে বাতিল করে দিতে।

পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা অপরদিকে ছিল পূবাঞ্চলের খাতক। মুদ্রামূল্য হ্রাসের সময় তারা খামার ও ব্যবসা চালু করবার জন্য এই অর্থ ঋণ হিসেবে নেয়। তারা দেখল মুদ্রাস্ফীতিকালের কাগজের নোটে ঋণ শোধ করতে পারলে তাদের এই ঋণের বোঝা আর তত পীড়াদায়ক হবে না, কারণ বাজারে তখন এই নোটগুলির দাম খুব কমে গিয়েছে। অপরদিকে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থায় যদি তাদের ঋণ শোধ করতে হয় তাহলে সেখানকার অর্থনীতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

পশ্চিমাঞ্চল এর একটী সমাধান বার করেছিল। ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাব্যবস্থা সোনা ও রূপা এই উভয় ধাতুর ভিত্তিতেই চলত। তখনকার হিসাবে ষোল তোলা রূপা ছিল এক তোলা সোনার সমান। কিন্তু এই দুটি ধাতুর দামের হেরফের হওয়ার ফলে এই আনুপাতিক হার বজায় রাখা খুব কষ্টসাধ্য। কোন একটা ধাতুর মূল্যবৃদ্ধি হলে সেটিকে সাধারণতঃ লোকে ব্যবসায়ী ও স্বর্ণকারদের কাছে দিয়ে বেশী অর্থ সংগ্রহ করে নিতো। ১৮৭৩ সালে এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন বাজারে আর রৌপ্য মুদ্রা

ছিলই না। এই সময় অর্থদপ্তর রৌপ্য মুদ্রা তৈরী বন্ধ করে দেয় এবং শুধুমাত্র স্বর্ণমুদ্রাই তৈরী করতে থাকে।

এর কিছুকাল পর পশ্চিমে কয়েকটি বিরাট রৌপ্যখনি আবিষ্কৃত হয়। ফলে সোনার তুলনায় রূপার দাম ভীষণভাবে কমে যায়। এই সমস্ত খনির মালিকরা এক্ষণে ১৬ : ১ আনুপাতিক হারে পুনরায় রৌপ্যমুদ্রা তৈরীর জন্য দাবী জানাতে থাকে। তাদের আশা ছিল এইভাবে কম-দামী রূপার পরিবর্তে অধিকতর মূল্যবান সোনা সংগ্রহ করতে পারবে। তাদের সংগে যোগ দিল পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়। তাদেরও উদ্দেশ্য আবার রৌপ্যমুদ্রা চালু করা। এই রৌপ্যমুদ্রা হবে মুদ্রাস্ফীতি আমলের কাগজের নোটের ভিত্তিস্বরূপ এবং এরই মাধ্যমে তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করবে।

প্রেসিডেন্ট হেজ-এর আমলে কংগ্রেস রৌপ্যমুদ্রা পন্থীদের আবেদন অনুমোদন করে বাৎসরিক বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ ডলার মূল্যের রূপা কিনবার ব্যবস্থা করেছিল। এরপর ১৮৯০ সালে মারম্যান রৌপ্য ক্রয় আইন অনুসারে রৌপ্যমুদ্রা তৈরীর জন্য পশ্চিমের দাবী মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু যা আশংকা করা গিয়েছিল তাই হোলো, স্বর্ণ মুদ্রাগুলি লোকে জমিয়ে রাখতে লাগলো এবং তা আর বাজারে প্রায় থাকলো না। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস স্বর্ণমুদ্রা চালু রাখবার জন্য এই আইনটি বাতিল করে দেয়।

১৮৯০ দশকে রৌপ্যমুদ্রা প্রসংগটি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। আমেরিকার পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়। প্রায় ৩০ বছর আগে ক্রীতদাস প্রশ্ন নিয়ে এইরূপ মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। রৌপ্যমুদ্রা প্রসংগের এই বিরোধ শুধু যে উপদলীয় বিরোধ হয়ে থাকলো তা নয়, কৃষি ব্যবসায়ী এবং শিল্প ব্যবসায়ীদের মধ্যে, মহাজন এবং খাতকের মধ্যে, সাধারণ মানুষ এবং বিরাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে এটি জীবন মরণের সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ালো। এক কথায় বলা যায় রৌপ্যমুদ্রা প্রসংগটির মধ্য দিয়ে আমেরিকার জনসাধারণ বিপুল ভিত্তিতে শিল্প সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কারণ তারা মনে করেছিল যে এই শিল্প সমৃদ্ধির ফলে তাদের প্রবল ক্ষতি হচ্ছে।

• ১৮৮৪-৮৮ এবং ১৮৯২-৯৬ সাল পর্যন্ত ডেমোক্রাটিক দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই দুইবারই প্রেসিডেন্ট ছিলেন গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড।

তিনিই হলেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি একবার পরাজিত হয়ে চার বৎসর পর পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

ক্লীভল্যাণ্ড ছিলেন শাসনকর্তা হিসেবে সুদক্ষ মনোরঞ্জনের দিকে তাঁর লক্ষ ছিল না, যা কিছু ন্যায় মনে করতেন তাই করতেন তিনি। তিনি দুজন দক্ষিণাঞ্চলবাসীকে মন্ত্রণাসভায় স্থান দেন। এর ফলে রিপাব্লিকান দল থেকে তুমুল প্রতিবাদ উঠেছিল। অপরদিকে তিনি যখন একটি উচ্চ বেতনের সরকারী-পদে জনৈক রিপাব্লিকানকে নিয়োগ করলেন তখন ডেমোক্র্যাটরা অত্যন্ত রুষ্ট হয়। গৃহযুদ্ধের যে সব সৈনিক পেনসন পাচ্ছিল তিনি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদেরই পেনসন দিতে থাকলেন এবং তার ফলে রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী প্রাক্তন সৈনিকদের সংগঠনটি অনেক দুর্বল হয়ে যায়। এর পর পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করে তিনি সরকার কর্তৃক রৌপ্য ক্রয় করা বন্ধ করেন।

ক্লীভল্যাণ্ড-এর প্রথম দফার শাসনকালে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে রাজকোষে উদ্বৃত্ত অর্থ যা পড়ে রয়েছে সেগুলি দিয়ে কি করা হবে। এর একটি উপায় হোলো জাতীয় ঋণের কিছু অংশ পরিশোধ করে দেওয়া। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল তৎকালীন মুদ্রা ব্যবস্থা সরকারী ঋণপত্রের ভিত্তিতে রয়েছে। ফলে ঋণপরিশোধ করতে হলে চলতি মুদ্রা কমিয়ে দিতে হবে এবং ওই সময়ে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করা খুব যুক্তিসংগত বিবেচিত হয়নি। দ্বিতীয় উপায় ছিল উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন কর। কিন্তু ক্লীভল্যাণ্ড ছিলেন গোঁড়া ডেমোক্র্যাট, একারণ এই পন্থাটিও তাঁর মনঃপূত হলো না। তিনি স্থির করলেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমাবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হোলো সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া এবং তার জন্য উচ্চহারে রক্ষণমূলক বাণিজ্যশুল্ককে কমিয়ে দিতে হবে। শিল্পপতিরা এই ব্যবস্থাকে বিশেষ সমর্থন করলেন।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ক্লীভল্যাণ্ড বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করতে পারেন নি, এবং এই বিষয়টির ফলেই ১৮৮৮ সালের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। ক্লীভল্যাণ্ড বললেন যে শুল্কের পরিমাণ বেশী হলে স্বদেশে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেশী হয় এবং জনসাধারণেরই লোকসান হয় তাতে। পক্ষান্তরে রিপাব্লিকানরা বললো যে জনসাধারণ যে উচ্চহারে মজুরী পাচ্ছে এবং চাকুরী

করছে তারই মূলে হোলো রক্ষণমূলক শুল্ক, কারণ এই শুল্ক-ব্যবস্থা আছে বলেই আমেরিকার শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হস্ত থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং যথাযথ চলতে পারছে। ১৮৮৮ সালের নির্বাচনে জনসাধারণ প্রদত্ত ভোট ক্লীভল্যাণ্ড পেয়েছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা বেশি। কিন্তু রিপাব্লিকান প্রার্থী বেঞ্জামিন হ্যারিসন ইলেক্টোরাল ভোটে জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বেঞ্জামিন হ্যারিসন ছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলিয়ম হেনরী হ্যারিসনের পৌত্র।

ক্ষমতা পুনর্দখল করে রিপাব্লিকানরা বাণিজ্যশুল্ক আরো বাড়িয়ে দেয় এবং ফলে যে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হয় তা দিয়ে সৈনিকদের পেনসন দিতে থাকে, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে থাকে এবং নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে জাতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার অধোগতি রুদ্ধ হয়নি। কারণ জাতীয় ঋণের ভিত্তি যে সোনা তা তখন কমে গিয়েছে। অতএব দেখা গেল, অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। কোম্পানীর শেয়ারের দাম নিম্নাভিমুখী, বন্ধকী ঋণের পরিমাণও কমে গেল। অতএব ১৮৯২ সালের নির্বাচনে জনসাধারণ ক্লীভল্যাণ্ডকে পুনর্নির্বাচিত করে।

এই নির্বাচনে তৃতীয় একটি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয় এবং তারা ১০ লক্ষাধিক ভোট সংগ্রহ করে। পশ্চিমাঞ্চলের অসন্তুষ্ট কৃষক এবং ঋণগ্রস্তের দল পিপলস্ পার্টি অথবা পপুলিষ্ট নাম নিয়ে এই নূতন রাজনৈতিক দলটি গঠন করেছিল। এদের প্রার্থী ছিলেন আইওয়ার জেনারেল জেমস্ বী, উইভার। অবাধ রৌপ্যমুদ্রা তৈরী, জাতীয় ব্যাংক প্রথার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন এবং রেলপথ ও ব্যবহারিক বিষয়গুলির সরকারী মালিকানার দাবী তুলে তারা নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। ক্যান্‌জাস্, কলোরাডো, আইডাহো এবং নেভাডা রাজ্য এই দলটির পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এদের মূল কথা ছিল ডেমোক্র্যাট বা রিপাব্লিকান পার্টি জনগণের প্রকৃত আশা আকাংক্ষা অনুসারে কাজ করে না।

১৮৯২-৯৬ সালের শাসনকালে প্রেসিডেন্ট ক্লীভল্যাণ্ড জাতিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস পেয়েছিলেন। বণিক সমাজের শুভানুধ্যায়ী না হয়েও তিনি সরকারী ঋণ পত্রের হ্রাসমূলে স্বর্ণ সরবরাহ করবার জন্য জে, পি, মর্গান প্রমুখ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের অনুরোধ জানান। সরকারী তোষাখানায় এইরূপে স্বর্ণ আমদানী করবার জন্য পপুলিষ্টরা ক্ষেপে যায় এবং

ডেমোক্র্যাটদের মধ্যেও বহুলোক তার উপর বিরূপ হয়। তারা তাঁকে ওয়াল ষ্ট্রীট অর্থাৎ বণিক শ্রেণীর সেবক ও ক্রীড়নক বলতে শুরু করেছিল।

দেশের কৃষক এবং শ্রমিকের দল ইতিমধ্যে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। সরকার যা কিছুই করুক না কেন তাকেই তারা বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অনুকূল কার্য ও জনসাধারণের ক্ষতিকারক বলে মনে করতে লাগলো। ফেডারেল কোর্টের কয়েকটি রায়ে এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এরূপ একটি রায়ে বলা হয় যে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে কোন অংগরাষ্ট্র কোন ব্যক্তিতে জীবনধারণ, স্বাধীনতা অথবা সম্পদ আহরণের ক্ষমতা থেকে যথাযথ আইন অনুসারে ব্যতীত বঞ্চিত করতে পারবে না, এবং যেহেতু কর্পোরেশনগুলি (বৃহৎব্যবসায়ীগোষ্ঠী) ব্যক্তির সামিল সেকারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে অংগরাষ্ট্র সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। এ সম্পর্কে যুক্তি উঠল যে এর ফলে কর্পোরেশনগুলি অসীমক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এতাবৎকাল তাদের নিয়ন্ত্রিত করবার মতো কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নি।

১৮৯৬ সালের নির্বাচনে এই বিষয়টি চরমে ওঠে। ক্লীভল্যাণ্ড এবং উদারপন্থী ডেমোক্র্যাটরা দেশকে দেউলিয়া হবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। রিপাব্লিকানরা তাদের সম্মেলনে এই ব্যর্থতা নিয়ে খুব উল্লাস করে এবং ওহায়ো-র গভর্নর ইউলিয়ম ম্যাক্‌কিনলেকে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে। তারা ঘোষণা করে যে যতদিন পর্যন্ত অবস্থার সুরাহা না হচ্ছে অন্ততঃ সে পর্যন্ত দেশের মুদ্রামান শুধুমাত্র স্বর্ণভিত্তিক হবে। তারা অভিযোগ করলো যে সুলভ রৌপ্যের ফলেই মুদ্রার মূল্য কমে গিয়েছে। এর ফলে দেশে ও বিদেশে ব্যবসায় ঠিকমতো চলছে না। এই অবস্থার সুরাহা হলেই মাত্র দেশ আবার সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলবে বলে তারা ঘোষণা করলো।

শিকাগোর ডেমোক্র্যাট দলের সভায় ক্লীভল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার এবং স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা বজায় রাখবার প্রচেষ্টার যথেষ্ট নিন্দা করা হয়। তারা ১৬ : ১ আনুপাতিক হারে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বৃহৎ ব্যবসায়গুলির বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করে। বৃহৎ ব্যবসায়গুলির বিরুদ্ধে এই জেহাদের মুখপাত্র হিসাবে তারা প্রেসিডেন্ট-পদে প্রার্থী নির্বাচন করল নেব্রাস্কার কংগ্রেস সদস্য উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ানকে, বয়স তার মাত্র ৩৬

বৎসর। ব্রায়ান ছিলেন সুবক্তা। তার অনভিজ্ঞতার কথা লোকে বিস্মৃত হলো তার আন্তরিকতার ফলে। তিনি বললেন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে শ্রমজীবী মানুষকে পিষে মারবার কোন যৌক্তিকতাই নাই।

এবারের নির্বাচনী অভিযান আমেরিকার ইতিহাসে স্মরণীয়। পপুলিষ্টদল অনতিবিলম্বে যোগ দেয় ডেমোক্র্যাটদের সংগে এবং দক্ষিণীরা একযোগে সমর্থন জানায় ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে। ব্রায়ান একযোগে সমগ্র দেশে ঘুরে বেড়ালেন, তার বক্তৃতা চমক জাগালো লোকের মনে।

ব্রায়ান-কে পরাজিত করবার জন্য রিপাব্লিকানরা চেষ্টার কোন কসুর করলো না, জিততে তাদের হবেই। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হলো এই নির্বাচন অভিযানে। ম্যাক্‌কিনলে ছিলেন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ শাসক। তার নির্বাচনী অভিযানের ব্যবস্থাপক মার্ক হ্যানা নামক ব্যবসায়ী ১৮ হাজার ভাড়াটিয়া বক্তা সংগ্রহ করলেন নির্বাচনের শেষ সপ্তাহে। এই বক্তারা ব্রায়ান-এর নীতির ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে দেশকে সচেতন করবার জন্য সমগ্র দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালো।

এই নির্বাচনে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি লোক ভোট দিয়েছিল। মোটামুটি হিসাবে পেয়েছিলেন ৭০ লক্ষ ও ব্রায়ান ৬০ লক্ষ ভোট। এই ফলাফলের ফলে পূর্বাঞ্চলে আবার স্বস্তি ফিরে এলো। সেখানকার ব্যবসাপত্র, কলকারখানা আবার চালু হয়ে যায়। এই নির্বাচনের মূল কথা হলো যে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবাদের মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বিজয়ী দলের পক্ষে তা অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষের এই প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক আমেরিকার ইতিহাসে বারংবার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বশক্তিরূপে আমেরিকার আত্মপ্রকাশ

১৮৯০ দশকে আমেরিকার রাস্তায় দেখা গেল "ঘোড়া ছাড়া গাড়ী।" সবিস্ময়ে লোকে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী ছাড়া আর কেউ এই মন্থরগতি নড়বড়ে যান রাখতে পারতেন না। তখনকার দিনে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে সেদিনের সেই বাহনটি আজকের দিনের ঝকঝকে মোটর গাড়ীতে রূপান্তরিত হবে, লক্ষের হিসাবে তৈরী হবে প্রতিবছর এবং প্রতি চারজন আমেরিকান প্রতি একটি গাড়ী থাকবে। সেদিন একথা কেউ ভাবতে পারে নি যে সারাদেশে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়বে বড়ো বড়ো রাস্তা এবং দেশের সুদূর প্রান্তস্থ কৃষকও মোটরগাড়ী চড়ে কয়েকঘণ্টায় শহরে এসে পড়তে পারবে। আমেরিকা হয়ে দাঁড়াবে "চক্র বাহিত জাতি।"

এর কিছুদিন পরে আর একটি আজব ব্যাপার ঘটে যায়। উত্তর ক্যারো-লাইনার কিটিহকে রাইট্ ভাইয়েরা এক বিচিত্র যন্ত্র প্রস্তুত করে মানুষের আকাশে ওড়বার স্বপ্নকে সফল করে তোলেন। এই যন্ত্রটিই হলো এরোপ্লেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল যুদ্ধ বিক্ষত ইউরোপের আকাশে

শুরু হয়েছে বিমানযুদ্ধ এবং তারও অল্পকালের মধ্যেই অতল সমুদ্র পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রীবহন করতে লাগলো এই এরোপ্লেন।

মার্কনি নামক এক তরুণ ইটালীয় আটলান্টিকের ওপর দিয়ে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় বেতার বার্তা পাঠালেন, শুরু হলো বেতারের যুগ। টমাস এডিসন আলোকচিত্র গ্রহণের এমন এক দ্রুত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যার ফলে শুরু হয় চলচ্চিত্রের যুগ। আবিষ্কৃত হয় ওঠানামার জন্য লিফ্ট্ এবং বড়ো বড়ো শহরে গড়ে ওঠে আকাশ ছোঁওয়া অট্টালিকা। এই সমস্ত এবং আরো হাজার রকমের আবিষ্কারের ফলে ১৯০০ সালের পরবর্তী কাল থেকে আমেরিকায় যে রূপান্তর ঘটতে থাকে তা পরিণতি পেয়েছে বর্তমান রূপে। (অবশ্য এই সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে সবগুলি আমেরিকানরা করেন নি।)

যুক্তরাষ্ট্র যে একটি বৃহৎ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হবে সেটা অকল্পনীয় কিছু ছিল না। তবে দেশ এই পরিণতি পেয়েছিল অত্যন্ত দ্রুতভাবে। আমেরিকানদের মধ্যে ছিল প্রচুর প্রাণশক্তি, অশান্ত মানুষ তারা। সম্ভবত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বিরাট ভূখণ্ডে বসবাস করে জীবিকা ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে বলেই তাদের চরিত্রে এই সকল ভাব এসেছিল। ১৮৯০ দশকে পশ্চিম সীমান্তের পরপারে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে তারা জাপানের সংগে ব্যবসায় শুরু করে দেয়। আবার মনরো নীতির মাধ্যমে প্রতিবেশীদের রক্ষা করবারও দায়িত্ব নিয়েছিল তারা। অতএব দেখা যাচ্ছে তাদের দেশের বাইরে যাবার উৎসাহ ছিল বরাবরই প্রবল।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্বে পণ্যের বাজার দখল করবার জন্য এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। আমেরিকাও অই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। অবশ্য ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যেরকমভাবে এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় বাণিজ্য করবার পথে মাঝপথে জাহাজে কয়লা বোঝাই করবার জন্য বিভিন্ন দ্বীপ দখলের প্রয়াসী ছিল আমেরিকার সেরকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অপরদিকে ক্যারিবিয়ান সাগরে বিদেশী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্স তখন সেখানে চেষ্টা করছে ইস্থমাস্ অব পানামার মধ্য দিয়ে খাল কেটে আটলান্টিকের সংগে প্রশান্ত মহাসাগরকে যোগ করবার।

আমেরিকানরা তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে।

তাদের মনে তখন প্রশ্ন উঠেছে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এই গোলার্ধে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করছে, এই সময় চুপ করে বসে থাকা উচিত হবে কি? সমুদ্রের উপর বিভিন্ন সামরিক শক্তিকে আধিপত্য বিস্তার করতে দেওয়া উচিত কি? তারা কি কোনদিন আমেরিকার শত্রু হয়ে উঠবে না?

স্পেন তখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ফ্লোরিডার মাত্র ৯৫ মাইল দূরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অতি সমৃদ্ধ বৃহত্তম দ্বীপ কিউবা তখনও তাদের দখলে। এইখানে ১৮৯৫ সালে পরপর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র অতর্কিতে পরিণত হয় এক বিশ্ব শক্তিতে।

স্পেন কিউবা শাসন করছিল অত্যন্ত কঠোরভাবে ফলে সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণ বিদ্রোহ করে। প্রায় দুই লক্ষ স্প্যানিশ সৈন্য এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। কিউবাস্থ কিছু সংখ্যক আমেরিকান বাগিচা মালিকও এই যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিন্‌লে নৈতিক ও বৈষয়িক এই উভয়বিধ কারণে এই রক্তক্ষয় বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু স্পেন তাকে সরাসরি বলে দেয় নিজের চরকায় তেল দিতে। এদিকে আমেরিকায় কয়েকটি সংবাদপত্র বড়ো বড়ো শিরোনামায় মুখরোচক সব খবর ছাপতে থাকে। ফলে মার্কিন জনমনে প্রচণ্ড ঘৃণার সৃষ্টি হয়। খবর বেরোলো হাভানা বন্দরে মার্কিন নৌবহরের মেইন জাহাজখানি ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, লোকক্ষয় হয়েছে ২৬৮ জন। সমগ্র দেশে তখন যুদ্ধঘোষণার দাবী উঠল। এই জাহাজখানিকে কেউ ডুবিয়ে দিয়েছিল কিনা কিংবা জাহাজের অভ্যন্তরে কোন বিস্ফোরণের ফলে এরকম ঘটেছিল কিনা তা আজও জানা যায় নি।

শেষ মুহূর্তে স্পেন কিউবাতে সন্ধির জন্য আমেরিকার দাবী মেনে নিয়ে এই সংঘর্ষ এড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমেরিকানরা এটা মেনে নিতে পারে নি এবং কিউবাকে অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে স্বাধীনতা দেবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে গেল।

১৮৯৮ সালে স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় প্রায় একতরফা ভাবে। প্রথম যে সংঘর্ষ হলো তাতে অ্যাডমিরাল জর্জ ডিউই-র নেতৃত্বে চীনের হংকংস্থ বৃটিশ নৌঘাঁটি থেকে একটি মার্কিন নৌবহর স্পেন অধিকৃত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ

অভিমুখে যাত্রা করে এবং ম্যানিলাতে স্পেনের কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করে দেয়। এতে একজনও মার্কিন নাবিকের প্রাণনাশ হয়নি।

পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন আমেরিকার সৈন্যদল কিউবার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পরপর কয়েকটি যুদ্ধে স্পেনের সৈন্যদলকে পরাভূত করে। নিউ ইয়র্কের কর্নেল থিয়োডোর রুজভেল্ট সানজুয়ান হিলে একদল ঘোড়াসওয়ার নিয়ে সৈন্যদের আক্রমণ করেন এবং জয়ী হন। কয়েক সপ্তাহ পর কিউবার স্যান্টিয়াগোর অদূরে স্পেনের আর একটি নৌবহরকে আমেরিকানরা ধ্বংস করে দেয় এবং এর ফলে স্পেনের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। ক্যারিবিয়ান উপসাগরে স্পেনের অধিকৃত দ্বীপগুলি আমেরিকার হাতে এসে যায় এবং সুদূর ম্যানিলাতেও প্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন আধিপত্য।

শান্তি সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এক গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। প্রশ্ন ওঠে সদ্যোমুক্ত কিউবা ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলগুলি স্পেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা? কিংবা এগুলিকে নিজের দখলে রেখে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ হিসাবে কাজ চালাবে কিনা? প্রবল বিতর্ক হয় এই বিষয় নিয়ে। আমেরিকানদের এক অংশ যুক্তি দেখালেন যে দূরবর্তী অঞ্চল অধিকার করে আমেরিকানরা জাতির মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। অপর পক্ষ মনে করলেন যে নূতন উপনিবেশ অধিকার করা হলো বিশ্বশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার অংগ বিশেষ। তারা এ-ও বললেন যে ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকজনকে আবার স্পেনের হাতে তুলে দেওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হবে। প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিন্‌লে উপনিবেশগুলি স্পেনের হাতে তুলে না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এর ফলে স্পেন পোর্টোরিকো, গুয়াম এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় এবং ১৯০১ সালের প্ল্যাট সংশোধন অনুযায়ী কিউবা মার্কিন রক্ষণাধীনে প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এছাড়া হাওয়াই দ্বীপও যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে। মার্কিন মিশনারী এবং ব্যবসায়ীরা বহুদিন পূর্বেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ১৯০০ সালে হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হয়।

আমেরিকার এই নূতন অধিকৃত অঞ্চলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল

ফিলিপাইন, জনসংখ্যা ৭৫ লক্ষ। ফিলিপাইনের অধিবাসীরা এমিলিও আগিনাণ্ডোর নেতৃত্বে স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল। এইবার তারা অবতীর্ণ হলো আমেরিকার বিরুদ্ধে। ফিলিপাইনের পাহাড়ে ও জঙ্গলে শুরু হলো তীব্র গোরিলা যুদ্ধ। এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য আমেরিকা সেখানে ৫০ হাজারের বেশি সৈন্য পাঠায় এবং সাফল্যলাভ করে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র চীনদেশে এক গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি বাণিজ্য করবার সুবিধার জন্য চীনদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে ফেলেছিল। চীনাদের সেটা একেবারে ভালো লাগে নি। তাদের একটি সংগঠন ছিল নাম বক্সার। এই দলটি দেশের সমস্ত বিদেশীদের হত্যা অথবা বিতাড়ণের এক পরিকল্পনা করে। ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহে চীনারা পিকিংস্থ দূতাবাসটি দখল করে এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকাসহ এক আন্তর্জাতিক বাহিনী কর্তৃক পরাভূত হয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিদেশী শক্তিগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই ছিল চীনের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। কারণ পরে যখন বক্সার বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ দিতে চীনকে বাধ্য করা হয়েছিল তখন সেই বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কলেজে চীনা ছাত্রদের পড়বার ব্যবস্থা করে দেয়। এছাড়া চীন সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণের বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবিত করে। যুক্তরাষ্ট্র তখন চীনকে বিভক্ত করবার প্রচেষ্টা বন্ধ করবার দাবী জানায় এবং সেখানকার আঞ্চলিক ও শাসনতান্ত্রিক অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

* * *

১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চিত্রে দেখা দেয় প্রচুর সমৃদ্ধি। কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ তখন ক্রমে বেড়েই চলেছে, আমদানী থেকে রপ্তানী হচ্ছে অনেক বেশি ; এবং আলাস্কায় প্রচুর স্বর্ণ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায়ও স্থিতি এসেছে। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে প্রেসিডেন্ট ম্যাককিন্‌লে পুনরায় ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ানকে নির্বাচনে পরাস্ত করেন। বৃহৎ ব্যবসায় তখন দেশকে সমৃদ্ধির দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সানজুয়ান হিল যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি থিয়োডোর রুজভেল্ট ১৯০০ সালের নির্বাচনে ছিলেন ম্যাককিন্‌লে-র সহগামী ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। আমেরিকার ইতিহাসে রুজভেল্টের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ইনি

ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কিছুকাল তিনি পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন। স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের পর তিনি নিউ-ইয়র্কের গভর্নর নির্বাচিত হন। এই সময় থিয়োডোর রুজভেল্টের সততা এবং সংস্কারমূলক কাজকর্ম রিপাব্লিকান রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা তখন চেষ্টা করে তাকে ভাইস্-প্রেসিডেন্ট-পদে প্রার্থী নির্বাচন করে। তাদের আশা ছিল এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি আর তাদের ক্ষতি করতে পারবেন না।

এই কৌশল কিন্তু পরে তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনের মাত্র ছ'মাস পরে প্রেসিডেন্ট ম্যাককিন্‌লে আততায়ীর গুলীতে নিহত হবার পর থিয়োডোর রুজভেল্ট মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর অব্যবহিত পরেই রুজভেল্ট বৃহৎ ব্যবসায় স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ, বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি, এবং পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উদ্ধার করবার নীতি নিয়ে অবতীর্ণ হন। সমাজের সর্বস্তরের লোকজনের হিতার্থে গঠিত এই পরিকল্পনা "স্কোয়ারডিল" নামে পরিচিত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে রুজভেল্ট ট্রাষ্ট বা কর্পোরেশন প্রভৃতি বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থের বিরোধী ছিলেন না। এ'গুলিকে তিনি আমেরিকার ধনতান্ত্রিক বৈষয়িক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করতেন। তিনি ছিলেন আইন ভঙ্গকারী দুষ্ট প্রকৃতির ধনীকের বিরুদ্ধে। আর যারা ঘুষ দিয়ে ও ঠকিয়ে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে নিজেরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন তিনি।

দায়িত্বভার গ্রহণের অল্পকালের মধ্যেই রুজভেল্টের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে কংগ্রেস সারম্যান অ্যান্টিট্রাষ্ট আইন পাশ করেছিল। ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে বৃহৎ কারবার গঠন নিষিদ্ধ করা হয় এই আইনে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে সারম্যান আইন বৃহৎ কারবারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে অন্যান্যরা। কারণ এই আইনের ভাষ্য করে বলা হয়েছিল যে শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার কোন অধিকার নাই। রুজভেল্ট ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিষয়টির বিবেচনা করলেন।

নর্দার্ন প্যাসিফিক এবং গ্রেট নর্দার্ন রেলওয়ে একত্র হয়ে পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ রেলপথ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে। রুজভেল্ট তখন সারম্যান আইন

অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়লাভও করেন তাতে। একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে এই সাফল্যে জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিল। সারম্যান আইনের কার্যকারিতা তখনকার মতো প্রতিপন্ন হয়।

১৯০২ সালে কয়লাখনির শ্রমিকরা চাকুরীর সর্তের উন্নতির জন্য ধর্মঘট শুরু করে, অপরদিকে খনির মালিকরা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে অস্বীকৃত হয়। ধীরে ধীরে শীতকাল এগিয়ে আসে, কয়লার সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পায়। মূল্য বেড়ে যায় অত্যন্ত বেশি এবং জনসাধারণ প্রচণ্ড শীতে অত্যন্ত কষ্ট পেতে থাকে। রুজভেল্ট রুখে দাঁড়ালেন খনি মালিকদের। তিনি বললেন যে ইউনিয়নের সংগে এই বিবাদে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের মধ্যস্থতায় মালিকরা যদি স্বীকৃত না হন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের দিয়ে তিনি খনিগুলি চালু করবেন। শেষ পর্যন্ত অসন্তুষ্ট মালিকরা নতি স্বীকার করে এবং খনিগুলি চালু হয়। এদিকে কমিশন তার রায়ে শ্রমিকদের মজুরী শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়ে দেয়।

পশ্চিমাঞ্চলের বিষয় রুজভেল্ট আবারও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি বহু সরকারী জমির বিক্রী বন্ধ করে দেন এবং সেগুলিকে সরকারের রক্ষণাধীনে নিয়ে আসেন। পশ্চিমের কাষ্ঠব্যবসায়ী এবং পশু-পালকরা এর তীব্র বিরোধীতা করেছিল। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই প্রেসিডেন্ট এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। কারণ কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোনরকম পরিকল্পনা না করেই বনসম্পদ কেটে নষ্ট করছিল এবং পশুচারণ ভূমির ক্ষতিসাধন করছিল। অপর দিকে রুজভেল্ট ঊষর জমিকে সুফলা করে তুলবার জন্য বাঁধ এবং সেচ পরিকল্পনার দিকে আরো নজর দিলেন।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রুজভেল্ট যে বলিষ্ঠ নীতির পরিচয় দিয়েছিলেন বৈদেশিক ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যত্যয় হলো না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা তাঁর নীতিকে অবিমৃষ্যকারী এবং কূটনীতি বর্জিত বলে নিন্দা করল। তারা আরো বললো যে তার নীতিটি হলো দুমুখো। যাই হোক না কেন রুজভেল্ট সমগ্র বিশ্বে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে পড়লেন এবং বিদেশে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়েও তখন আমেরিকার প্রতিপত্তি। ফলে একটি

খালের প্রয়োজন দেখা দিল! আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করে একটি খাল খনন করবার জন্য ফরাসীরা যে চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকার পূর্ব উপকূল থেকে জাহাজগুলিকে প্রাচ্যদেশে যেতে হতো দক্ষিণ আমেরিকা প্রদক্ষিণ করে। ১৯০২ সালে কংগ্রেস এরকম একটি খাল তৈরী করবার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই খালটি তৈরী হবে সম্ভব হলে কলম্বিয়ার অন্তর্গত পানামার মধ্য দিয়ে, আর তা না হলে নিকারাগুয়াতে। ফরাসীরা চেষ্টা করে খাল খনন করবার জন্য তাদের কোম্পানীটি ও তাদের সাজ সরঞ্জাম আমেরিকার কাছে বিক্রী করে দিল। এগুলি কিনবার সুবিধা হলো যে কলম্বিয়া অনুমতি দিলে পানামার মধ্য দিয়ে সহজেই খালটি কাটা যাবে।

কলম্বিয়ার নিকট রুজভেল্ট প্রস্তাব পাঠালেন যে পানামা যোজকের পঞ্চাশ মাইল আড়াআড়ি সরু একখণ্ড জমির জন্য আমেরিকা তাদের এক কোটি ডলার মূল্য দেবে এবং এছাড়া বার্ষিক খাজনাও দেবে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এই রাষ্ট্রটি মনে করল যে এই অর্থ মূল্য হিসাবে খুবই কম। তারা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এর ফলে পানামাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কারণ দেখা গিয়েছিল এর কিছুদিন পরেই সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা হিসাবে এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য সরকার বিদ্রোহ দমনের কোন চেষ্টাও করেনি। এই ভাবেই দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্র এবার পানামা প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেই কারবার শুরু করে। কলম্বিয়াকে যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হয়েছিল সেই অর্থ নূতন সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র দেয় এবং পানামা খাল তৈরী করতে অগ্রসর হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে পানামা খাল তৈরী এক বিরাট বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

এই ধরণের কৌশলকে অসাধু বলে নিন্দা করা যেতে পারে, আবার যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য এটা করা হয়েছিল তার জন্য এর প্রশংসাও করা চলে। ভালোমন্দ যাই হোক না কেন এর ফলে আমেরিকার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি তাকে আরো বেশি অবিশ্বাস করতে থাকল এবং তারা আশংকা করল যে আমেরিকার প্রতিপত্তি আরো বিস্তৃত হবে। দক্ষিণের এই রাষ্ট্রগুলির এরূপ সন্দেহ অংশতঃ সত্য প্রমাণিত হলো যখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনরো নীতির বিকল্প নীতি ঘোষণা করেন।

কতিপয় ল্যাটিন এবং দক্ষিণ আমেরিকান রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য ইউরোপ থেকে টাকা ধার করেছিল। নানা কারণে তারা ধার শোধ করতে পারে নি এবং দেখা গেল ঋণ উশুল করবার জন্য বিদেশী নৌবহর এসে সেখানে হাজির হয়েছে। এই ঘটনা নিবৃত্ত করার জন্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বিদেশী রাষ্ট্রের অধিকার বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন যে অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রই এই সমস্ত ঋণের অর্থ আদায় করবে আর তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি এমনভাবে পরিচালিত করবে যার ফলে সেই দেশগুলি বৈষয়িক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা লাভ করে। মনরো নীতির এ ধরণের প্রসার ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি কিন্তু ভালোভাবে গ্রহণ করলো না, তবুও এর ফলে পশ্চিম গোলার্ধে শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরে এলো।

থিয়োডোর রুজভেল্টের জনপ্রিয়তা তখন অত্যন্ত বেশি। এর ফলে ১৯০৪ সালের নির্বাচনে তিনি ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী অ্যালটন পার্কার-কে সহজেই পরাস্ত করেন। রুজভেল্টের দ্বিতীয় দফার কার্যক্রমের সময় সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হলো পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তার সাফল্য। তারই প্রচেষ্টায় রুশ জাপান যুদ্ধ শেষ হয়, উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথে। অপর দিকে মরক্কো সম্পর্কে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে বিবাদের ফলে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছিল। সেই যুদ্ধরোধের বিষয়ে রুজভেল্টের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। স্বদেশে রুজভেল্ট বৃহৎ ব্যবসায়ী স্বার্থকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন এবং রেলপথ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কয়েকটি আইনও করেন।

দেশের সর্বত্রই তখন সংস্কার চলেছে। খাদ্যশিল্প এবং মাংস কৌটাজাত করার শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কংগ্রেস সেই সম্পর্কে কয়েকটি আইন পাশ করে। এদিকে পশ্চিমাঞ্চলে মহিলাদের ভোটাধিকার দেবার এবং সেনেটারদের জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাব নির্বাচিত করবার জন্য আন্দোলন চলতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত সেনেটররা নির্বাচিত হতেন বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত রাজ্য আইন পরিষদগুলির দ্বারা। রুজভেল্ট হয়তো ১৯০৮ সালেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন কিন্তু তিনি পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি মতো আর নির্বাচন প্রার্থী হননি। তাঁরই মনোনীত প্রার্থী উইলিয়ম হাওয়ার্ড টাফ্‌ট্ প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ানকে পরাস্ত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

রুজভেল্টের কর্মক্ষমতা ছিল অসীম। অতএব তাঁর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট যতই কর্মক্ষম হোক না কেন তুলনায় তাঁকে অবশ্যই নিষ্প্রভ মনে হবে। টাফ্‌টের ক্ষেত্রে সেই রকমই ঘটেছিল। রাজনীতি ও আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট সুনাম থাকলেও প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি জনচিত্ত জয় করতে পারেন নি। টাফ্‌ট রুজভেল্টের নীতি অনুসরণ করে বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা হলো যেগুলি ছিল তার আয়ত্তের বাইরে। ইতিমধ্যে রিপাব্লিকান পার্টি দুটি উপদলে ভাগ হতে চলেছে। একটি দল যাদের বলা হতো উদার মতাবলম্বী তারা চাইলেন স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে রুজভেল্টের সমুদয় নীতি অনুসৃত হোক—যথা, বাণিজ্য শুল্ক অবিলম্বে হ্রাস করতে হবে, শ্রমিকদের অনুকূলে আইন পাশ করতে হবে এবং বিত্তশালীদের উপর কর চাপাতে হবে। অপর 'উপদলটি' ছিল রক্ষণশীল। তারা চেয়েছিল রুজভেল্টের নীতির বিপরীত কিছু এবং বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থের অভ্যুদয়ই ছিল তাদের কাম্য।

প্রেসিডেন্ট টাফ্‌ট ধীরভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ফলে উদার মতাবলম্বীরা অধৈর্য হয়ে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিতে থাকে। অতঃপর প্রেসিডেন্ট বাণিজ্য শুল্ক হ্রাসে অসমর্থ হন। এদিকে তিনি রুজভেল্টের কতিপয় বিশ্বাসী কর্মচারীকে সরিয়ে কয়েকজন পূর্বোক্ত রক্ষণশীলকে সরকারী পদে বহাল করেন। এরই ফলে উদারনীতিকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং উইস্‌কন্‌সিনের সেনেটর রবার্ট এম, লাফোলেট-এর নেতৃত্বে ন্যাশনাল রিপাব্লিকান প্রগ্রেসিভ লীগ গঠন করে।

উইস্‌কনসিন-এর গভর্নর হিসাবে লাফোলেট প্রগতিশীল নীতিকে কার্যকরী করে তুলছিলেন। সেখানে যতদূর সম্ভব জনসাধারণের স্বার্থে রেলপথ এবং ব্যবসায়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছিল এবং সেই রাজ্যে আঞ্চলিক আয়কর প্রবর্তিত করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, এই নীতির ফলে সেখানে ভোটের মাধ্যমে জনগণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে রাজ্য আইনসভা নিয়ন্ত্রিত করতো ভোটাররাই। সেখানে কিছু সংখ্যক নাগরিক কোন একটি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করবার জন্য আবেদন জানালে আইনসভা যথাবিধি ব্যবস্থা করতে বাধ্য হতো। তারপর ছিল গণভোটের ব্যবস্থা। তার মাধ্যমে জনসাধারণ

বিধিবদ্ধ আইন সমর্থন করতো অথবা বাতিল করে দিতে পারতো। আবার এমন ব্যবস্থা ছিল যার ফলে যথেষ্ট সংখ্যক নাগরিক দরখাস্ত করলে সরকারী পদাধিকারীকে অপসারণ করা হোত। আর ছিল প্রত্যক্ষ প্রাথমিক নির্বাচন ব্যবস্থা যার ফলে ভোটাররাই সরাসরি জাতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতো, রাজনৈতিক নেতাদের কর্তৃত্ব ছিল না সেখানে। এই সমস্ত নীতিই প্রগতিশীলের দল রিপাব্লিকান পার্টির কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করতে চাইছিলেন।

এই প্রগতিশীল আন্দোলন যখন জোরদার হতে চলেছে তখন থিয়োডোর রুজভেল্ট আফ্রিকা এবং ইউরোপ সফরান্তে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে তিনি পুরাতন বন্ধু টাফ্‌ট অথবা প্রগতিবাদীদের মধ্যে কাকে সমর্থন করেন রুজভেল্ট তখন শেষোক্তদের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। লাফোলেট মনে করেছিলেন রুজভেল্ট টাফট-এর মতোই প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু পরিবর্তে তিনি দেখলেন প্রগতিবাদীরা প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সমর্থনে এগিয়েছে এবং তারা সিদ্ধান্ত করেছে ১৯১২ সালের রিপাব্লিকান সম্মেলনে তাঁকে তৃতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করতে।

রুজভেল্ট এবং টাফ্‌ট ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এখন নির্বাচনে মনোনয়ন-লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা পরস্পরের ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। রুজভেল্টের ছিল বিপুল জনপ্রিয়তা ও বিশাল ব্যক্তিত্ব। কিন্তু টাফ্‌ট রাজনীতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে প্রথম ব্যালটেই রুজভেল্টকে পরাস্ত করেন। এই পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে রুজভেল্ট তৃতীয় একটি দল গঠনে মনস্থ করেন। ফলে ১৮৬০ সালে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট ভাঙন দেখা দিয়েছিল এবার রিপাব্লিকান দলেও সেরূপ ভাঙন সম্পন্ন হলো।

দু'মাস পরে রুজভেল্টের সমর্থকরা এক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং তারা তাদের জনপ্রিয় নেতাকে প্রোগ্রেসিভ পার্টির প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে। অনেকে রুজভেল্টকে বললেন যে তিনি কথা দিয়েছিলেন তৃতীয় বার নির্বাচন প্রার্থী হবেন না। রুজভেল্ট বললেন যে তার অর্থ হলো উপর্যুপরি তৃতীয়বার তিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। প্রোগ্রেসিভ দল তাদের ইস্তাহারে জনগণ নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঘোষণা করলো, সেনেটরদের প্রত্যক্ষ

নির্বাচনের অনুকূলে মত প্রকাশ করলো, ঘোষণা করলো বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং বলিষ্ঠ সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হবে।

রিপাব্লিকান দলে এই ভাঙনে ডেমোক্র্যাটরা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই ভাঙনই তাদের বিশ বৎসরের মধ্যে আবার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। তারা ভাবতে বসল ব্রায়ানকে প্রার্থী মনোনীত করা হবে কি না। বিখ্যাত বাগ্মী হলেও তিনি অনেকবারই নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছেন। বাল্টিমোরে দলের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রতিনিধি সভার স্পীকার চ্যাম্প ক্লার্ক এবং নিউ জার্সির গভর্নর উড্রো উইলসনের মধ্যে মনোনয়ন নিয়ে বিষম টানাপোড়েন চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্রায়ান-এর সমর্থন লাভ করে ৪৬ তম ব্যালটে উইলসন প্রার্থী মনোনীত হন।

ডেমোক্র্যাটিক দলের এই নূতন প্রার্থীর জন্ম ভার্জিনিয়ায়। তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, কিছুকাল কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরপর তিনি নিউজার্সির গভর্নর নির্বাচিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত আদর্শবাদী ও পণ্ডিত উড্রো উইলসন্ ছিলেন বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থ ও ট্রাষ্টগুলির বিরুদ্ধবাদী। তিনি আমূল সংস্কারের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বললেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার হলো কায়েমীস্বার্থ-গোষ্ঠীর স-পুত্র। একে নিজস্ব মত অনুযায়ী চলতে দেওয়া হয় না। ফলে ডেমোক্র্যাটদলের উদারনীতিকদের সমর্থনলাভের সম্ভাবনা রুজভেল্টের অবলুপ্ত হয় এবং নভেম্বরের নির্বাচনে উইলসন বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেন। উইলসন পেয়েছিলেন ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোট রুজভেল্ট পেয়েছিলেন ৪০ লক্ষের কিছু বেশি, টাফ্‌ট পেয়েছিলেন ৩৫ লক্ষ এবং সোস্যালিষ্ট প্রার্থী ইউজিন ভি, ডেব্‌স প্রায় ১০ লক্ষ।

দেশবাসীর মধ্যে যারা আশংকা করেছিল যে অধ্যাপক প্রেসিডেন্ট হয়ে হিমসিম খেয়ে যাবেন তারা কিন্তু পরে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলেন উইলসন শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিই নন, তাঁরও একটা বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি রয়েছে এবং তিনি নির্বাচনী প্রচার কার্যের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পুরাপুরি পালন করে চলেছেন।

নির্বাচনের অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে উইলসন ঘোষণা করলেন—“বাণিজ্য শুল্কের পরিবর্তন করতেই হবে। যা

কিছুর মধ্যে বিশেষ সুবিধা ও স্বার্থের সামান্য রেশ মাত্র রয়েছে তাকেই আমরা বর্জন করবো।" এরই ফলে প্রতিনিধি সভা এবং সেনেটে আণ্ডার উড্ শুল্ক আইন গৃহীত হয়। ৫০ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম শুল্ক হ্রাস করা হলো এবং এর ফলে বৈদেশিক শিল্প আমেরিকার বাজারে কমদামে পণ্য বিক্রী করে প্রতিযোগিতা করবার সুযোগ পায়। এতে রাজস্বের যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট টাফটের শাসনকালের শেষভাগে বিভিন্ন অংগ রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত শাসনতন্ত্রের ষোড়শ সংশোধন অনুসারে আয়করের নূতন ব্যবস্থা করেন।

তিনমাস পর জনসাধারণ কর্তৃক সেনেটরদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করবার জন্য সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনটি বিভিন্ন অংগরাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই সংশোধনের ফলে যে সমস্ত রাজনৈতিক কেষ্ট-বিষ্টুরা আইনসভা কর্তৃক সেনেটের নির্বাচনে খবরদারী করতেন তাদের প্রতিপত্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেলো।

উইলসন এর পর নজর দিলেন দেশের ব্যাংকিং প্রথার উপর। অতি পুরাতন এই প্রথায় বেসরকারী ব্যাংক ব্যবসায়ীরা দেশের ঋণ ব্যবস্থার উপর প্রায় পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন যে ব্যাংকিং প্রথার কর্তৃত্ব হবে সরকারের, বেসরকারী ব্যক্তিদের ওপর নয়। সরকারের হাতেই এর সমস্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে যাতে ব্যাংকগুলি ব্যবসায় এবং ব্যক্তিগত কাজ করবার ও উদ্যোগের নিয়ন্ত্রক হতে না পারে। ব্যাংকগুলির কাজ হবে এই সমস্ত বিষয়কে সার্থক করে তোলবার সহায়ক মাত্র। 'ফেডারেল রিসার্ভ অ্যাক্ট' অনুসারে দেশকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো। এর প্রত্যেকটি অঞ্চলে থাকবে একটি প্রধান ব্যাংক যার কাজ হবে ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুসারে মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা ও বাজারে মুদ্রা ছাড়া। ওয়াশিংটনে গঠিত হলো ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড। বোর্ডএর সদস্য হলেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব, কনট্রোলার অব দি কারেন্সী এবং প্রেসিডেন্ট মনোনীত ৬ জন ব্যক্তি। এই নূতন ব্যাংকিং প্রথায় মূলধন সরবরাহ করলো জাতীয় ব্যাংকগুলি যারা এই প্রথায় সদস্যপদভুক্ত হয়েছিল। এই নূতন প্রথার ফলে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা নূতন রূপ পেলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্যমান নিয়ন্ত্রণে এটি হলো এক অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ।

প্রেসিডেণ্টের সুপারিশক্রমে কংগ্রেস সাধারণ মানুষের স্বার্থে অনেকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করে। 'ক্লেটন অ্যান্টি ট্রাষ্ট' আইনে শ্রমিকের ধর্মঘট করবার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং এই আইন ব্যবসায়িকদের বিভিন্ন ব্যবসায়ের বোর্ড অব ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার নিয়ন্ত্রিত করে ফেলে। এইভাবে বোর্ড অব ডিরেক্টরগুলিকে পরস্পর সংবদ্ধ করে বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থের উদ্ভব হয়েছিল। উইলসন ফেডারেল ট্রেড কমিশন গঠন করলেন। কমিশনের কাজ হলো ব্যবসায়িক অসাধুতা সম্পর্কে তদন্ত করে কি পন্থা অবলম্বন করা হবে তার সুপারিশ করা। কৃষকদের জন্য তিনি গঠন করলেন বিভিন্ন ফেডারেল ফ্যাণ্ড ব্যাংক, যেগুলি থেকে তারা কম সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। বাণিজ্যিক নৌবহরের নাবিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হলো এবং তাদের কর্মকালীন সুযোগ সুবিধাও অধিকতর উন্নত করা হয়।

* * *

উইলসন একদা বলেছিলেন "আমার শাসন ব্যবস্থাকে যদি শুধুমাত্র পররাষ্ট্র বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাতে হয় তাহলে সেটা হবে ভাগ্যের পরিহাস।" যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট প্রচুর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে তার অভিজ্ঞতা ছিল না। আর ভাগ্যের পরিহাসে উইলসনকে দেশ শাসন করতে হয়েছিল এক বিরাট আন্তর্জাতিক গোলযোগের সময়।

প্রথমে এলো মেক্সিকোর বিপ্লব। অত্যাচারী হুয়ের্তা সরকার দখল করে প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল কারাঞ্জাকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ইউরোপের অনেকগুলি রাষ্ট্র মেক্সিকোয় অর্থলগ্নী করেছিল। হয়তো দেশের শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছে দেখে তারা সেই অত্যাচারী সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছিল। মেক্সিকোর স্বার্থের অনুকূলে যুক্তরাষ্ট্রকেও হয়তো সরকারকে স্বীকার করে নিতে বলা হোল।

কিন্তু আদর্শবাদী উইলসন হুয়ের্তার অমানুষিক নীতি সমর্থন করতে পারেন নি এবং তিনি দাবী করলেন যে হুয়ের্তার পদত্যাগ করুক। পরপর অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সৈন্যরা ভেরাক্রুজ বন্দরটি অবরোধ করে। হুয়ের্তা তখন কারাঞ্জার অনুকূলে পদত্যাগ করেন। এদিকে ভেরাক্রুজ অবরোধের ব্যাপারে পশ্চিম গোলার্ধের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অত্যন্ত আতংকিত হয়ে পড়ে।

মার্কিন গোলা বারুদ এবং রসদ নিয়ে কারাঞ্জা সরকার মেক্সিকোকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু এর ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে কারাঞ্জার নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী পাঞ্চোভিলা। পাঞ্চোভিলা তখন একদল অসমসাহসী লোককে সংহত করে আমেরিকানদের হত্যা করবার সংকল্প নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে আমেরিকার বহু সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। যুক্তরাষ্ট্র তখন ভিলা-কে তাড়া করে মেক্সিকোর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কয়েকমাস অনুসরণ করেও তারা তাকে ধরতে পারে নি এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত হয়।

মেক্সিকোর বিষয়ে যত গোলমালই হোক না কেন ইউরোপ প্রসংগে উইলসন যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন তার তুলনায় এটি কিছুই নয়। ১৯১৪ সালে জার্মানী মিত্ররাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সহযোগিতায় ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হয়। জার্মানীর অভিযোগ এই তিনটি রাষ্ট্র তাকে ঘিরে ধরেছে এবং তার সম্প্রসারণে অত্যন্ত বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই যুদ্ধের আশুকরণ হিসাবে দেখা দিল জনৈক সার্ভিয়ান দেশপ্রেমিক কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা করবার বিষয়টি। অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে শাসন করতে উদ্যত হয়, এদিকে রাশিয়া এগিয়ে আসে তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করবার জন্য আর জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষাবলম্বন করে। এই ভাবেই শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সংগে ইটালিও এগিয়ে আসে রাশিয়ার সাহায্যে। অপরদিকে তুরস্ক ও বুলগেরিয়া জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষভুক্ত হয়। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি অনুসারে নিজেদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে।

শুরুতে জার্মানরা প্রবল সাফল্য অর্জন করেছিল। তারা ক্ষুদ্র বেলজিয়মকে পর্যুদস্ত করে প্যারিস পর্যন্ত এগিয়ে আসে। এইখানেই তাদের প্রতিরোধ করা হয়েছিল। আমেরিকার জনসাধারণ দাম্ভিক কাইজার উইলহেলমের সমর শক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির গৌরবময় প্রতিরোধের সংবাদ অবগত হয়। স্বভাবতই তারা ফরাসী ও ব্রটিশের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে কারণ বহুদিন থেকেই এদের প্রতি তাদের একটা অন্তরের টান ছিল।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যেমন হয়েছিল তেমনি ভাবেই যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলি অপর পক্ষের বন্দরগুলি অবরোধ করে এবং যে সমস্ত নিরপেক্ষ

আমেরিকান জাহাজ যুদ্ধ এলাকায় গোলাবারুদ ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিল সেগুলিকে জবর দখল করে নেয়। ব্রিটিশ নৌবহর জলপথে প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। তারা শত্রুদেশাভিমুখী জাহাজগুলিকে শুধু মাত্র বাজেয়াপ্তই করছিল ধ্বংস করছিল না। কিন্তু জার্মানী সাবমেরিন নিয়োগ করে যুদ্ধ চালাতে থাকে। জার্মান ইউ-বোটগুলি জলের তলা থেকে আকস্মাৎ মাথা তুলে জাহাজের উপর টর্পেডো ছাড়তো এবং আবার জলে ডুবে পালিয়ে যেতো ফলে অসহায় নাবিকরা সেখানেই ডুবে মরতো।

আমেরিকানরা তাদের জাহাজগুলি ধ্বংস হওয়ায় রুষ্ট হয়েছিল। তবে তুলনামূলকভাবে তাদের জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল কম, কিন্তু বিদেশী যাত্রীবাহি জাহাজ যথা ইংলণ্ডের লুসিটানিয়া জাহাজখানির মতো জাহাজগুলি ডুবিয়ে দেবার ফলে বহু আমেরিকান নিহত হয়। লুসিটানিয়ার যাত্রী সংখ্যা ছিল পুরুষ, নারী ও শিশু মিলিয়ে সাড়ে বারো শত। যাত্রীদের মধ্যে আমেরিকানের সংখ্যা ছিল ১১৪ জন। ডুবো জাহাজের আঘাতে লুসিটানিয়া বিনষ্ট হয় এবং সকল যাত্রী মারা পড়ে। জার্মানরা এই টর্পেডো হানার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও ঘোষণা করলো যে যাত্রী ছাড়াও লুসিটানিয়া মিত্রশক্তির জন্য গোলা-বারুদ বহন করছিল।

ডুবো জাহাজের যুদ্ধ চালাবার বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট উইলসন বারম্বার জার্মানীর নিকট প্রতিবাদ করেন। জার্মানী অবশ্য মামুলীভাবে দুঃখপ্রকাশ করলেও তাদের কার্যকলাপ আমেরিকার পক্ষে উত্তেজনাকর হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকা মিত্রশক্তিকে প্রচুর ঋণ দিয়ে তাদের খাদ্য ও সামরিক দ্রব্যাদি সংগ্রহে সহায়তা করছে, এবং জার্মানী সহ অক্ষশক্তি তাদের কাছে পাচ্ছে সামান্য রসদ। এই বিষয়টি জার্মানীর উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জলপথে জার্মানী যতই নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করে আমেরিকার জনমত ততই তার বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছিল। যাই হোক ১৯১৬ সালে উইলসন চার্লস এভান্স হিউজকে পরাস্ত করে প্রেসিডেণ্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হন। "তিনি আমাদের যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেছেন" এই কারণেই তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ সম্পর্কে বেশিদিন নিস্পৃহ থাকা সম্ভব হল না। তারা জানতে পারল যে জার্মানরা মেক্সিকো ও জাপানকে তাতাচ্ছে যাতে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তাকে তারা আক্রমণ করে। অপরদিকে আমেরিকার

জার্মানীর গুপ্তচর বৃত্তি ও সমর সম্ভার নির্মাণের কারখানাগুলি ধ্বংসের প্রচেষ্টার প্রমাণও পাওয়া গেল। অবশেষে ইংলণ্ডকে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করবার জন্য জার্মানী ডুবোজাহাজের অবাধ আক্রমণের নীতি ঘোষণা করলে প্রেসিডেন্ট উইলসনের সুপারিশে ১৯১৭ সালের ৬ই এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধ ঘোষণার এই সমস্ত আশুকরণগুলি ছাড়াও উইলসন বিশ্বাস করতেন যে এই যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত মারমুখী সামরিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম। তিনি স্থির করলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার নীতি হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে এই যুদ্ধ-জয়ে সহায়তা করা এবং তার পর বিজয়ী এবং বিজিত সমস্ত রাষ্ট্রকে নিয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্বজনীনতা সৃষ্টির জন্য লীগ এর নেশনস্ গঠন করা। এইরূপ বিশ্ব-সংস্থার মাধ্যমে যুদ্ধের সমস্ত কারণ যথা জাতীয়বাদ, সাম্রাজ্যবাদ, মিতালীর মাধ্যমে শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণগুলি চিরতরে দূর করা হবে। এই হলো উইলসনের "চতুর্দশ দফার মূল সূত্র।" ১৯১৮ সালে তিনি এগুলিকেই সন্ধির সম্ভাব্য সর্ত হিসাবে ঘোষণা করেন।

এই সমস্ত উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রেখে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মিত্রশক্তি তখন দুর্বল হয়েছে কারণ পরাজিত রাশিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করছে। প্রেসিডেন্ট উইলসনকে তখন শ্রমশক্তি শিল্পগুলিকে সুসংহত করে উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করবার বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হলো। উভয় পক্ষই যাতে সহযোগিতা করে শিল্পমালিকরা মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সর্তাদি মেনে নিল এবং ইউনিয়নগুলি বেসরকারীভাবে হলেও ধর্মঘটের অধিকারের কথা ভুলে রইল।

আমেরিকার পক্ষে মিত্রশক্তিকে কোটি কোটি ডলার ঋণ দেওয়া কিংবা জাহাজ বোঝাই করে রসদ—বিশেষ করে খাদ্য সরবরাহ করা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু সৈন্য সরবরাহ করাই তাদের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকার সৈন্যবাহিনী তখন ক্ষুদ্র এবং নূতন করে বাহিনী গঠন করে তাদের সুশিক্ষিত করে তিন হাজার মাইলে দূরবর্তী রণাঙ্গণে পাঠান এক দুস্তর সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তবুও অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্রুততার সংগে তারা এটি সম্পন্ন করে। জার্মান এবং অষ্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিকরাও অন্যান্য নাগরিকদের সংগে বিনাদ্বিধায় এসে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। এক বৎসরের

মধ্যে জেনারেল জন জে. পার্সিং-এর নেতৃত্বাধীনে ফ্রান্সে মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হোল প্রায় সাত লক্ষ; ছয় মাস পরে এই সংখ্যা বিশ লক্ষে দাঁড়ায়। আমেরিকার এইভাবে দ্রুত শক্তি সংগ্রহে হতবুদ্ধি হয়ে অক্ষশক্তি ১৯১৮ সালের বসন্তকালে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করে দেবার জন্য এক সর্বাত্মক অভিযান সুরু করে। মিত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফ্রান্সের মার্শাল ফক্ যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই প্রতিরক্ষার জন্য মার্কিন সৈন্যদের নিয়োজিত করেন এবং এই সৈন্যরা অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সহযোগী বিদেশীদের প্রশংসা ভাজন হয়।

জার্মানীর অভিযান প্রতিরোধ হবার পর আমেরিকান সৈন্যদের একত্র করে একটি নূতন বাহিনী গঠিত হয় এবং রণাংগণের একাংশের ভার ছেড়ে দেওয়া হয় তাদের ওপর। আমেরিকান সৈন্যরা তীব্র আক্রমণ চালিয়ে জার্মানীর প্রতিরোধ ব্যূহ তছনছ করে ফেলে এবং এই দলের বারো লক্ষ সৈন্য নিউজ অরগন অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়। সমগ্র রণাংগণে জার্মানদের পরাজয় ঘটতে থাকে এবং ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর সন্ধির সংগে সংগে অবসান হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল পরে এবং তাদের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল অন্যান্যদের চেয়ে কম। তবুও সৈন্য অর্থ ও রসদ সরবরাহ করে আমেরিকানরা যে অবদান করেছিল তারই ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং "বিশ্বে গণতন্ত্র নিরাপদ হয়।"

* * * *

সন্ধির ফলে যুদ্ধ শেষ হয় এবং জার্মানী বাধ্য হয় কুক্ষিগত দেশগুলি থেকে সরে যেতে। অতঃপর প্রয়োজন রইল এক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের। প্রেসিডেন্ট উইলসন অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে স্থির করলেন শান্তিচুক্তিতে তার 'চতুর্দশ দফা' পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে যার ফলে রাষ্ট্রগুলি আর গোপন চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না, নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য হবে, জলপথে অবাধ বিচরণ করা সম্ভব হবে সকলের পক্ষে এবং সর্বোপরি লীগ অব নেশনস্ প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯১৯ সনের প্রথম ভাগে উইলসন শান্তি আলোচনায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকবার জন্য প্যারিস যাত্রা করেন।

আমেরিকার সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট সেনেটের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমেই মাত্র চুক্তি সম্পাদনের অধিকারী। নিজের কর্তব্য আরো সরল

করবার জন্য প্রেসিডেন্ট ১৯১৮ সালের নির্বাচনে সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের জয়ী করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আহ্বান বিফল হয়। রিপাব্লিকানরা সেনেটে সংখ্যাধিক্য লাভ করে। এদিকে প্রেসিডেন্ট শান্তি সম্মেলনে তাঁর সংগে সেনেটের প্রতিনিধিদের যাবার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় সেনেটররা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে যান।

বিদেশে গিয়ে উইলসন "বিগ ফোর" এর অন্তর্ভুক্ত অপর তিনজন অর্থাৎ ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের ক্লেমেসো, এবং ইটালীর অর্লাণ্ডোর সংগে সাক্ষাৎ করেন। এই দেশগুলি জার্মানী কর্তৃক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারই ফলে উইলসন বিজেতাদের সম্পর্কে যে উদার মনোভাব প্রদর্শন করছিলেন তার সংগে এদের মনোভাবের প্রবল প্রার্থক্য দেখা দেয়। তাঁরা চাইছিলেন জার্মানীকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, মিত্রশক্তির হাতে তুলে দিতে হবে কয়লা ও লৌহ খনিগুলি এবং উপনিবেশগুলি ত্যাগ করতে হবে। লীগ অব নেশনস্-এর স্বার্থে উইলসন এগুলির অধিকাংশ সর্তেই সম্মত হন।

ভার্সাই-এর সন্ধিচুক্তির মধ্যে লীগ অব নেশনস্ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। স্থির হোল সংস্থাটির একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য থাকবে নয়জন এবং ইংলণ্ড; ফ্রান্স; যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী ও জাপান হবে এই কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য। কাউন্সিলের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই কার্যকরী করতে হবে নয়জন সদস্যের সম্মতি-ক্রমে। পররাষ্ট্র আক্রমণ বেআইনী ঘোষণা করা হোল। স্থির হোল কোন রাষ্ট্র অপর কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কাউন্সিল তার সুপারিশ করবেন।

এই বিধি ব্যবস্থা প্রথম হবে সমবেত অর্থনীতিক বয়কটের রূপে এবং তা ব্যর্থ হলে সামরিক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা চলবে। কাউন্সিল ব্যতীত থাকবে পরামর্শদাতা পরিষদ, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ।

১৯১৯ সালের জুন মাসে লীগ অব নেশনস সমন্বিত ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে মিত্রপক্ষ ও জার্মানী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য জার্মানী প্রতিবাদ জানায় যে এতে উইলসনের ন্যায়ানুগ শান্তি পরিকল্পনা অবহেলিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট উইলসনই প্রথম চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো তিনি যথাসাধ্য

করেছেন এই চুক্তি ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ করবে। স্বাক্ষরের পর তিনি সেনেটকে অনুরোধ জানালেন তাঁর এই কার্য অনুমোদন করতে।

কিন্তু উইলসনের এই সুপারিশ ব্যর্থ হলো। সেনেটররা অনেকেই উইলসন কর্তৃক অপমানিত হয়েছেন বলে মনে করলেন। অনেকে নীতিগতভাবে চুক্তির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আপত্তি তুললেন। আবার অনেকে সামগ্রিকভাবে লীগ অব নেশনসের বিরোধিতা করলেন। তারা ভাবলেন এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আংশিক ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বৃটেন ও তার সাম্রাজ্যগুলির যেখানে ছয়টি ভোট, সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রই বা কেন একটি মাত্র ভোট পাবে? আবার যোগ দিলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশী ব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়বে না তো? ম্যাসাচুসেট্সের সেনেটর হেনরী ক্যাবট লজ-এর নেতৃত্বে রিপাব্লিকানরা চুক্তির কয়েকটি সংশোধন দাবী করল, অন্যথায় তারা প্রেসিডেন্টের কার্য অনুমোদন করবে না।

উইলসন এতে রাজী হন নি। তিনি বললেন যে কোন রকম সংশোধন হলেই চুক্তির জোর কমে যাবে। অতঃপর তিনি প্যারিস থেকে দেশে ফিরে এসে সেনেটারদের তোয়াক্কা না রেখে জনসাধারণের দ্বারস্থ হলেন। অতিরিক্ত খাটুনির ফলে প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন। বক্তৃতা সফরকালে একদিন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন আর কোনদিনই পূর্ণোদ্যমে সরকারী কাজ চালাবার ক্ষমতা ফিরে পান নি। প্রেসিডেন্ট আপোষ করেন নি এই অভিযোগ করে সেনেট চুক্তি প্রত্যাখান করল। এদিকে অপরাপর মিত্রশক্তি তখন তা অনুমোদন করেছে। দু বছর পরে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর সঙ্গে পৃথক একটি চুক্তি করে।

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার তাদের মুখ্য ভূমিকা সম্পর্কে আমেরিকানরা তখন অনেকটা নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে। উইলসন দুঃখ করে বললেন: "বিশ্বনেতৃত্ব করায়ত্ব করার একটা সুযোগ আমাদের এসেছিল। সে সুযোগ আমরা হারিয়েছি। আর এর দুঃখময় ফল আমরা প্রত্যক্ষ করব অল্প কালের মধ্যেই।"

নবম অধ্যায়

স্বাভাবিক অবস্থার পুনরাবির্ভাব ঃ 'নিউ ডিল'

১৯১৮ সালে যুদ্ধ বিরতির পর যুদ্ধ চালাবার জন্য সরকার প্রচুর টাকা তুলেছিলেন, তার ফলে জাতীয় ঋণের পরিমাণ অনূর্দ্ধ একশ কোটি ডলার থেকে বেড়ে সওয়া পঁচিশ শত কোটি হয়েছে। যাই হোক, আশা করা গিয়েছিল মিত্রশক্তিরা প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করলে জাতীয় ঋণের এক হাজার কোটি ডলার শোধ করা যাবে।

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে কমিউনিষ্টরা রাশিয়ার শাসনভার দখল করেছে। তারা তখন দেশের উপর কর্তৃত্ব আরও কঠোর করতে চলেছে। অপর দিকে গোপন ইউনিট অথবা সেনাগুলির মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় কমিউনিষ্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকার জনমনে তাই ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। কে যে কমিউনিষ্ট আর কে নয় তা বোঝবার কোন উপায় নেই। বিশেষ করে তখন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্ল্ড নামে একটি বামপন্থী সংস্থা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থিত। এই যুগ থেকে শান্তি-কালীন উৎপাদন ব্যবস্থার যুগের মধ্যে বহু চরমপন্থী ও অসন্তোষ সৃষ্টিকারীকে আমেরিকার জেলে পোরা হয়েছিল ও দেশান্তর করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সময়কার শ্রমিক অসন্তোষের মূল কারণ ছিল যুদ্ধের সময় পণ্যের অপ্রতুলতার দরুন মূল্য বৃদ্ধি। জীবনযাত্রার বর্ধিত ব্যয়ের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য শ্রমিকরা দাবী জানাল মজুরী বৃদ্ধির। জন-এল. লুইসের নেতৃত্বে কয়লাখনির শ্রমিকরা কয়েকমাস ধর্মঘট চালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সরকার একটা রফা করতে সমর্থ হন।

১৯১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উনবিংশ সংশোধনটি গৃহীত হয়। এতে সুরাসার মিশ্রিত বলকারক পানীয় তৈরী ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর ফলে পানদোষ বৃদ্ধি পেল। কারণ লুকিয়ে সুরাপানের মজা লুটতে লোকে উঠেপড়ে লেগে গেল। বেআইনিভাবে মদের ব্যবসায় বেশ ফেঁপে উঠতে লাগল, আর এই বাজার দখল করবার জন্য সুরু হয়ে গেল গুণ্ডাদের মধ্যে মারামারি।

সমগ্র দেশটারই যেন নৈতিক অধঃপতন ঘটল। যুদ্ধফেরত সৈন্যরা ফিরে এসে মেতে উঠল হুল্লোড়ে, যে তাদের অনুপস্থিতির লোকসান সুদে-আসলে তুলে নিচ্ছে। এই সময় সাময়িক অর্থনৈতিক মন্দাও এই অধঃপতন রোধ করতে পারেনি। অপর দিকে কৃষিজীবিদের দুর্দশা যথাযথই রয়ে গেল।

১৯২০ সালের নির্বাচন। প্রশ্ন উঠল স্বদেশে উইলসনের "নয়া স্বাধীনতা" দেশে ও বিদেশে লীগ অব নেশন্স-এর নীতি নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত অথবা রিপাবলিকানদের "স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার" নীতি অনুসরণ করা বিধেয়। শেষোক্তটির অর্থ হল প্রাক-যুদ্ধ যুগে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ মার্কিন শিল্পকে বাঁচাবার জন্য উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক প্রবর্তন, আন্তর্জাতিক বিষয়ে যথাসম্ভব কম জড়িয়ে পড়া, অধিকতর আত্মকেন্দ্রিকতা এবং মোটা-মুটিভাবে নিজেদের জগৎ থেকে পৃথক করে রাখা। এবছর নির্বাচনে মেয়েরাও অংশ নিলেন। বহু বছর আন্দোলন করে সংবিধানের উনবিংশ সংশোধনীতে তারা ভোটাধিকার পেয়েছেন।

নির্বাচনের ফলাফল থেকে বোঝা গেল জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ ও বিশ্বরক্ষার মোহ কেটে গেছে। রিপাবলিকান প্রার্থী ওহায়োর সেনেটের ওয়ারেন জি, হার্ডিং তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওহায়োর গভর্নর জেমস এম, কক্সকে পরাস্ত করেন। সুঠাম চেহারার অমায়িক হার্ডিং ছিলেন একটি

ছোট সহরের সংবাদপত্র সম্পাদক। তাকে দেখে মনে হল ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি দেশকে নির্ঝঞ্ঝাটে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

রিপাবলিকানরা শাসনভার গ্রহণ করেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমতো আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করে, এবং দেশের চারিদিকে সৃষ্টি করে এক দুর্ভেদ্য অর্থনৈতিক বেড়াজাল। দেশের অভ্যন্তরে এর ফল ভালই হয়েছে মনে হল—শিল্পগুলির মুনাফা হতে থাকল, কাজ হতে থাকল কলকারখানায়, লোকে পেল চাকরী, কিন্তু অন্যদিকে আমেরিকার বাজারে তখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রবেশ করতে পারছে না। পারলে তাদের পক্ষে মাল বিক্রী করে ডলারে ঋণ শোধ করা সম্ভব হত। অর্থনীতিবিদরা বারংবার যুক্তরাষ্ট্রকে এই বলে সতর্ক করলেন যে ঋণ শোধ পেতে হলে শুল্ক কমাতে হবে।

নিজেদের একান্ত নিভৃতে রাখার নীতির সঙ্গে তাল রেখে যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর অত্যন্ত কঠোরভাবে বহিরাগত আগমন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকল। শতাব্দীর প্রথমে যেখানে দলে দলে লোক এসেছিল বসতি করতে, সেখানে এখন আসতে থাকল মাত্র দুচার জন। যুক্তি দেখান হল এর ফলে আমেরিকানদের কাজ পাবার সুযোগ হবে অপরিসীম। বিদেশী সব কিছু সম্পর্কে তখন দেশে যেন পাগলামি সুরু হয়েছে, তারই ফলে বহিরাগত আইন আরও কঠোর হল।

যাই হোক না কেন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে একযোগে অস্ত্রসজ্জা হ্রাস এবং বিশ্বশান্তি অধিকতর ব্যাপক করার জন্য চেষ্টা করতে থাকলো। লীগ অব নেশনস্-এর আওতার বাইরে থেকেও প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-এর শাসনকালের পররাষ্ট্র সচিব চার্লস এভান্স হিউজ ১৯২১-২২ সালে বিদেশী শক্তিগুলিকে ওয়াশিংটন সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেন। সম্মেলনে নৌশক্তির কলেবর হ্রাস করা হল সর্বসম্মতিক্রমে। এছাড়াও কতকগুলি চুক্তির মাধ্যমে চীন দেশ ও দূর প্রাচ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে গোলমাল যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হোল এবং যুদ্ধের সময়ের সওদাগরী জাহাজের ওপর ডুবো জাহাজের আক্রমণ বে-আইন ঘোষণা করা হয়। প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-এর শাসনকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল এই ওয়াশিংটন সম্মেলন। তবে তার শাসনকালে এমন কতকগুলি কুৎসামূলক ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে তার স্বার্থকতা ম্লান হয়ে যায়। প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার ডিরেক্টর প্রায় দুই

লক্ষ ডলার তছরুপ করার অপরাধে কারাগারে প্রেরিত হন। অপর দুই জন দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী তদন্ত এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনাটি হয় যখন স্বরাষ্ট্র সচিব অ্যালবার্ট ফল প্রেসিডেন্টকে প্ররোচিত করে নৌবাহিনীর অধীনস্থ বহুল পরিমাণ তৈলখনি স্বরাষ্ট্রদপ্তরের অধীনস্থ করেন। ফল, অতঃপর এই সমস্ত খনি বে-সরকারী তৈল ব্যবসায়ীদের কাছে হস্তান্তরিত করেন পরিবর্তে তিনি বহু অর্থ পান। এরজন্য ফল অতঃপর একবৎসর কারাদণ্ড ও একলক্ষ ডলার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে আলাস্কা পরিভ্রমণ করে ফেরবার পথে প্রেসিডেন্ট হার্ডিং অকস্মাৎ মারা যান। ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজ প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কুলিজ ছিলেন নিউ-ইংলণ্ডের লোক। অত্যন্ত কঠোর এবং সৎ প্রকৃতির এই ভদ্রলোক ছিলেন কিছুটা সংরক্ষণশীল।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যুক্তরাষ্ট্র সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। ফলে আয়করের পরিমাণ হ্রাস হলেও রাজকোষে রাজস্ব আমদানীর পরিমাণ বেড়ে যায়। জাতীয় ঋণ ২৫শত কোটি ডলার থেকে কমে ১৬০০ কোটি ডলার হয়। প্রেসিডেন্ট কুলিজ এতে অত্যন্ত সন্তোষবোধ করেন।

সমৃদ্ধির এই স্বর্ণময় যুগে ব্যাপক হারে পণ্যউৎপাদন করা হোত। মোটর গাড়ী, রেফ্রিজারেটর, কাপড় ধোবার যন্ত্র, রেডিও ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে তৈরী হতে থাকে। এদিকে উৎপাদন ব্যবস্থাও ক্রমশঃ ত্রুটিহীন হয়ে ওঠে।

প্রধানতঃ শ্রমিকরাই তাদের এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করত। শিল্পপতিরা ধরে নিয়েছিলেন যে, পণ্যের কাটতি বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়ানোর দরকার। এইভাবে পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে, দেশে আর গরীব লোক থাকবে না, এবং অনেকে বললেন যে অল্প দিনের মধ্যেই দেখা যাবে যে প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্ততঃ দুখানা মটর গাড়ী রয়েছে।

এই সমৃদ্ধির যুগে শিল্পপতিরা যুগের সংগে তাল রেখে পণ্যের বিজ্ঞাপনের দিকে বিশেষ নজর দেন। বেতার যন্ত্র এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁরা জনসাধারণের চোখের সামনে প্রতিটি পণ্যের ব্যবহারিক গুণাগুণ তুলে ধরতে লাগলেন। তাঁরা আরো ব্যবস্থা করলেন যাতে বেশী দামের জিনিস নগদ কিনতে না হয়, কিস্তিবন্দী ক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা।

তবুও দেখা গেল আমেরিকার বিশাল বাজারও উৎপাদিত পণ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন দেখা দিল বিদেশে পণ্য রপ্তানী করবার। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল অর্থের লেনদেন নিয়ে। সমাধানের অন্যতম পথ হোল দেশের আমদানী শুল্ক কমিয়ে বিদেশী শিল্পের পক্ষে আমেরিকায় ব্যবসায়ের পথ সুগম করা। তাহলে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি আমেরিকায় পণ্য বিক্রী করে পরিবর্তে আমেরিকান পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। অপর পন্থা হোল আরো ঋণ দেওয়া যাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলিকে দেনায় জড়িয়ে পড়ে মার্কিন পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হোল নিজের দেশের শিল্পকে রক্ষা করা। তাই তারা দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করে একদিক যেমন ঋণ দেওয়া বাড়িয়ে দিল তেমনই সেই সব রাষ্ট্রে মাল চালান দিতে থাকলো।

১৯২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জয়লাভের পথে কোন বাধাই আসে নি। ক্যালভিন্ কুলিজ ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জন ডাব্লিউ ডেভিসকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট পদে সহজেই পুনর্নির্বাচিত হন। এই সময়ে প্রগতিশীল একটি নূতন দলের উদ্ভব হয়েছিল। লা, ফোলেট-এর নেতৃত্বাধীন এই দলটির নাম হোল প্রগ্রেসিভ পার্টি। কিন্তু এদের পরিকল্পনা জনসাধারণ গ্রহণ করেনি। কুলিজ পেয়েছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ ভোট, ডেভিস ৮০ লক্ষ এবং প্রগ্রেসিভ পার্টি মাত্র ৫০ লক্ষ।

যাই হোক, দেশের সর্বত্র কিন্তু তবুও অসন্তোষ বজায় রইল। কৃষিজীবীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। যুদ্ধের সময় তাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল যতো বেশি সম্ভব উৎপাদন করতে। তারি ফলে তারা নূতন যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ করে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু যুদ্ধের পর দেখা গেল উৎপাদিত খাদ্য শস্য ও মাংসের আর তেমন বাজার নেই। বিশ্বের বাজারে সেগুলির দাম অত্যন্ত পড়ে গিয়েছে। অপরদিকে সরকারও উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কৃষকদের সাহায্য করতেও অস্বীকৃত হন। ম্যাকনারি-হগেন বিল-এ চাষীদের এই ধরনের সাহায্য দেবার কথা ছিল। প্রেসিডেন্ট ভেটো প্রয়োগ করে বিলটি বাতিল করে দেন এবং বলেন যে কৃষি শিল্পকে স্বাবলম্বী হবার জন্য সরকার ঋণ দিতে পারেন কিন্তু উদ্বৃত্ত পণ্য সম্পর্কে সাহায্য দিয়ে চাহিদাও সরবরাহের প্রাকৃতিক নিয়ম ভংগ করতে তিনি রাজী নন।

কুলিজ-এর শাসনকালের শেষ বৎসরে কর্নেল চার্লস্-এ লিণ্ডবার্গ সর্বপ্রথম নিউ-ইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্যন্ত একটানা বিমান চালিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। ওই সময়েই যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করে কেলগ-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফরাসী ও আমেরিকানদের আহ্বান মতো প্রায় ৫০টি রাষ্ট্র ঘোষণা করে যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া তারা আর অস্ত্র ধারণ করবে না। চুক্তি কার্যকরী করবার সময় বিশ্ববাসীর মনে হল বিশ্বশান্তি বুঝি-বা স্থায়ী হয়েছে।

১৯২৭ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট কুলিজ সরে দাঁড়ান। তার পরিবর্তে রিপাব্লিকান পার্টি প্রার্থী মনোনীত করেন বাণিজ্য সচিব হার্বার্ট সি, হুভারকে। হুভার একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকার ব্যবসায় উন্নতিকল্পে বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে বিদেশের বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তিনি। হুভার ছিলেন একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির ও কেতাদুরস্ত। সবাই মনে করল যে তিনি বিচক্ষণতার সংগে দেশকে অধিকতর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা প্রার্থী মনোনীত করল নিউইয়র্কের গভর্নর অ্যালফ্রেড ই স্মিথকে। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে তিনি রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। স্মিথ ছিলেন রোমান ক্যাথলিক এবং তিনি চেয়েছিলেন ফেডারেল সরকার কর্তৃক জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন। এতে অবশ্য বিশেষ কাজ হয় নি। স্মিথের ধর্মমত এবং মাদক নিবারণের প্রতি ঝোঁক থাকায় নির্বাচন ক্ষেত্রে তার পরাজয় ঘটেছিল। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি বরাবরই ডেমোক্রাটদের ভোট দিলেও উল্লিখিত কারণগুলির জন্য তারা ভোট দিতে বিরত হয় এবং আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলের প্রোটেষ্টাণ্টরাও স্মিথের প্রতি বিরূপ হয়েছিল। সবাই বলাবলি করতে লাগলো স্মিথ জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করবেন ইটালীর ভ্যাটিকান প্রাসাদ থেকে মহামান্য পোপ।

নির্বাচনে হুভার বহু ভোটে জয়ী হন, গৃহ যুদ্ধের পর বহু দক্ষিণী রাষ্ট্র এইবারই প্রথম রিপাব্লিকান প্রার্থীকে ভোট দিল। কার্যভার গ্রহণের সময় নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন—"দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার মনে কোনরূপ আশংকা নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জল।"

দেশের সর্বত্রই বেশ আস্থা বিরাজ করছে তখন। অর্থ রোজগারের নূতন

পন্থাও দেখা গিয়েছে। বড়ো বড়ো ব্যবসায় কর্পোরেশনের শেয়ার তখন বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। আর ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির সংগে সংগে শেয়ারেরও দাম বেড়ে চলেছে। দেশে শেয়ার কেনা বেচার একটা প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা দিল, অল্প পরিমাণ কিস্তি দিয়েও লোকে শেয়ার কিনল এবং পরে বিক্রী করে বেশ মুনাফা করতে থাকলো। এইভাবেই শেয়ারের দাম প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেল।

শেয়ার নিয়ে এই যে ফাটকাবাজী চলল তারই ফলে ১৯২৯ সালের শরৎ-কালে অকস্মাৎ সবকিছু ভেংগেচুরে তছনছ হয়ে যায়। শেয়ারের এই উচ্চমূল্যের ফলে ব্যাংক ব্যবসায়ীরা এবং জনসাধারণ ইতিমধ্যেই বেশ শংকিত হয়ে উঠেছিল। এই আশংকার ফলেই প্রবল মন্দার সুরু হয়। প্রচণ্ড সমৃদ্ধির থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ এক গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দায় উপনীত হল। ১৯শে অক্টোবর সর্বপ্রথম শেয়ার বাজার তছনছ হয়ে গেল।

এই গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে তখন দেশের লোক ভাবতে বসল। তারা ভাবল অর্থ লোকসান হয়েছে ঠিক কিন্তু শিল্পের তো কিছু হয় নি। কারখানাগুলি এখনও যথাযথ রয়েছে। সেগুলি ধ্বংস হয় নি। অতএব ভাববার কিছু নেই। লোকসান যা হয়েছে তা নিতান্ত সাময়িক।

এই ছিল আশাবাদীদের মত। তারা বুঝতে পারে নি যে পণ্যের বিলিব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে গলদ এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও কমে গেছে। ফলে কাটতি আর হচ্ছে না। শেয়ার বাজারে বিপর্যয়ের ফলে পণ্যের বাজারেও প্রবল মন্দা দেখা দিল। মটর গাড়ী, পোষাক আষাক প্রভৃতি ক্রয় করা বন্ধ করে দিল জনসাধারণ, শিল্প ব্যবস্থা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে গেলো। উৎপাদন হ্রাস পেলো, বহু কারখানা বন্ধ হোল, বেকার হোল লক্ষ লক্ষ লোক, খয়রাতী লঙ্গরখানায় ভীড় করে দাঁড়াল লোকজন। ১৯৩২ সালের শেষভাগে দেখা গেল দেশে ২ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি লোক বেকার হয়েছে, বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়েছে, বন্ধকী কারবার উঠে যাবার দাখিল। সমগ্র দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার মনে হোল।'

দেশে এই গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দার ফলে আমেরিকা বিদেশে ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং আমদানী শুল্ক ভীষণভাবে বৃদ্ধি করে। স্মুট-হলি আইন অনুসারে বাণিজ্য শুল্ক ইতিপূর্বে এত অধিক পরিমাণে আর কখনো বাড়ানো

হয় নি। জার্মানীতে প্রবল অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং ফ্যাসীবাদী অ্যাডল্ফ হিটলার দেশের কর্ণধার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইংলণ্ড তার মুদ্রামানের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি প্রচণ্ডভাবে হ্রাস করে দেয়, মূল উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানী বৃদ্ধি করা। অপরদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে জাপান এই বিপর্যয়ের সুযোগে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে চীনের হাত থেকে সেই অংশটি কেড়ে নেয়। জাপানের এই কার্য কেলগ-ব্রিয়াণ্ট চুক্তি ও অন্যান্য সন্ধির পরিপন্থী।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রথমভাগে প্রেসিডেণ্ট হুভার জনসাধারণকে এই বলে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন যে অবস্থা সত্যই তেমন কিছু গুরুতর নয়, দেশে ইতিপূর্বেও এরূপ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল এবং দেশের সমৃদ্ধি ফিরে আসতে বিশেষ দেরী হবে না। কিন্তু দুর্দশা বেড়েই চলল। প্রেসিডেণ্ট হুভার তখন অর্থনৈতিক নীতিগুলির প্রাকৃতিক অনুশাসনে আর আস্থা না রেখে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হলেন। তিনি বৈদেশিক যুদ্ধ ঋণ আদায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার ব্যবস্থা করলেন এবং দুঃস্থ ব্যাংকগুলি রেল ব্যবসায় ও অন্যান্য শিল্পগুলিকে ঋণ দেবার জন্য কংগ্রেসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কর্পোরেশন গঠন করেন। অপরদিকে যে সমস্ত লোকের ভিটাবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাদের সাহায্য করবার জন্যও তিনি আর একটি ঋণ সংস্থা গঠন করেন। সমগ্র দেশ তখন নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে এবং বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। ফলে প্রেসিডেণ্ট হুভারের কার্যধারা লোকের মনে আস্থার সৃষ্টি করতে পারে নি। এ কারণ ১৯৩২ সালের নির্বাচনে হুভার যখন পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হলেন তখন স্পষ্টতঃই বোঝা গিয়েছিল যে তিনি আর নির্বাচিত হতে পারবেন না।

* * *

নিউ-ইয়র্কের গভর্নর ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলে ডেমোক্র্যাটরা শাসন ক্ষমতায় আবার ফিরে আসে। ফ্রাংকলিন ছিলেন থিয়োডোর রুজভেল্টের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিভ্রাতা। তিনি এক সম্প্রদায় খনেদী বংশের সন্তান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, উইলসনের আমলে ছিলেন নৌদপ্তরের উপসচিব এবং ১৯২০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদল

মনোনীত ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। রুজভেল্ট শিশু পক্ষাঘাতে ভুগেছিলেন এবং ফলে তার চলাফেরা করতে অত্যন্ত কষ্ট হোত।

ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলো পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করবার কথা, কৃষক ও বেকারদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য দানের পরিকল্পনা, ব্যাংক ও শেয়ার বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, মাদক নিবারণ আইন বাতিল এবং সরকারী ব্যয় হ্রাসের প্রতিশ্রুতি। একমাত্র শেষোক্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়া অন্য সব কিছু সরকার অত্যন্ত বলিষ্ঠ নীতির সংগে কার্যকরী করেছিলেন। বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সংকুচিত করে সেখানে দেখা দিল সরকারী কার্যকলাপ; সরকার তখন জনজীবনে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল, তাদের অর্থের যোগান দিল, কর বৃদ্ধি করল, শিল্পক্ষেত্রে মজুরী ও পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করল এবং ফসল বোনার ব্যাপারে কৃষকদের সুপরামর্শ দিতে এগিয়ে এলো। এ সবই ছিল প্রেসিডেন্টের প্রতিশ্রুত নূতন ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

প্রেসিডেন্ট ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে তাঁর অভিষেক ভাষণে ঘোষণা করলেন যে মনের ভয় ছাড়া আর কিছুকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান ছিল এক বিরাট আতংক। বহু ব্যাংক তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং নগদে ছাড়া কারবার একেবারে হচ্ছে না। এই সময়ে প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন এবং ব্যাংকগুলির কাজে ছুটি দিয়ে সেগুলির কারবারের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করালেন। যে সমস্ত ব্যাংককে বাঁচিয়ে রাখবার সম্ভাবনা ছিল সেগুলিকে প্রয়োজনমতো ঋণ দিয়ে খুলবার অনুমতি দেওয়া হলো, আর যেগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব নয় সেগুলি গুটিয়ে ফেলা হয়।

অল্প কিছুদিন পরেই প্রেসিডেন্ট দেশের সমস্ত সোনা ও রূপা সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা দিয়ে দিলেন। এর ফলে দেশে আর স্বর্ণমান রইল না কাগজের নোটও আর সোনায় পরিবর্তিত করতে পারা গেল না। অপরদিকে সরকারের হাতে প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুত থাকায় দেশের মুদ্রাব্যবস্থা যথেষ্ট স্থিতিশীল হয়ে রইল। ডলারের স্বর্ণমান কমে যাওয়া বা কাগজের নোট বেশি চালু হওয়ারও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া এর উপর হয় নি। সরকার তখন আপন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কিছুটা মুদ্রাস্ফীতি হতে দিয়েছিলেন, আশা ছিল তার দ্বারা দেশের পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হবে এবং ব্যবসাও তেজী হয়ে উঠবে।

পুনর্গঠন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। তিনি আশা করলেন যে শিল্পপতিরা এই সাহায্য থেকে যে উপকার পাবে তা জনসাধারণের মধ্যেও তারা বণ্টন করবেন। প্রেসিডেন্ট এছাড়াও জনসাধারণকে সরাসরি সাহায্য করে তাদেন ক্রয় ক্ষমতা বাড়াবার প্রয়াস পান। এককথায় বলতে গেলে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুই প্রান্তে অবস্থিত শিল্পপতি ও জনসাধারণকে সাহায্য দিয়ে দেশকে পুনরায় স্বাবলম্বী করে তোলা।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠণ সংস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা সাহায্য পেলো, সংস্থা সাহায্য করলো দেউলিয়া হতে চলেছে এমন সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে। তবে এর চেয়েও শিল্পগুলির পক্ষে অধিকতর সহায়ক হয়েছিল জাতীয় শিল্প পুনর্গঠন আইন। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল শিল্পগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধ করে এই দুঃসময়ে পণ্য মূল্য হ্রাস রোধ করা। ১৯৩৩ সালে জাতীয় শিল্প পুনর্গঠন আইন যখন চালু হোল তখন মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষই তাতে সন্তুষ্ট হয়।

এই আইন অনুসারে শিল্পপতিরা পরস্পর বিভিন্ন চুক্তি ও আচরণবিধি প্রণয়ন করে। এগুলির উদ্দেশ্য হোল যাতে বিভিন্ন শিল্পের একই ধরনের পণ্যে একই রূপ মূল্য থাকে, শিল্পগুলির আচরণে অসাধুতা না থাকে, এবং শ্রমিকদের কাজের সময় ও মজুরীর হার নির্ধারণ করা। প্রেসিডেন্টের পক্ষে বিশেষজ্ঞরা এই সমস্ত চুক্তি ও আচরণবিধি পরীক্ষা করে দেখতেন এবং সন্তোষজনক বিবেচিত হলে সেগুলি কার্যকরী করা হোত। এছাড়া শিল্পপতিরা যেমন পারস্পরিক সুবিধার জন্য জোটবদ্ধ হবার সুযোগ পেল তেমনই তাদের স্বীকার করে নিতে হোল ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের যৌথ চুক্তি করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি বিধানের অধিকার।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপর প্রান্তে অবস্থিত ছিল যে সাধারণ মানুষ তাদের সাহায্য করবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হোল। এই ব্যবস্থাগুলির সুপারিশ করতেন একদল অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিতেন। ইতিহাসে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকার দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করবার জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় জরুরী ত্রাণ তহবিল জনসাধারণকে সরাসরি এই ঋণ দিত। তবে প্রত্যক্ষভাবে তারা নগদ টাকা পেত না। নানারকম

কাজ-কারবারের মাধ্যমে তাদের হাতে এই অর্থ আসত। রাস্তা নির্মাণ, জঙ্গল তৈরী, সরকারের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের হাতে অর্থ আসতে লাগলো। আবার তাদের কেরাণী, লেখক, শিল্পী প্রভৃতি কাজও জুটিয়ে দেওয়া হতে লাগলো।

কৃষকদের সাহায্য করবার জন্য হোল কৃষি সামঞ্জস্য আইন। এর ফলে ব্যবস্থা হোল যাতে খামারগুলির উৎপাদন হ্রাস পায় এবং উদ্বৃত্ত হয়ে পণ্যমূল্য কি পরিমাণ দেয়। অধিক শস্য উৎপাদন ও গৃহপালিত পশুর অধিক বৃদ্ধি না করবার জন্য কৃষকদের অর্থ দেওয়া হতো, বহু ক্ষেত খামার পতিত পড়ে রহিল এবং নষ্ট করে ফেলা হোল উদ্বৃত্ত ফসল। সরকারের এই নীতির প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে বহু ক্ষেত্রেই খাদ্যাভাব ছিল। কিন্তু তবুও তাদের সেগুলি দেবার কোন উপায় ছিল না।

এর পর সরকার টেনসী নদীর উপত্যকায় এক বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের ৭০ হাজার বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এই পরিকল্পনার কাজ হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওই অঞ্চলে অর্থাৎ এ্যালবামার মাস্‌ক্‌ শোলসে একটি বাঁধ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। শান্তি স্থাপিত হবার পর সেগুলি বিক্রী করে দেবার প্রচেষ্টা হয় কিন্তু কোন ফললাভ হয় নি। ১৯৩৩ সালে সরকার টেনেসি ভ্যালী অথরিটি (টি. ভি. এ.) গঠন করেন। এটি সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সংস্থা। সংস্থাটি গঠিত হয় এখানে সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার জন্য। টি. ভি. এ. ওই অঞ্চলের উন্নতির জন্য আরো কয়েকটি বাঁধ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এর ফলে সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি পায় জনসাধারণ এবং ওই অঞ্চলে বন্যার তাণ্ডবলীলা রোধ হয়। অতঃপর সেখানে কৃষি বিশারদদের পাঠিয়ে জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া হয় কি করে ভূমি সংরক্ষণ করতে হয় এবং কি করে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই অনুন্নত অঞ্চলটিতে কলকারখানা গড়ে ওঠে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নূতন খামারগুলি।

অতঃপর "নূতন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার জনসাধারণের আপদ বিপদ দূর করবার কাজে ব্রতী হন। বিধিবদ্ধ হয় সামাজিক নিরাপত্তা আইন। সরকারের এই কার্যসূচী আজিও বর্তমান। এ'র মাধ্যমে ব্যবস্থা হয়েছে শ্রমিকদের জন্য বেকার বীমার, বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন, অনাথ পোষ্যদের জন্য

সাহায্য এবং অন্ধ ও আতুরের জন্য ব্যবস্থাবলী। এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার অর্থ দিয়ে থাকেন। তেমনি অর্থ দিয়ে থাকেন শ্রমিক, মালিক, রাজ্য সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি।

• • •

নূতন ব্যবস্থাপনার অধিকাংশই হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে এবং তৎকালীন আশু প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে। একথা কর্মকর্তারাই পরে স্বীকার করেছেন। আমেরিকার জনসাধারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই বাৎসল্য ব্যবস্থা কিভাবে নিয়েছিলেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণ অত্যন্ত কৃতার্থ হয়েছিল এর ফলে এবং, অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও, যে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল রুজভেল্ট হলেন তাদের কাছে আদর্শ মানুষ। কৃষিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণী তার নেতৃত্ব পুরাপুরি মেনে নিল।

অপরদিকে সংখ্যালঘু হলেও আমেরিকানদের এক বিরাট অংশ যাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ ব্যবসায়ী তারা ক্রমে ক্রমে নূতন ব্যবস্থাপনার প্রতি সমর্থন হারিয়ে ফেললেন এবং তার তীব্র বিরোধিতা করতে সুরু করেন। তাদের বক্তব্য সরকার দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করে খুব ভাল করেছেন সন্দেহ নাই এবং এর ফলে ব্যবসায়েও আবার তেজীভাব আসতে সুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হোল এই অর্থ আসছে কোথা থেকে? করের পরিমাণ প্রচুরভাবে বেড়ে গেলেও এটা আশা করা যায় না যে কর আদায় করে এতগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য নির্বাহ করা সম্ভব। এইদল আরো বললেন যে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা আর স্বর্ণমানের ভিত্তিতে নেই এবং সরকার দাতাগিরি করে প্রতি বছর শত শত কোটি ডলার পরিমাণে জাতীয় ঋণ বাড়িয়ে চলেছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হোল অর্থনৈতিক ধ্বংস।

নূতন ব্যবস্থাপনার বিরোধীরা অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে আরও বললেন যে এটি হোল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থা এবং আমেরিকান মতবাদের পরিপন্থী। টি. ভি. এ. থেকে দেশের বহু উপকার হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু অবাধ ব্যবসায় ব্যবস্থার পরিপন্থী হোল এই সংস্থাটি। তাঁরা বললেন দেশের এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করে নামমাত্র হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবার অধিকার সরকারের নেই, যখন এই সামান্য মূল্যে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সমর্থ নন। তাঁরা বললেন টি. ভি. এ.

প্রসংগে সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করছেন অথচ তার থেকে কোন উপকার হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে না। অতএব এ হোল করদাতাদের উপর এক বোঝা বিশেষ।

উল্লিখিত নীতিগুলির বিরোধিতা ছাড়াও ব্যবসায়ী মহল তাদের কাজ কারবারে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন। উদাহরণ স্বরূপ শেয়ার বাজার থেকে প্রতিবাদ উঠল কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের। শিল্প ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করল যে শ্রমিকদের যৌথ চুক্তির অধিকার দেওয়াটা আদৌ যুক্তিযুক্ত হয় নি, আর তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে, সরকার যেখানে মধ্যস্থতা করেছেন সেখানে শ্রমিক মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের অনুকূলে। আমেরিকায় তখন দুটি শ্রমিক সংস্থা আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এবং নবগঠিত কংগ্রেস অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অরগানইজেশনস্ শ্রমিক সংগঠন ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী।

নূতন ব্যবস্থাপনার বিরোধীরা যতই প্রতিবাদ জানাক না কেন ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে তারা কোনরূপ গুরুতর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে নি। জনসাধারণ তাদের দুঃসময়ে সরকারের কার্যাবলী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বিপুল ভোটাধিক্যে পুনর্নির্বাচিত করল রুজভেল্টকে। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ক্যানজাসের গভর্ণর আলফ্রেড এম, ল্যানডন। তিনি মাত্র মেইন এবং ভার্মণ্টেই ভোট বেশি পান।

এইভাবে প্রবল জনসমর্থন লাভ করবার পর রুজভেল্ট তাঁর দ্বিতীয় দফার কার্যকালের সুরুতে সুপ্রীম কোর্টের সংগে বোঝাপড়া করবার জন্য তৈরী হলেন। এই কোর্টের অধিকাংশ বিচারপতিই ছিলেন সংরক্ষণশীল। তাঁরা জাতীয় শ্রমশিল্প পুনর্গঠন আইন এবং কৃষি সামঞ্জস্য আইনসহ নূতন ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি ব্যবস্থাকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের আমদানী করবার অভিপ্রায় নিয়ে রুজভেল্ট প্রস্তাব করলেন যে বিচারপতিদের ৭০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করতে হবে; এবং যদি কোন বিচারপতি তা করতে অস্বীকৃত হন তাহলে প্রেসিডেণ্ট সেস্থলে একজন অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত করতে পারবেন যতদিন পর্যন্ত না বিচারপতিদের মোট সংখ্যা ১৫ জন হয়।

জনমত অনুমোদন করল না এই প্রস্তাব। অনেকে মনে করল যে সরকারী

ব্যবস্থার ভার সাম্য বিধানের মূল নীতির পরিপন্থী এ ব্যবস্থা। সেনেট এতে আপত্তি জানিয়ে বলল যে, এর ফলে নির্বাহ দপ্তর বিচার ব্যবস্থার অনন্য-নির্ভরশীলতা ক্ষুণ্ণ করতে চাইছে। যাই হোক, এক হিসাবে কিন্তু প্রেসিডেন্টেরই জয় হল। কারণ, অন্যভাবে হস্তক্ষেপের আশংকায় অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট নতুন ব্যবস্থাপনার অধীন বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুকূল রায়ই দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালের প্রথম অর্ধে ব্যবসায় ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায়, আবার গ্রীষ্মকালেই তা হ্রাস পেল। বৃদ্ধি পেল কর্মহীনের সংখ্যা। এই মন্দার অন্যতম কারণ প্রেসিডেন্টের "ডিক্টেটরী মনোভাবের" প্রতি ব্যবসায়ী মহলের অবিশ্বাস। সুপ্রীম কোর্টের বিষয়টিতে তারা যেন এর নজীর পেয়েছিল। এসময় মনে হল নূতন ব্যবস্থাপনায় হয়ত আর কোন সুরাহাই হোল না। কিন্তু জনহিতকর বিভিন্ন আইন পাশ হবার ফলে ব্যবস্থা জনপ্রিয়ই রয়ে গেল। অবশ্য যুদ্ধ পূর্বকালের এই সমস্ত সমস্যায় অর্থব্যয় করে সমাধান হত কিনা বলা কঠিন। কারণ ইতিমধ্যে আমেরিকা লিপ্ত হয়ে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, সরকার হাত দেয় আরও বিশালতর সব পরিকল্পনায়, অবসান হয় লঙ্গরখানা আর দারিদ্র্যের যুগের।

* * * *

"নূতন ব্যবস্থাপনা"য় আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মত পররাষ্ট্রনীতিও বেশ বলিষ্ঠ-ভাবে এগিয়ে চলেছিল। লেনিন ও দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে থিওডোর রুজভেল্ট যে "ভয় দেখান" নীতি অবলম্বন করেছিলেন, হুভার তার পরিবর্তন করে অবলম্বন করেন "সৎ প্রতিবেশিত্বের নীতি"। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টও এগিয়ে চলেন এই পন্থায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বন্ধ হল, সেখানে রইল না আর কোন গণ্ডগোল। কিউবা এই সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র শুভেচ্ছার মনোভাব প্রদর্শন করে। আপন ব্যবস্থাপনা গ্রহণের উপযুক্ত হলেই ফিলিপাইন স্বাধীনতা পাবে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এদিকে বাণিজ্য শুল্ক সম্পর্কে যে সমস্যা ছিল পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল তার ব্যবস্থা করেন। হাল কংগ্রেস থেকে বিদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধার জন্য বাণিজ্যচুক্তি করার অধিকার পান। ফলে যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি ধরণের আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক হ্রাস করে এবং বিদেশেও তাদের

কয়েকটি পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস পায়। এর ফলে বিশ্ববাণিজ্য আবার চালু হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ইউরোপের আকাশে যুদ্ধের মেঘ জমতে সুরু করেছে। জার্মানীর ফ্যাসিবাদী ডিক্টেটর হিটলার স্থির করলেন ভার্সাইয়ের চুক্তির ফলে যে অঞ্চলগুলি জার্মানী হারিয়েছে তার পুনরুদ্ধার করবেন, প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেও। তার সহযোগী ইটালীর বেনিটো মুসোলিনি তখন যুদ্ধ করছেন ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে। স্পেনে ইতিমধ্যে হয়েছে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ফ্যাসিষ্টরা। আর এশিয়ায় জাপান তখন এগিয়ে চলেছে চীনের মধ্য দিয়ে।

মোটামুটিভাবে এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমেরিকানদের মনোভাব ছিল নিস্পৃহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সেখানে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁরা বললেন যে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোন দায় দায়িত্বই এতে ছিল না। ১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন সমর সম্ভার উৎপাদনকারী রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী মনোভাব আরও প্রবল হয়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দেশের স্বার্থে দুটি আইন পাশ করে যার ফলে বৈদেশিক কলহে আমেরিকা আর লিপ্ত হয়ে না পড়ে। জনসন্ আইনে যে সমস্ত দেশ ঋণ পরিশোধ করেনি তাদের আর ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আইনটি অর্থাৎ নিরপেক্ষ আইনে ভবিষ্যত যুদ্ধের সময় সমস্ত যুযুধান রাষ্ট্রকে সমর সম্ভার বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আমেরিকানদের এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে বিদেশী যুযুধান রাষ্ট্রের জাহাজে ভ্রমণ করলে তাঁরা নিজ দায়িত্বেই তা করবেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই আইন দুটি অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু হিটলার যখন জার্মানীকে পুনরায় সমর সজ্জায় সজ্জিত করে তুললেন এবং সমস্ত ইউরোপ দখল করে নেবার ফন্দি প্রকাশ পেলো ১৯৩৭ সালে, রুজভেল্ট তখন দেশবাসীদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন সমগ্র বিশ্বে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমেরিকাও এ থেকে নিস্তার পাবে না। ইহুদীদের উপর হিটলারের ব্যাপক উৎপীড়ন, তার মারমুখী সামরিক তৎপরতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষের ফলে জার্মানীর পূর্বতন শত্রু রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়ল। তারা আশংকা করল হিটলার

অনতিবিলম্বে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে দেবেন। এর ফলে মিউনিকে তাঁরা হিটলারকে তোয়াজ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তখন নিরপেক্ষতা আইন বাতিল করে দেবার জন্য সুপারিশ করেন। সেক্ষেত্রে মিত্রপক্ষকে আমেরিকা রসদ জোগাতে পারবে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সুপারিশে সম্মত হয়, তবে সর্ত করে যে রসদ বিক্রী করা হবে নগদে এবং তার পরিবহনের দায়িত্ব থাকবে ক্রেতা রাষ্ট্রের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে এবারের ঘটনাবলী ভিন্নতর হয়েছিল। নয় মাসের নীরব প্রস্তুতির পর জার্মানীর নাৎসী বাহিনী অকস্মাৎ ফ্রান্স আক্রমণ করে বসে এবং ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিও অনতিবিলম্বে তাদের পদানত হয়। তারপর ডানকার্ক-এর যুদ্ধে বৃটিশরা ইউরোপ মহাদেশ থেকে হটে যেতে বাধ্য হয়।

জার্মানী এবং ইটালীর বিপুল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে তখন ইংলণ্ড একাকী দাঁড়িয়েছে। অবস্থা তখন এরূপ পর্যায়ে এসে গেছে যে হয় তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে অন্যথায় স্থল, জল ও বিমান যুদ্ধে তারা পরাস্ত হবে। এই সমস্ত সংবাদে আমেরিকার জনচিত্তে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দেয়। একদল ঘোষণা করল "ইংলণ্ডের এই সংগ্রাম আমাদেরই সংগ্রাম, ইংলণ্ড পদানত হলে জার্মানী অতঃপর আমাদের দিকেই হাত বাড়াবে।" অপরপক্ষ ঘোষণা করলেন "আমেরিকাকে যুদ্ধ পরিহার করতে হবে, এ যুদ্ধে কে জেতে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্রিটেনের অনুকূলে মত পোষণ করতেন। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে ৫০ খানি ডেষ্ট্রয়ার ব্রিটেনকে দিলেন এবং পরিবর্তে পেলেন পশ্চিম গোলার্ধে কয়েকটি নৌ-ঘাঁটি। অনেকে অনুযোগ করলেন যে প্রেসিডেন্ট নিরপেক্ষতা নীতি লংঘন করেছেন। আবার তাঁর এই কার্যে উল্লাস প্রকাশ করলেন অনেকে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস একটি খসড়া আইন পাশ করে। এই আইনে আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গঠনের কথা ছিল। এদিকে কারখানাগুলিতেও ধীরে ধীরে সমর সম্ভার উৎপাদিত হতে থাকল।

এই প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ১৯৪০ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সমাধা হয়। তৃতীয় দফায় নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবার পরাস্ত করলেন ওয়েনডেল্ উইলকি-কে। আভ্যন্তরীণ বিষয়ে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মতান্তর থাকলেও পররাষ্ট্র বিষয়ে উভয়ে একইরূপ মত পোষণ করতেন—ব্রিটেনকে অবশ্যই মার্কিন সাহায্য দিতে হবে।

১৯৪১ সালের সূচনায় ইটালী ও জার্মানীকে প্রতিহত করবার আশা সুদূর পরাহত মনে হয়েছিল। অপরদিকে জাপান দূর প্রাচ্যে নিজ আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায় নিয়ে যোগ দিয়েছিল তাদের সংগে। ইউরোপীয় রণাঙ্গণে জার্মানী ইতিমধ্যে গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়াকে পরাস্ত করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে এবং নাৎসী বাহিনী রাশিয়ার মধ্যে অনেকখানি ঢুকেও পড়েছে। ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে বৃটেন তখনও জার্মানীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, সরাসরি আক্রান্ত না হলেও প্রবল আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তখন ইংলণ্ডবাসীরা।

তৃতীয় দফার কার্যকালের শুরুতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসে ঘোষণা করলেন, "প্রত্যেক বাস্তববাদী জানেন যে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার উপর হামলা চলছে।···আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ করছি এবং আপনাদেরও জানাচ্ছি যে আমাদের দেশের এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যত ও নিরাপত্তা এর সংগে জড়িত রয়েছে।" প্রেসিডেণ্ট এই সময় একনায়কতান্ত্রিক দেশগুলির আক্রমণ রোধ করার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ শিখায় তুলবার জন্য অনুরোধ জানান এবং "চতুর্বিধ স্বাধীনতা" ভিত্তিক সুখী বিশ্বের জন্য তার পরিকল্পনা পেশ করেন। এই চতুর্বিধ স্বাধীনতা হোল বক্তৃতা ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, ধর্মাচরণে স্বাধীনতা, অনটন হতে স্বাধীনতা, এবং আক্রমণের শংকা হতে স্বাধীনতা।

প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাবক্রমে কংগ্রেস কালবিলম্ব না করে "লেণ্ড লীজ অ্যাক্ট" পাশ করেন। এই আইন অনুসারে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিরোধ করবার জন্য ইংলণ্ড ও রাশিয়াকে কোটি কোটি ডলার মূল্যের রসদ সরবরাহের অধিকার দেওয়া হয়। স্থির হয় যুদ্ধের পর এই সমস্ত পণ্যের ব্যবহারযোগ্য অংশ ফিরিয়ে দেওয়া চলবে অথবা কিনে নেওয়াও চলবে। আর যা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির হিসাব তামাদি হবে। এই আইনের মূল

উদ্দেশ্য ছিল পরাজয় এড়াবার জন্য বিদেশে যথাশীঘ্র রসদ পাঠান, এজন্য মূল্য দেবার ক্ষমতা বিচার করা হবে না। আর তাছাড়া যুদ্ধোত্তর কালে পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে যুদ্ধঋণের গুরুভারে নষ্ট না হয় তারও ব্যবস্থা হোল এই আইনে।

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিলের সংগে দেখা করেন এবং আটলান্টিক সনদ রচনা করেন। এই সনদে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে জয়ের পরিকল্পনা করা হয় এবং যুদ্ধোত্তরকালে মিত্রশক্তি কি নীতি অবলম্বন করবে তারও খসড়া করা হয়। এই দুই রাষ্ট্রনায়ক সেদিন যৌথ নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বৈষয়িক সহযোগিতা, এবং নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করছিলেন; সেদিনই স্থাপিত হয়েছিল বর্তমান রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তি।

অপরদিকে লেণ্ডলীজ্ আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সমরসম্ভার পাঠাতে থাকলো, আবার গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে সৈন্যও পাঠালো।

বিভিন্ন সূত্রে আটলান্টিক অঞ্চলে জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমশই সম্পর্কের অবনতি ঘটছিল, কিন্তু আমেরিকার উপর হামলা এলো অন্য পথে। জাপান তখন ফরাসী-ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে এশিয়া মহাদেশে অভিযান চালাতে নিষেধ করে। জাপান তখন মীমাংসার জন্য ওয়াশিংটনে দুজন প্রতিনিধি পাঠায়।

ওয়াশিংটনে যখন এই আলাপ আলোচনা চলছে সেই সময় ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপানীরা পার্ল হার্বারে মার্কিন নৌবহর, সৈন্যঘাঁটি ও বিমান বন্দরগুলির উপর জাহাজ ও বিমান থেকে অতি আকস্মিক হামলা চালায়। এই হামলায় অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ ডুবে যায় এবং মার্কিন পক্ষে দুই সহস্রাধিক লোক নিহত হয়েছিল। এ ছাড়াও ফিলিপাইন, গুয়াম এবং অন্যান্য অঞ্চলস্থ মার্কিন ঘাঁটিগুলির উপরেও জাপান হামলা চালায়। পার্ল হার্বারের ভারপ্রাপ্ত মার্কিন অফিসাররা কর্তব্যে অবহেলা করেছিলেন কিনা কিংবা ওয়াশিংটনে কর্তারা তাদের আকস্মিক হামলা সম্বন্ধে যথাসময়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন কিনা তা আজও জানা যায়নি।

৮ই ডিসেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্টের অনুরোধে কংগ্রেস জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের পদাংক অনুসরণ করে। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে জার্মানী ও ইটালী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক নূতন পর্যায়ে উপনীত হোল।

দশম অধ্যায়

বর্তমান যুগ

১৯৪৫ সালের জুন মাসে সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু এর স্থচনা হয়েছিল তারও অনেক আগে। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র এবং অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ২৫টি রাষ্ট্র জয়লাভের জন্য একযোগে কাজ করতে প্রতিশ্রুত হয় এবং আটলাণ্টিক সনদের ধারা অনুযায়ী শান্তিস্থাপনের সংকল্প ঘোষণা করে। এই চুক্তির সাড়ে তিন বৎসর পর যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল, অবসান হয়েছিল মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হানাহানির।

আমেরিকার দৃষ্টিতে বিচার করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল নগন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ; আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ২০ লক্ষে। অবশ্য এর মধ্যে অল্প সংখ্যক নারী কর্মী ছিলেন যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করতেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন পক্ষে হতাহত হয়েছিল ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার জন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা হয়েছিল এর তিনগুণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় ঋণ ছিল ২৭ শত কোটি ডলার, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এর পরিমাণ হয় ২৭৯ শত কোটি ডলার।

পার্ল হারবার আক্রমণের পূর্বে আমেরিকায় যতই সমর সম্ভার উৎপাদিত হোক না কেন বা যতই সৈন্য সংগৃহীত হোক না কেন ইউরোপ ও এশিয়ার রণাংগণে একযোগে যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের তখন ছিল না। জাপানের আকস্মিক আক্রমণে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিকার হারায়। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীরা এবং জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থারের অধীনস্থ মার্কিন সেনানীরা ফিলিপাইন রক্ষার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা করেছিল। একমাত্র হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়। জাপানীরা আলাস্কা দ্বীপে ঢুকে পড়ে এবং উত্তর আমেরিকায় ঘনিয়ে আসে বিপদ। অপরদিকে জাপানী সৈন্যরা মালয় ও সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে এবং ওলন্দাজ ইষ্ট-ইণ্ডিজ ও অন্যান্য অনেকগুলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দখল করে নেয়। ফলে অষ্ট্রেলিয়াও বিপন্নবোধ করতে থাকে।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন নতুন আমেরিকান জাহাজ ও বিমান এসে পড়ে ফলে প্রতিরোধ শক্তি বেড়ে যায়। এর পর শুরু হয় সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যার শেষে দেখা যায় জাপান অধিকৃত অঞ্চলগুলি আমেরিকা পুনরায় অধিকার করেছে এবং জাপানীরা গিয়ে ঢুকেছে নিজেদের দেশে। এশিয়া মহাদেশে চীন তখন আমেরিকার সহায়তায় জাপানের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লড়াই করছিল এবং ব্রিটেন আঁকড়ে বসেছিল ব্রহ্মদেশে।

জাপানকে পরাজিত করা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধে জয়লাভকে আরো অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারই ফলে আমেরিকা অধিক শক্তি নিয়োগ করেছিল ইউরোপীয় রণাংগনে। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনী উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় অভিযান চালিয়ে জেনারেল রোমেলের সুচতুর বাহিনীকে হটিয়ে দেয়। সেখান থেকে বিজেতারা ভূমধ্য-সাগর অতিক্রম করে ইটালীতে উপনীত হয়। ইটালী এই সময় আত্মসমর্পণ করে মিত্রপক্ষে যোগদান করে। জার্মানরা কিন্তু ইটালীতে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল এবং যুদ্ধশেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ইটালীর উত্তর অঞ্চল থেকে হঠান সম্ভব হয় নি।

১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল,

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিন এবং চীনের জেনারেল চিয়াং কাইশেক বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হয়ে সামরিক পরিকল্পনা স্থির করেন এবং রাষ্ট্রসংঘকে কার্যকরী করা বিষয়েও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সোভিয়েট সেনানীরা তখন জার্মান বাহিনীকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করছে। মিত্রশক্তিরা প্রতিশ্রুতি দিল রাশিয়াকে সাহায্য করবে।

১৯৪৪ সালের ৬ই জুন জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে এই পরিকল্পনা অনুসারে ইংলণ্ড থেকে এক বিপুল সেনাদল ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফরাসী উপকূলে নরম্যাণ্ডি আক্রমণ করে। জার্মানরা প্রবলভাবে প্রতিরোধ চালিয়েছিল কিন্তু বিমান আক্রমণে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা, নগর ও শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং নাৎসী বাহিনী ফ্রান্স ছেড়ে জার্মানীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। জেনারেল আইজেনহাওয়ারের এই বাহিনীতে ছিল মার্কিন, ব্রিটিশ ও ক্যানাডিয়ান সৈন্যরা এবং বিজিত দেশগুলি থেকে পলাতক দেশপ্রেমিক সৈন্যরা।

ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জেনারেল ম্যাকআর্থার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পুনরাধিকার করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন এবং মার্কিন নৌ-বাহিনী গুয়াম ও অন্যান্য ঘাঁটিগুলি প্রায় পুনর্দখল করে ফেলেছে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাহিনীর প্রবল পরাক্রম সহ্য করা জাপানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি এবং তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানে নৌ-বাহিনী। একমাত্র চীন ও ব্রহ্মদেশেই জাপানীরা টিকে থাকতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে আমেরিকানরা প্রচণ্ড লড়াই করে ওকিনওয়া এবং আইওজিমা দ্বীপদুটি দখল করে নেয়। হাজার হাজার বোমারু বিমান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তখন উপনীত হয়েছে জাপানের প্রত্যন্ত সীমাতে।

ইউরোপে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। নাৎসী বাহিনী ১৯৪৪ সালের বড়দিনের সময় বেলজিয়ামে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়, কিন্তু কিছু শক্তি ক্ষয় হবার পর তারা বিতাড়িত হয়। অপরদিকে পূর্ব রণাংগণে সোভিয়েট সৈন্যদল জার্মানদের তাড়িয়ে দিয়ে পোল্যাণ্ড অতিক্রম করে খাস জার্মানীতে ঢুকে পড়ে। চূড়ান্ত পর্যায়ে জার্মানীতে এসে দুদিক থেকে আমেরিকান ও রুশ বাহিনী মিলিত হয়। এই সময় রাশিয়ানরা যাতে বার্লিনে ঢুকে গ্রেপ্তার না করতে পারে সেইজন্য অ্যাডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন।

ইউরোপের যুদ্ধের অবসান হয় এইভাবে। জার্মান শক্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তারা বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ সালের ৭ই মে।

মিত্রপক্ষের এই জয়ে ফ্রাংকলিন রুজভেল্টের অবদান অসামান্য কিন্তু জয় যখন করায়ত্ত হোল তখন তিনি পরলোকে। ১৯৪৪ সাল চতুর্থবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার পর তিনি ইয়ালটাতে রুশ প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিনের সংগে মিলিত হন এবং স্থির হয় রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, বিনিময়ে তারা চীনদেশে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে তাঁকে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত মনে হয়। তিনি বিশ্রামলাভের জন্য জর্জিয়ার ওয়ার্ম স্প্রিংস-এ চলে যান। সেখানে ১২ই এপ্রিল মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সমগ্র জাতি শোকাভিভূত হয়। রুজভেল্টের স্থলাভিষিক্ত হন ভাইস্ প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস, ট্রুম্যান, মিজুরি থেকে নির্বাচিত প্রাক্তন সেনেটর তিনি।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও যুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে এসেছে, যুক্তরাষ্ট্র প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে যুদ্ধ নিজের অনুকূলে শেষ করবার জন্য। জাপানও খানিকটা হত-বুদ্ধি হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও তাদের রয়েছে বিরাট এক সৈন্যদল আর স্বদেশ রক্ষার অদ্ভুত জিদ। জাপানে অভিযান চালান বেশ ব্যয় সাপেক্ষ হত হয়ত। আর মামুলি বিমান হামলা চালিয়েও হয়ত তাকে বাগে আনা যেত, কিন্তু অভিযানও হল না, বা মামুলীভাবে বোমাবর্ষণ করাও হয়নি।

যুদ্ধের শুরু থেকেই মিত্রপক্ষ ও অক্ষশক্তির রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারমাণবিক বোমা তৈরী করা নিয়ে মরণপণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বৃটেন ও আমেরিকার পারমাণবিক জ্ঞান মিলিত হয়ে যা সৃষ্টি হল ১৯৪৫ সালের ৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর লস আলামসে তার পরীক্ষা হয়। পারমাণবিক পরীক্ষার পর্যবেক্ষকরা শিউরে উঠলেন এর কল্পনাতীত ধ্বংসক্ষমতায়।

জাপানকে হুঁশিয়ার করে বলা হল, হয় বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ কর, অন্যথায় বিমান হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে পারমাণবিক বোমার উল্লেখ করা হয় নি তখন। ৬ই আগষ্ট একখানি মার্কিন বিমান জাপানের হিরোসিমা নগরীতে একটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ৩ লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার জন হতাহত হয়, সহরটিও একরূপ নিশ্চিহ্ন হয়। ৮ই আগষ্ট সোভিয়েট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ৯ই আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্র নাগাসাকির উপর দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে, হতাহত হয় ৮০ হাজার লোক। ১৪ই আগষ্ট সম্রাট হিরোহিতো ঘোষণা করেন যে জাপান আত্মসমর্পণে প্রস্তুত।

টোকিও উপসাগরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ "মিজুরী"তে এসে জাপানের প্রতিনিধিরা ১৯৪৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করেন। আত্মসমর্পণের শর্ত অনুযায়ী জাপানের অধিকৃত বৈদেশিক অঞ্চলগুলি কেড়ে নেওয়া হল এবং মূল জাপানও অধিকার করে নেওয়া হল। যুদ্ধ সমাপ্তির সংবাদে দুনিয়া উল্লসিত হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও জনসাধারণের নিকট প্রতীয়মান হল, ভালই হোক আর মন্দই হোক, পারমাণবিক যুগ এসে গিয়েছে।

* * * *

যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতা ছিল। তারা যুদ্ধের পর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের এই সংকল্প স্বতঃই এমন একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে ঘটনা প্রবাহকে টেনে নিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান হবে লীগ-অব-নেশনস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী যার মধ্য দিয়ে তাদের পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠবে। আমেরিকানরা এই পরিকল্পনা সমর্থন করেছিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন তো পেলেনই, উপরন্তু কিছু সংখ্যক রিপাবলিকান সেনেটরও সমর্থন করলেন তাঁকে।

কয়েকটি প্রাথমিক সম্মেলন অন্তে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে অক্ষশক্তি বিরোধী পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের এক সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের সনদ রচিত হয়। এই সনদ অনুসারে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যনির্বাহক দপ্তর হবে নিরাপত্তা পরিষদ এবং এই সংস্থার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা থাকবে। এ ছাড়া থাকবে সাধারণ পরিষদ, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবে ও প্রয়োজনী পন্থা সম্পর্কে সুপারিশ করবে। আর থাকবে আইনজাত আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়, রাষ্ট্রসংঘের শাসন দপ্তর বা সেক্রেটারিয়েট এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকারহীন অঞ্চলগুলির (এর অধিকাংশই তখন অক্ষশক্তির কবলমুক্ত) শাসন নির্বাহের জন্য অছি পরিষদ। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আরও অনেকগুলি দপ্তর বা কমিশন (এর অনেকগুলি পূর্বেও ছিল)।

যথা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার, রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতি। এরা রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বিশ্বের কল্যাণমূলক কাজ করবে।

রাষ্ট্রসংঘের এগারটি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে নিরাপত্তা পরিষদ—এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনের স্থায়ী প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকবে। নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত নিতে হলে মোট সাতটি প্রতিনিধি রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন—তবে সাংগঠনিক বিষয় ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে যে কোন একটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র "ভেটো" প্রয়োগ করতে পারবে। এই ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতার মধ্যে সেই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছে—এরই জোরে তাদের আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তে সম্মত হতে হয় না।

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুমোদন করে। অন্য রাষ্ট্রগুলির অনুমোদন লাভেও বিশেষ কাল বিলম্ব হয় নি। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিশ্ব সংস্থার কাজ শুরু হয়। সংস্থার প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন নরওয়ের ট্রায়াফ লাই। সিদ্ধান্ত হল রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবে নিউইয়র্ক নগরীতে।

অবশেষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরকম ধারণা কিন্তু অচিরেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল আদর্শবাদের ক্ষেত্রে বিপুল সংঘাত। এর একদিকে রইল গণতন্ত্র যার ধারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি, অপর দিকে রাশিয়া তুলে ধরল তার কমিউনিজমের আদর্শ। রাষ্ট্রসংঘ বা অন্যত্র যখনই কোন প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে, তখনই দেখা গেল উভয় পক্ষে মতবিরোধ। সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যেই পোল্যাণ্ড ও বল্কান রাষ্ট্রগুলিতে কর্তৃত্ব প্রসার করতে থাকল এবং ফলে, উইনস্টন চার্চিলের ভাষায়, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং ক্রেমলিন ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নেমে এল এক লৌহ যবনিকা।

দুটি রাষ্ট্রের উপর এই লৌহ যবনিকা নেমে এসে তাদের টুকরো করে দিল। রাষ্ট্র দুটি হচ্ছে জার্মানী ও অষ্ট্রীয়া। যুদ্ধের পর এই দুটি দেশই যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যৌথ অধিকারে ছিল। এই রাষ্ট্র দুটির পুনঃএকীকরণ ও তাদের

সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রশ্নে অসংখ্য বিষয়ে উভয় পক্ষে শুরু হল বিরোধ। জার্মানী প্রসঙ্গে রাষ্ট্র চারটি একমত হল যে নাৎসী যুদ্ধ নেতাদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং রাষ্ট্রটিকে নিরস্ত্র করতে হবে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল যে একমাত্র কমিউনিজম সিদ্ধ পন্থা ব্যতীত অপর কোন পন্থায় জার্মানীর পুনর্গঠনে মস্কোর কর্তারা রাজী নন। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেন আশা করেছিল যে শিল্প সমৃদ্ধ পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট অধিকৃত কৃষিপ্রধান পূর্ব জার্মানীর পারস্পরিক সুবিধার্থ ব্যবসায় বাণিজ্য চলতে থাকলে উভয় অঞ্চলই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু বাদ সাধলেন স্ট্যালিন। তিনি পূর্ব জার্মানীকে লৌহ যবনিকা দিয়ে ঢেকে ফেললেন। এভাবেই জার্মানী খণ্ডিত হয়ে রইল।

রাষ্ট্রসংঘে এর চেয়ে গুরুতর এক প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে দেখা দিল বিরোধ। এটি হল পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করল যে, কার্যকরী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ব্যবস্থা হলেই মাত্র যুক্তরাষ্ট্র তাদের মজুদ পারমাণবিক বোমাগুলি নষ্ট করবে। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এই প্রস্তাবকে যুক্তিসংগত মনে করেছিল। কিন্তু রাশিয়া জিদ ধরল যে, আমেরিকা প্রথমে মজুদ বোমাগুলি নষ্ট করবে এবং পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদে অর্পিত হবে তারপর। এ-ক্ষেত্রে আপত্তির বিষয় হল এই যে, সোভিয়েটের হাতে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় পরিষদের পক্ষে কার্যকরীভাবে তদারকী করা সম্ভব হবে না। যুক্তরাষ্ট্র তার মজুদ পারমাণবিক বোমাগুলি ধ্বংস করে আর হয়ত বোমা তৈরী করল না, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যদি গোপনে বোমা তৈরী করে এবং তদারকী কার্যে সম্মত না হয়, তা হলে তারা অনায়াসেই পারমাণবিক ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিধর হয়ে উঠবে। এই প্রকারের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হল, আর অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনানীরা সবাই তখনও ঘরে ফিরে এসে পৌঁছয় নি।

* * * *

যুদ্ধোত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র আবার স্বাভাবিক কাজ কর্মে ফিরে আসার প্রয়াস পেল। সৈন্য সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ থেকে কমিয়ে ১০ লক্ষে আনা হল, অবশ্য বিশ্বপরিস্থিতি বিচারে অনেকে এটাকে গুরুতর

ভুল মনে করেছিলেন। কিন্তু অপরদিকে সৈন্যরা তখন ঘরে ফিরবার জন্য ব্যাকুল এবং জনমতও তাদের অনুকূলে।

যুদ্ধের সময় দেশে সমরোপকরণ নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পায়, গৃহ সমস্যাও প্রবল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় মূল্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর পণ্যের অপ্রতুলতা হেতু যাতে মূল্য বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করছিল।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী রাখবার প্রয়াস পেলেও শ্রমিক ও মালিকদের কার্যকলাপের ফলে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং পুনরায় অবাধ ব্যবসায় চালু হয়ে যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মজুরী বৃদ্ধির জন্য উপর্যুপরি অনেকগুলি ধর্মঘট হয়। এই সমস্ত ধর্মঘটের ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মজুরী বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে শিল্পপতিরা অভিযোগ করলেন এবং দাবী করলেন যে মূল্য বৃদ্ধি না হলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

প্রেসিডেণ্টের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কংগ্রেস মূল্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেয় এবং পণ্যমূল্য আবার বাড়তে থাকে। এই কারণ এবং ধর্মঘট সম্পর্কে জনমনে অসন্তোষ ও গৃহসমস্যা—সবকিছু মিলে জনমতের পরিবর্তন হয় ও ১৯৭৬ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনে রিপাবলিকান দল জয়লাভ করে। নূতন ব্যবস্থাপনার পর এই প্রথম রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, মনে হল তারা অচিরেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করবে।

এই সময় সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ছিলেন ওহায়োর রবার্ট এ, টাফ্ট। তিনি ছিলেন গোড়া রিপাব্লিকান পন্থী। প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট উইলিয়ম হাওয়ার্ড টাফ্ট ছিলেন তাঁর পিতা। নিউ ডীল ব্যবস্থায় যে অসাম্য ছিল বলে তিনি মনে করতেন সেনেটর টাফ্ট তা দূর করতে কৃতসংকল্প হন। প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে তিনি মনঃসংযোগ করেন, তা হল-আয়কর হ্রাস করা এবং ইউনিয়নেয় ক্ষমতা কিছু পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে শ্রমিক আইন পাশ করা।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ভেটো সত্ত্বেও টাফ্ট-হার্টলি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনটির উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক মালিক যৌথচুক্তির বিষয়ে পারস্পরিক সুবিধায় সাম্য বিধান। অভিযোগ ছিল ন্যাশনাল লেবার রিলেশন্স আইনটি

মোটামুটিভাবে শ্রমিকদেরই অনুকূলে ছিল। পূর্বতন আইনটিতে শুধুমাত্র মালিকের পক্ষে অসাধু আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছিল, নূতন আইনে শ্রমিকদের পক্ষেও অসাধু ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নূতন আইনে এছাড়া "ক্লোজড শপ" নীতিও নিষিদ্ধ হয়। এইনীতি অনুসারে মালিকপক্ষ শুধু মাত্র ইউনিয়ন সদস্যদেরই কাজে লাগাতে পারতেন। নূতন আইনে আরও ব্যবস্থা হয় ধর্মঘট করবার জন্য ৬০ দিনের নোটিশ দিতে হবে এবং ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের এই মর্মে এফিডেবিট করতে হবে যে তারা কমিউনিষ্ট নন। নূতন আইনটিকে শ্রমিকদের পক্ষে দাসত্ব আইন ঘোষণা করে ইউনিয়নগুলি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে যে এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষরূপে ব্যাহত হয় নি।

এর পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের প্রতিবাদ ও ভেটো সত্ত্বেও কংগ্রেস আয়করের হার কমিয়ে দেয়। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেছিলেন যে জাতীয় ঋণ ২৫ হাজার কোটি ডলার থাকায় রাজস্ব সংগ্রহের সমস্ত পন্থাই অনুসরণ করা উচিত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেরূপ গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বাড়াতে হবে।

সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য কংগ্রেস থেকে সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু জনসাধারণের বিরোধিতার দরুনই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই সময় কংগ্রেস সশস্ত্র বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সর্বতোমুখী দক্ষতা বিধানের জন্য উল্লিখিত তিনটি বাহিনীকে একজন প্রতিরক্ষা সচিবের আওতায় নিয়ে আসে।

রিপাব্লিকান দল এই সময় ১৯৪৮ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকল। দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর তাদের শাসন ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা তখন উজ্জল হয়ে উঠেছে। দেশে ব্যবসায়ের অবস্থা তখন খুব তেজী, কিন্তু করভার লাঘব হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের পক্ষে অগ্নিমূল্যের জন্য সঞ্চয় করা তখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সারা দেশ তখন যেন অসন্তুষ্ট এবং শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

• • •

এই প্রবল সমৃদ্ধি, পণ্যের উচ্চমূল্য এবং উচ্চহারের করভার একযোগ

বর্তমান থাকার কারণও ছিল। ইউরোপে কমিউনিজম প্রসার প্রতিরোধের জন্য সরকার তখন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে স্নায়ু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। শক্তিশালী সোভিয়েট সৈন্যদল তার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রের আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৈল সম্বন্ধে ইরান, এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তুরস্ক তখন কমিউনিষ্ট হামলার ভয়ে আতংকিত। এদিকে গ্রীসে তখন কমিউনিষ্ট এবং সরকারী সৈন্যদলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে। অপরদিকে ইটালী ও ফ্রান্সে দানা বেঁধে উঠছে সুসংগটিত কমিউনিষ্ট আন্দোলন। বার্লিনে রুশরা এই সময় রেলপথ এবং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে হটিয়ে দেবার উদ্যম করছিল। এই সময় যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন বার্লিনের পশ্চিম এলাকায় বিমানযোগে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সর্বোপরি তখন জানা গেল সোভিয়েট রাশিয়াও পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত আমেরিকা এবারও একনায়কতন্ত্রীদের হামলার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মিত্রদের সাহায্যে অগ্রসর হয়। ট্রুম্যান নীতিতে এর ব্যবস্থা ছিল এবং তদনুযায়ী গ্রীস ও তুরস্কে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের রাষ্ট্রসংঘের আওতার বাইরে থেকে কাজ করবার জন্য সমালোচনা উঠেছিল। প্রেসিডেন্ট যুক্তি দেখালেন যে, এই সংস্থাটি কার্যকরীভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে নিজে থেকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

ইউরোপের অবশিষ্ট অংশে যে অর্থনৈতিক দুর্গতি চলছিল তার সুরাহা করবার জন্য ১৯৪৭ সালে পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি, মার্শাল তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা দাখিল করেন। 'এই মার্শাল পরিকল্পনা' অনুসারে ইউরোপীয় পুনর্গঠন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই ব্যবস্থা "কোন দেশ বা কোন মতবাদের বিরুদ্ধে নয়, পরন্তু এর উদ্দেশ্য হোল খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য, হতাশা ও বিশৃংখলা" দূর করা। পররাষ্ট্রসচিব মার্শাল বুঝেছিলেন যে ইউরোপের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থা যুদ্ধের ফলে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই পরিস্থিতি কমিউনিজমের অনুকূল। এমত অবস্থায় তাদের স্বাবলম্বী করতে হলে প্রচুর পরিমাণ সাহায্য দেওয়া দরকার। তদনুসারে তিনি রাশিয়া সহ সমগ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানালেন যাতে তারা তাদের বৈষয়িক ক্ষমতার একটা হিসাব নিকাশ করে কি

সাহায্য প্রয়োজন তা নির্ণয় করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের এই অবস্থা কাটিয়ে উঠবার জন্য ঋণ দেবে এবং মাল সরবরাহ করবে।

ষ্ট্যালিন মার্শাল পরিকল্পনাকে সাম্রাজ্যবাদীসুলভ অভিহিত করে তাতে যোগ দিতে অসম্মত হন এবং সোভিয়েটের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিরও যোগদানে অস্বীকৃত হন। যাই হোক্, পশ্চিমী জার্মানীসহ ১৬টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র প্যারিসে সম্মিলিত হয়ে পুনর্গঠনের এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং যুক্তরাষ্ট্র সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৭০০ কোটি ডলার সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়। মার্কিন শিল্পপতি পল জি, হফ্‌ম্যানের নেতৃত্বে ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনার কাজ বেশ সন্তোষজনকই হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি আমেরিকার সহায়তায় তাদের যুদ্ধ বিধ্বস্ত বৈষয়িক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করবার জন্য অগ্রসর হয়। আর এই পুনর্গঠনের সংগে সংগে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।

এরপর যুক্তরাষ্ট্র উত্তর অতলান্তিক চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সংগে এক সশস্ত্র প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে। ইউরোপেই এইভাবে জোটবদ্ধ হবার আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং আমেরিকা তাতে অবিলম্বে যোগ দেয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, কানাডা, গ্রীস এবং তুরস্কসহ মোট ১৪টি রাষ্ট্র কারো উপর হামলা হলে পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়, আর তাছাড়া লাটিন আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইতিমধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুসারে এই ধরনের জোটে আবদ্ধ ছিল। আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্ভূক্ত। ১৯৪৯-সালে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) সংগঠিত হয় এবং তার প্রথম প্রধান কর্মকর্তা হয়েছিলেন জেনারেল আইজেনহাওয়ার। সংস্থাটির সদর দপ্তর স্থাপিত হয় প্যারিসে। এইভাবেই রাষ্ট্রসংঘের আওতায় দুটি সামরিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, একদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসকল।

* * *

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে গোলমাল চলছিল সেই সময় আমেরিকানরা মোটামুটিভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করে। ১৯৪৮-সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাব্লিকান দল ঘোষণা করে যে তাদের প্রার্থী

নিউইয়র্কের গভর্ণর টমাস ই. উ. ডিউই নির্বাচিত হলে তিনিও একইরূপ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবেন। ডিউই ছিলেন প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং খ্যাতনামা অ্যাটর্নী। ১৯৪৪ সালের নির্বাচনে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক পরাভূত হন।

ডেমোক্র্যাটরা এই নির্বাচনে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে খুবই চিন্তিত ছিল। এইবারই সর্বপ্রথম নির্বাচনী প্রচার কার্য টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান রিপাব্লিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসে আদৌ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এছাড়া পার্টির উভয় উপদলই তখন প্রেসিডেন্টের বিরোধী। এই উপদলগুলির মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ প্রভাবশালী। সেই অঞ্চলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিগ্রোদের অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টার দরুন বিশেষ অসন্তোষ ছিল। বামপন্থী উপদলের নেতা ছিলেন হেনরী এ. ওয়ালেস। রুজভেল্টের শাসনকালে তিনি ছিলেন অন্যতম ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। ওয়ালেস সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে আপোষের পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী। অপরদিকে ট্রুম্যানের মন্ত্রণা সভায় বাণিজ্য সচিব থাকা সত্ত্বেও ওয়ালেস প্রকাশ্যে প্রেসিডেন্টের নীতির বিরোধিতা করেন এবং তাঁকে মন্ত্রণাসভা থেকে অপসারিত করা হয়। ১৯৪৮ সালে তিনি পার্টি ত্যাগ করে প্রোগ্রেসিভ পার্টি গঠন করেন এবং আমেরিকার কমিউনিষ্টরা তাঁকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে থাকে।

ডেমোক্র্যাটিক দলের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সম্পর্কে জিদ্ না করলে হয়ত দক্ষিণ অঞ্চল তাঁকে সমর্থন করতো। নিগ্রো এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির লোকদের কর্মে নিয়োগ করা সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ ছিল যুদ্ধের সময় নিউ-ডীল অনুসারে তা শিথিল করবার প্রচেষ্টা হয়। মিঃ ট্রুম্যান কংগ্রেস থেকে আইন পাশ করে সরকারের হাতে এই নীতি কার্যকারী করবার ক্ষমতা চেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি চেষ্টা করেছিলেন পোল ট্যাক্স তুলে দিতে। এই ট্যাক্সের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের বহু নিগ্রো এবং সম্বলহীন শ্বেতকায় ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

সম্মেলনে দক্ষিণের প্রতিনিধিরা এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করে। তারা বলে নিগ্রোদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অংগরাষ্ট্রের

বিবেচ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। তারা আরও বলল যে, দক্ষিণের গুরুতর বর্ণসমস্যা দূরীকরণের বিষয়ে ওয়াশিংটন থেকে আইন পাশ করে কোন লাভ হবে না। তারা আরো দেখালেন যে সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা, চাকুরী এবং গৃহ সংস্থানের বিষয়ে দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

মিঃ ট্রুম্যান অবিচল থাকলেন আপন নীতিতে। ফলে দক্ষিণের বহু প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করে এবং ডিকসীক্র্যাট (অংগরাষ্ট্রের অধিকার রক্ষা) পার্টি নামে একটি দল গঠন করে। দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গভর্নর জে, ষ্ট্রম্ আরমণ্ড এই নূতন দলের পক্ষে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। ফলে নির্বাচনে চারজন প্রার্থীর আবির্ভাব ঘটল—ডিউই, ট্রুম্যান, আরমণ্ড, এবং ওয়ালেস।

নির্বাচনী প্রচারের সংগে সংগে সবাই ভবিষ্যৎবাণী করতে লাগল যে বিরোধী দলে ভাঙন হওয়ার ফলে রিপাব্লিকানরা অনায়াসে জয়ী হবে। অপরদিকে রিপাব্লিকান প্রার্থী গভর্নর ডিউই কোনরকম বিতর্কমূলক প্রসংগের অবতারণা করলেন না, তাঁর নির্বাচনী অভিযানে। পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান দেশের সর্বত্র টাফট-হার্টলী আইনের বিরোধিতা করে এবং রিপাব্লিকান কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রিত কার্যাবলীর নিন্দা করে বক্তৃতা করলেন। একই সংগে তিনি প্রচার করলেন কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সরকারের সুদৃঢ় নীতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় সরকারের প্রচেষ্টার কথা। এছাড়া তিনি কৃষকদের আরো সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আরো বেশি ব্যবস্থা করা হবে। ঝড়ের মত সমগ্র দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তিনি এবং সহজ সরল ভাষায় বক্তৃতা করে দেশবাসীর আস্থা অর্জন করেন। এরই ফলে এই নির্বাচনের যা ফলাফল হয় তাকে আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসের বৃহত্তম আশ্চর্য বলা চলে।

দেখা গেল ট্রুম্যান ইলেক্টোরাল ভোট পেয়েছেন ৩০৩টি, গভর্ণর ডিউই ১৮৯, আরমণ্ড ৩৯ এবং ওয়ালেস ০। ডিকসীক্র্যাট দল গঠন হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ ভোট পেয়েছেন, ব্যর্থ হয়েছে ওয়ালেসের তোষণ নীতি। কৃষিজীবীরা এবং শ্রমিকরা পূর্বের মত এবারেও ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে সমর্থন করল। কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই ডেমোক্র্যাটরা এবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং মনে হল অবশেষে প্রেসিডেন্ট তাঁর ন্যায় বিচারের (ফেয়ার ডীল) নীতি কার্যকরী করতে সমর্থ হবেন।

দ্বিতীয় উদ্‌বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিরক্ষেত্রে আর একটি গুরুতর ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন। এর উদ্দেশ্য হোল বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা। প্রেসিডেন্টের "চতুর্দফা গুরুত্বপূর্ণ কার্যধারার" অন্যতম এটি। এই চতুর্থ ধারাটিকে তিনি বললেন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং শিল্পক্ষেত্রের উন্নতির সুফল প্রয়োগ করে অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত করার বিষয়ে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে, রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করবে, পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করবে, নৈসর্গিক সম্পদ ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে এবং বিদেশে আরো অনেক প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাকে সার্থক করার বিষয়ে সাহায্য করবে।

এদিকে কিন্তু কার্যভার গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট দেখতে পেলেন যে নবনির্বাচিত কংগ্রেস যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে অনেকে বেশি রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের রিপাব্লিকান ও দক্ষিণাঞ্চলের ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এক কোয়ালিশন গড়ে উঠছে এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিষয়ে দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি করছে। দেখা গেল কংগ্রেসে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করবার প্রচেষ্টা চলছে এবং সোরগোল উঠেছে সরকারের অপদার্থতা সম্পর্কে।

আরও গুরুতর রূপে দেখা দিল উইস্‌কনসিনের রিপাব্লিকান সেনেটর জোসেফ ম্যাক্‌কারথি প্রমুখদের অভিযোগ: সরকার বিশেষ করে ডীন একিসন-এর নেতৃত্বে গঠিত পররাষ্ট্র দপ্তর কমিউনিষ্ট দালালে ও সমভাবাপন্নদের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তারা অভিযোগ করলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন কাগজে কলমে সোভিয়েটের সংগে মিতালীর সম্পর্ক ছিল তখন কিছুসংখ্যক সরকারী কর্মচারী কমিউনিষ্টদের দালাল অথবা সহগামীতে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া, পররাষ্ট্র দপ্তরের গোপন বিভাগে নিযুক্ত অ্যালগার হিস্‌-এর বিচার ও অভিযুক্ত হওয়ার মধ্যে জনসাধারণের ব্যাপক গুপ্তচর বৃত্তি ও নাশকতামূলক কার্যের সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

স্নায়ুযুদ্ধের সংগে সংগে কংগ্রেস কমিউনিষ্ট এবং তার সংগে যুক্ত সংস্থাগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে। ব্যবস্থা হোল এদের সরকারী দপ্তরে নাম রেজিষ্ট্রী করতে হবে এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল রাখতে হবে। ১৯৪৯ সালে দীর্ঘদিন বিচারের

পর কম্যুনিষ্ট পার্টির ১০ জন নেতা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচ্ছেদ করবার প্রয়াসে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হন। কমিউনিষ্টদের সহগামী হবার অভিযোগে বহু ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত চলতে থাকে। অনেকে আশংকা প্রকাশ করল যে তদন্ত কমিটিগুলি দায়িত্বহীনভাবে কার্য পরিচালনা করার দরুন ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতি খর্ব হতে চলেছে। অপর পক্ষ যুক্তি দেখাল যে আমেরিকাকে আত্মরক্ষা করতেই হবে এবং তাদের ন্যায় বিচার ব্যবস্থা কমিউনিষ্টদের তুলনায় অনেক ভালো।

দেশে যখন কমিউনিজমের সমস্যা নিয়ে এরূপ প্রবল বিতণ্ডা চলছে সেই সময় কোরিয়াতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল তা স্বাধীনতার নীতির ভিত্তিমূলে আঘাত করে।

* * *

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ার ঘটনাবলী এক বিচিত্র পথে অগ্রসর হতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র কিছুকাল ঘটনার গতি প্রকৃতি সুনির্দিষ্টখাতে প্রবাহিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল এবং তারপর কিছুকালের জন্য বিরতও থাকে। কিন্তু তারপর দেখা গেল তারা এশিয়ার ঘটনাবলীতে আরো বেশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দেবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই যুক্তরাষ্ট্র তা প্রতিপালন করে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের বৈষয়িক সাহায্য দেয় এবং পরিবর্তে ফিলিপাইন প্রজাতন্ত্র মার্কিন বাহিনীকে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি গড়তে দেয়।

যুদ্ধের পর জাপানের সামরিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন জেনারেল ম্যাকআর্থার। তিনি সেখানে শাসন ব্যবস্থায় নানারূপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। সম্রাট হিরোহিতো স্বপদে আসীন থাকলেন, এদিকে দেশে নূতন সংবিধান চালু হল। তাতে ব্যবস্থা থাকল সমগ্র দেশের নরনারীর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা গঠনের। ১৯৫১ সালে সোভিয়েটের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে জাপানের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলি জাপানের সংগে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে জাপান মূল ভূখণ্ড ব্যতীত তাদের দখলীভূত সমস্ত অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব ত্যাগ করে। জাপান অবশ্য বিশেষ সন্তুষ্টচিত্তে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। এই চুক্তি রচনা করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ দূত হিসাবে পরলোকগত জন ফষ্টার ডালেস। এরপর জাপান

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের প্রতিরক্ষার সুবিধার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে সম্মত হয়।

চীনে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছিল অনেক কম। যুদ্ধের সময় আমেরিকা চেষ্টা করেছিল সেখানকার নিয়মতান্ত্রিক চিয়াং কাই-শেক সরকার ও কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে মিতালি স্থাপনের। কমিউনিষ্টরা তখন দেশের বহু অংশে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছে। আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র চীনকে একত্রিত করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

জাপানী যুদ্ধের অবসানের পর চিয়াং-এর সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া কমিউনিষ্টদের প্রচুর পরিমাণে সমর-সম্ভার সরবরাহ করে এবং কমিউনিষ্টরা পূর্ণ উদ্যমে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আমেরিকায় অনেকে মনে করল যে চিয়াং সরকারের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির ফলে তার সৈন্যদলের মনোবল নষ্ট হয়েছে এবং তার সৈন্যদের ব্যর্থতার সেটা হল অন্যতম কারণ। আবার অনেকে বললেন যে চিয়াং-এর অনেক দোষ থাকলেও তাকে আরও অধিক সাহায্য দিলে কমিউনিজমের গতিরোধ সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে কমিউনিষ্টরা ভূমি সংস্কারের কথা ঘোষণা করায় জনসাধারণ ঝুকেছে তাদের দিকে।

চীনের সংকট যত বৃদ্ধি পেতে থাকল মার্কিন সরকার ততই উপলব্ধি করল যে গণসমর্থন না থাকলে সাহায্য দিয়ে চিয়াং সরকারকে বাঁচান যাবে না। মার্কিণ সাহায্যের পরিমাণ কমতে থাকল। শেষ পর্যন্ত চিয়াং তার অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে ফরমোজায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কমিউনিষ্টরা লাভ করে মূল ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে সোভিয়েট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জাপ অধিকৃত কোরিয়ায় জাপানী সৈন্যদলকে ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে যায়। সোভিয়েট ও যুক্তরাষ্ট্র তখন সরকারীভাবে স্থির করে যে ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত জাপ সৈন্যদের কর্তৃত্ব নেবে যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েট নেবে দায়িত্ব অক্ষরেখার উত্তর অঞ্চলের। ইতিপূর্বে যুদ্ধ চলাকালে স্থির হয়েছিল যে কোরিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

কিন্তু রাশিয়া যে তার অধিকৃত কোরিয়ার অংশ ছেড়ে যাবে তার

কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অপরদিকে তারা সেখানে কমিউনিজম চালু করতে থাকল। যুক্তরাষ্ট্র এই সময় বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের গোচরীভূত করে। রাষ্ট্রসংঘ কোরিয়ায় স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান দেয়। কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় অবস্থিত সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের অধিকৃত অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠানে অস্বীকৃত হয় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র দক্ষিণ কোরিয়ায়। নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সীংম্যান রী। রাষ্ট্রসংঘ এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নিখিল কোরিয় সরকার হিসাবে। অতঃপর সেখানে অবস্থিত মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহার করে আনা হয়।

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ায় "পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক" আখ্যায় এক তাঁবেদার সরকার গঠন করে এবং সেখানকার সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করবার পর অধিকাংশ রুশ সৈন্যকে সরিয়ে নেয়। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়া ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দক্ষিণে দক্ষিণ কোরিয়ার উপর পুরাদস্তুর আক্রমণ সুরু করে।

রাষ্ট্রসংঘ এই হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে অবিলম্বে। নিরপত্তা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোভিয়েট প্রতিনিধি আগে থেকেই এই পরিষদ বয়কট করতে থাকায় এই অধিবেশনেও উপস্থিত থাকেন নি। পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের আহ্বান জানায় কোরিয়ায় সশস্ত্র অভিযান প্রতিহত করতে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এটি তখন এক বিরাট সমস্যা। কারণ কমিউনিষ্টরা এখানে সফল হলে এশিয়ায় বিশেষ করে কমিউনিষ্ট গৃহযুদ্ধ কবলিত ফরাসী ইন্দোচীনে হামলা চালান তাদের পক্ষে অনেক অনায়াসে সম্ভব হবে।

রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে অবিলম্বে সাড়া দিল যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অগ্রসর হলেন এক বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে। তিনি ঘোষণা করলেন যে মার্কিন সৈন্যরা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে এবং সপ্তম নৌবহরকে মোতায়েন করলেন মূল চীনা ভূখণ্ড ও ফরমোজার মধ্যে যাতে সেদিকে গোলমাল না হতে পারে। রাষ্ট্রসংঘ অতঃপর কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচনের ভার দেন ট্রুম্যানকে এবং তিনি ঐ পদে মনোনীত করেন জেনারেল ম্যাকআর্থারকে।

জাপান থেকে অবিলম্বে মার্কিন বাহিনী গিয়ে উপস্থিত হল কোরিয়ার রণাঙ্গণে এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রও তৎপরতার সঙ্গে পাঠাতে থাকল সৈন্য ও রসদ।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে কোরিয়া থেকে একরূপ হটিয়েই দিয়েছিল। তারা সিউল অধিকার করে এবং দক্ষিণে এগিয়ে আসে পুসান পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেনারেল ম্যাক-আর্থার পাল্টা আঘাত হানেন। এই সময় ইন্‌চনে একটি বাহিনী অবতরণ করিয়ে তিনি প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। প্রধানতঃ দক্ষিণ কোরিয় ও মার্কিন সেনাদের নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী সিউল পুনরাধিকার করে, এবং ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়ার অভ্যন্তরে বহুদূর অগ্রসর হয়। এদের অগ্রবর্তী বাহিনী প্রকৃতপক্ষে মানচুরিয়ার সীমান্তে ইয়ালু নদীর তীরে উপনীত হয়।

এই সময় একদল চীনা কমিউনিষ্ট "স্বেচ্ছাসৈন্য" রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর উপরে অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের হটিয়ে দেয় ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে। মস্কো অবশ্য এই ধরনের হামলা চালাতে বলার অভিযোগ অস্বীকার করে, কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের অবশ্য এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না। অনেকটা হটে আসবার পর রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর পুনরায় উপনীত হয় ৩৮ অক্ষরেখায়। প্রচুর ক্ষতি হয় উত্তর কোরিয়া ও চীনা বাহিনীর। ৩৮ অক্ষরেখাই শেষ পর্য্যন্ত সীমান্ত রেখা হয়ে থাকে।

চীনাদের হস্তক্ষেপ তখন রাষ্ট্রসংঘের সম্মুখে এক প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। জেনারেল ম্যাকআর্থার কিছুকাল যাবৎ পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে চিয়াং-কাই-শেক-এর বাহিনীর সাহায্য নিয়ে চীন অবরোধ এবং সেখানকার বিমান ঘাটিগুলি ধ্বংস করে সর্বাত্মক জয়লাভের প্রয়াস পেতে। পরিকল্পনাটি বেশ সুন্দর মনে হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সদস্যরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় পরিকল্পনা অনুমোদন করেননি। এদিকে ম্যাকআর্থার পরিকল্পনাটি নিয়ে বিশেষ জিদ করতে থাকেন এবং রাষ্ট্রসংঘের নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাকে সেনাপতি পদ থেকে অপসারণ করেন। দেশে ফিরে আসেন ম্যাকআর্থার। জনমনে সংশয় থাকলেও তিনি তখন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

১৯৫১ সালের জুনমাসে রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট প্রতিনিধিদল কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির জন্য যুযুধান পক্ষগুলির মধ্যে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব আনে। উভয় পক্ষ অবিলম্বে সম্মত হওয়ায় ৩৮ অক্ষরেখার নিকটে কেসং সহরে আলোচনা শুরু হয়। যাইহোক, যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অবস্থান ও যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণ প্রসঙ্গে উভয়পক্ষে বিরোধ দেখা দেয়। কমিউনিষ্টরা দাবী জানাল যে তাদের পক্ষের সমস্ত যুদ্ধবন্দীদের তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে হবে। কিন্তু হাজার হাজার উত্তর কোরীয় বন্দী ফিরে যেতে চায় না, কারণ তারা কমিউনিষ্ট নয়। আলোচনা চলতে থাকে দীর্ঘকাল। আর এই সময় চলতে থাকে ৩৮ অক্ষরেখায়। রাষ্ট্রসংঘের পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়তে থাকে আড়াই লক্ষ আমেরিকান, প্রাণ দেয় অনেকে।

* * * *

আমেরিকানরা ইউরোপ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পররাষ্ট্র নীতি যেমন মোটামুটিভাবে সমর্থন করেছিল, তেমনি এরপরও তারা সমর্থন করল এশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিরোধের জন্য তাঁর নীতি। কিন্তু যতই কোরিয়ার যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকল, বাড়তে থাকল জাতীয় ঋণের বোঝা এবং জটিলতর হয়ে দেখা দিল নূতন বৃহত্তর যুদ্ধ এড়িয়ে এই যুদ্ধ জেতার সমস্যা, ততই লোকের আস্থা কমে আসতে লাগল তার উপর থেকে।

জনমনে এই অসন্তোষের উপর আবার প্রকাশ পেল সরকারী মহলে দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের সংবাদ। প্রকাশ পেল রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যারা কর ফাঁকি দিচ্ছে তাদের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছেন, ফাঁকি দেওয়ার জন্য অপরাধীরা অভিযুক্ত হচ্ছে না। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কমিশনেও কেলেঙ্কারীর কথা উঠল। অভিযোগ উঠল কর্পোরেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস সদস্য ও কর্মকর্তারা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ লাভের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, বিনিময়ে তারা পাচ্ছেন নানারকম সুযোগ ও সুবিধা। এমন কি বিচার বিভাগের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠল যে তারা ক্যানজাস সিটিতে ভোট জালিয়াতি তদন্তের বিষয়ে যথাযথরূপে কর্তব্য পালন করেননি। এই ভোট জালিয়াতির বিষয়ে যারা জড়িত ছিল, তাদেরই সাহায্যে শুরু হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ।

১৯৫১ সালে সংবিধানের ২০তম সংশোধন গৃহীত হয়। এতে ভবিষ্যতে

কোন প্রেসিডেন্টের দুই বারের বেশী অথবা দু'বছর কার্য করা হলে একবারের বেশী শাসন কর্তৃত্বে আসীন হওয়া নিষিদ্ধ হয়। এই সংশোধনের সময় প্রেসিডেন্ট পদে আসীন ব্যক্তি এর আওতায় না পড়লেও ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে তিনি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না।

১৯৫২ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয় অনেক আগে থেকেই। সেনেটর টাফ্‌ট বছর খানেক আগেই ঘোষণা করেন যে রিপাবলিকান দল মনোনীত করলে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। টাফ্‌ট ছিলেন অত্যন্ত কঠোর নীতিবাগীশ লোক। তবে জনসাধারণ তাকে খুব একটা পছন্দ করত না। আর তাছাড়া তিনি ছিলেন দেশকে একান্তে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী। এর জন্যও তিনি সমালোচনার পাত্র ছিলেন। যাই হোক রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুচতুর এবং রিপাবলিকান দলের উপর তাঁর ছিল বিশেষ কর্তৃত্ব।

এদিকে একদল আন্তর্জাতিকতাবাদী সেনেটর অধিকতর জনপ্রিয় একজন প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে তৎপর হলেন। এদের পুরোধা ছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর সেনেটর ক্যাবট লজ, জুনিয়র। এই দলটি ইউরোপে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সদর দপ্তরে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের কাছে যান। তারা জানতে চাইলেন জেনারেলের রাজনৈতিক মতবাদ। সামরিকক্ষেত্রে জাতির পূজ্যপাদ আইজেনহাওয়ার কখনও তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ হতে দেন-নি। ১৯৪৮ সালে ডোমাক্র্যাটরাও তাঁকে প্রার্থী মনোনীত করতে চেয়েছিল।

লজ প্রমুখকে আইজেনহাওয়ার জানান যে তিনি রিপাবলিকানপন্থী এবং জনসাধারণ চাইলে তিনি নির্বাচন প্রার্থী হবেন। যখন দেখা গেল যে তার রিপাবলিকান দলের মনোনয়নলাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল তিনি তখন ইউরোপে সেনাপতিপদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে এলেন নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণের জন্য।

টাফ্‌ট ও তাঁর সমর্থকরা আইজেনহাওয়ারের মনোনয়নলাভের সম্ভাবনা বানচাল করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। রিপাবলিকান দলের সম্মেলনে এই দল প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল ওহায়োর সেনেটর টাফ্‌টের মনোনয়নলাভের জন্য। কিন্তু কোনো ফল হয়নি, প্রথম ব্যালটেই প্রার্থী নির্বাচিত হলেন

আইজেনহাওয়ার। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সেনেটর রিচার্ড এস, নিকসন।

এদিকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে ট্রুম্যানের উত্তরাধিকারী হবার অভিলাষ অনেকের। টেনেসীর বিখ্যাত সেনেটর কীফভার, ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালবিন বার্কলে, জর্জিয়ার সেনেটর রিচার্ড রাসেল এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা সংস্থার অধিকর্তা অ্যাভারেল হ্যারিমান সকলেই প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন চান। কিন্তু ট্রুম্যানের এদের কাউকেই পছন্দ হল না, তিনি প্রার্থীপদে দেখতে চান ইলিনয়ের গভর্নর অ্যাডলাই স্টিভেন্সনকে।

স্টিভেন্সন রাজনীতিতে নবাগত হলেও তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল এবং গভর্ণর হিসাবে তিনি প্রচুর সুনামের অধিকারী। মনে হল, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির উপর যে দুর্নীতির কালিমা পড়েছে, স্টিভেন্সন প্রার্থী হলে তা দূর হবে। নিজের বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত পার্টির চাপে পড়ে তিনি স্বীকৃত হন ও প্রেসিডেন্টপদের জন্য প্রার্থী মনোনীত হন। দক্ষিণ অঞ্চলের ভোট লাভের সুবিধার জন্য ভাইস্-প্রেসিডেন্টপদের জন্য প্রার্থী মনোনীত হলেন অ্যালাবামার সেনেটর জন স্পার্কম্যান।

১৯৫২ সালের নির্বাচন এক দিক দিয়ে অতুলনীয়। কারণ প্রার্থী দুজনের কেউই রাজনীতিতে অভিজ্ঞ নন ; বিশেষতঃ আইজেনহাওয়ারের আদৌ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নির্বাচনী প্রচার দ্বন্দ্বে জেনারেল আইজেনহাওয়ার অত্যন্ত সাদা কথায় সোজাসুজিভাবে আমেরিকার জনসাধারণের উপর তাঁর আস্থার কথা ঘোষণা করলেন। অপর দিকে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করলেন সুবক্তা গভর্নর স্টিভেন্সন।

এই নির্বাচনী অভিযানে বিশেষ গুরুত্ব পেল কোরিয়া প্রসঙ্গ, সরকারী দপ্তরে দুর্নীতি এবং ফেয়ার ডীল। প্রথম দুটি বিষয়ে আইজেনহাওয়ারের বক্তব্য হল অনেক জোরালো। সৈনিক তিনি। অতএব মনে হল এই সমস্যার সমাধানে তিনিই অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি। জেনারেল জানালেন নির্বাচিত হলে তিনি সেখানে গিয়ে স্বয়ং সব কিছু দেখে আসবেন। সরকারী দপ্তরে দুর্নীতি প্রসঙ্গে স্টিভেন্সন বেকায়দায় পড়েছিলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত সৎব্যক্তি, কিন্তু তাঁকে মনোনয়ন করেছেন এবং তাঁর হয়ে প্রবল প্রচার চালাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান।

ফেয়ার ডীল প্রসঙ্গে স্টিভেন্সন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি রুজভেল্ট ও

ট্রুম্যানের উত্তর সাধক থাকবেন। কিন্তু এখানেও আইজেনহাওয়ার তাঁকে খুব সুবিধা করতে দেন নি। রিপাবলিকান প্রার্থী জানালেন যে ডেমোক্র্যাটদের অনুসৃত নীতির ফলে সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি এর সমস্ত চালিয়ে যাবেন—তবে তার আমলে আগের মত অতটা আমলাতান্ত্রিকতা ও লালফিতার কারসাজি থাকবে না, থাকবে না অর্থগৃধ্নুতা।

দক্ষিণ অঞ্চল তখনও ডেমোক্র্যাট পন্থী। নির্বাচনী দ্বন্দ্ব সাগ্রহে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তারা। জেনারেল আইজেনহাওয়ার টেকসাসের সন্তান, যুদ্ধ জয়ী বীর হিসাবে তিনি সেখানকার রত্ন। আবার আমলাতান্ত্রিকতা ও অতিরিক্ত কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মতামতকে তারা মনে করল অঙ্গরাষ্ট্রের অধিকার রক্ষার অনুকূল হিসাবে। দক্ষিণ অঞ্চলে সংশয় জাগল, তবে কি ঐ জঘন্য রিপাবলিকান দলই ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠাভরে জেফারসন ও ক্যালহুনের নীতি অনুসরণ করবে?

দক্ষিণ অঞ্চল তখন আর একটি প্রশ্নে বিশেষ উৎসুক। টেকসাস, লুইজিয়ানা এবং ফ্লোরিডার (ক্যালিফোর্নিয়াও বটে) উপকূলের অদূরে সমুদ্রতলে প্রচুর খনিজ তৈলের আকর বর্তমান। তাঁর মোট মূল্য ৪০০০ থেকে ২৫০০০ কোটি ডলার বলে অনুমান। এই খনিগুলির মালিক কে, কেন্দ্রীয় সরকার না তীরবর্তী অঙ্গরাষ্ট্র সমূহ? সুপ্রীম কোর্ট তিনবার এ বিষয়ে রায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে।

নির্বাচনী প্রচারের সময় আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন যে ঐতিহাসিক আধিকারের ভিত্তিতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমুদ্রতলস্থিত তৈলখনির মালিকানা পাবে। অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়া ও লুইজিয়ানার ক্ষেত্রে উপকূল থেকে তিন মাইলের মধ্যবর্তী এবং টেকসাস ও ফ্লোরিডার ক্ষেত্রে উপকূল থেকে সাড়ে দশ মাইলের মধ্যবর্তী তৈলখনিগুলির মালিকানা থাকবে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্রের হাতে। এর ফলে তিনি দক্ষিণ অঞ্চলের সমর্থন লাভ করেন। গভর্নর স্টিভেন্সন মত দিলেন অন্যরূপ। তিনি বললেন যে সমুদ্রতলস্থিত সমস্ত নৈসর্গিক সম্পদের মালিক আমেরিকার জাতীয় সরকার। অবশ্য, তিনি আরও বললেন, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি এর মুনাফার বখরা যাতে পায় সেরকম ব্যবস্থা হয়ত করাও যেতে পারে।

আইজেনহাওয়ার স্টিভেন্সন নির্বাচনের প্রাক্কালে সমস্ত তথ্য খতিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বললেন যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নির্বাচনে, যে কেউ জয়ী

হতে পারেন। ২৪ ঘণ্টা পরে ভবিষ্যদ্বক্তার দল পড়লেন অকূল পাথারে, তাঁরা তখন ভাবছেন কি করে তাদের হিসাব নিকাশে এমন গরমিল হল।

বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন আইজেনহাওয়ার। ইলেক্টোর‍্যাল ভোট তিনি পেয়েছেন ৪৪২ আর স্টিভেন্সন ৮৯। পপুলার ভোট আইজেন-হাওয়ার পেয়েছেন প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং স্টিভেন্সন কিঞ্চিদাধিক ২ কোটি ৭০ লক্ষ। দক্ষিণের সুদৃঢ় জোটে ফাটল ধরেছে, ভার্জিনিয়া, টেনেসী, টেক্সাস ও ফ্লোরিডা ভোট দিয়েছে রিপাবলিকান প্রার্থীকে। গভর্নর স্টিভেন্সন জয়ী হন মাত্র ৯টি স্টেটে এবং তার মধ্যে সবগুলিই দক্ষিণী রাষ্ট্র। একমাত্র পশ্চিমী ভার্জিনিয়া দক্ষিণী না হলেও সেটি দক্ষিণের লাগোয়া। গভর্নর স্টিভেন্সন নির্বাচনী প্রচারের ফলে জনমনে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন, কিন্তু ভোট তিনি পাননি। কারণ ২০ বৎসর ডেমোক্র্যাটরা দেশ শাসন করেছিল। এবার জনসাধারণ স্থির করেছে শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটাবে।

* * *

১৯৫৩ সালের ২০শে জানুয়ারী ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল ভবনে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের অভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪তম প্রেসিডেণ্ট। সদাহাস্যময় নিরুদ্বেগ এই মানুষটিকে অভিষেক লগ্নে অত্যন্ত গম্ভীর এবং চিন্তাকুল দেখা গেল। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি যে বাণী প্রচার করলেন তা সেদিন সমগ্র বিশ্ব সাগ্রহে শ্রবণ করেছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমার প্রিয় দেশবাসিগণ: নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাত সংকুল এক শতাব্দীর অর্ধেক সময় পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অতিক্রম করে এসেছি। আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে অনুভব করছি যে শুভ ও অশুভ শক্তি আজ যেভাবে সংহত হয়েছে পরস্পরের বিরুদ্ধে ইতিহাসে কদাচ তেমন দেখা গিয়েছে।...আমাদের আজ বিবেকবুদ্ধি পরিচালিত হয়ে বিজ্ঞোচিতরূপে অগ্রসর হতে হবে; কাজ করতে হবে অনলসভাবে, অপরকে শেখাতে হবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে প্রচার করতে হবে আপন বক্তব্য, এবং সযত্নে ও সহানুভূতি নিয়ে নিজেদের প্রতিটি কাজের বিচার করতে হবে। কারণ আজ আমাদের পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করতে হবে এই সত্যটি: আমেরিকা যা কিছুই বিশ্বে প্রচার করতে চায়, তা যেন সর্বাগ্রেই আমেরিকাবাসীদের হৃদয় জয় করে।"